বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

বাংলাদেশের ছড়া সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা

১২তম বর্ষ ৪র্থ ও ১৩তম বর্ষ ১ম যৌথসংখ্যা অক্টোবর'১৮ - মার্চ ২০১৯

সম্পাদক
শওকত হোসেন
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
কক্ষ: ৬০৪, ৬ষ্ঠ তলা, রোজভিউ প্লাজা, হাতিরপুল কাঁচাবাজার, ঢাকা ১২০৫ ।
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়হ
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
শিল্পী: সুব্রত চৌধুরীর অংকন অবলম্বনে

কম্পোজ
প্রান্তিক

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
২০০.০০ টাকা
২০০.০০ রুপি
৪ $ ডলার

স ম্পা দ কী য়

বাংলাদেশের জন্ম যে-প্রতিবাদমুখর পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে, তার যাত্রা শুরু হয়েছিল কয়েক শ বছর আগে থেকে। একটা সুদীর্ঘ কাঁচামাটির পথ কোথাও উঁচু বা ঢালু না-হলেই যেমন, তার ওপর দিয়ে পিচের সড়ক তৈরি করা যায়, এই দেশ বা জাতির আজকের এই পরিচয় দিতে পারার মতো অবস্থায় আসতে ও তার কাঠামোকে যথেচ্ছ সটান ও শক্ত হতে হয়েছে ধীরে-ধীরে অনেক দিন ধরে। এই জনগোষ্ঠীর দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চায় নিমজ্জন ভাবাবেগের জলে ঘটলেও, এদের সাহিত্যচর্চার ধারা কিছুটা হলেও ধাবমান বস্তুকামী পরিবর্তনের দিকে! সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে তার ছড়াসাহিত্য বোধ করি সেই অর্জনে সবচেয়ে বেশি চাক্ষুষ। এই সাহিত্যমাধ্যম এখানকার রাজনৈতিক অর্জনগুলোর পরতে পরতে ক্রিয়াশীল– সম্ভবত ছড়াসাহিত্যই সবচেয়ে বেশি অবদান রেখে মানুষকে সরাসরি উদ্বুদ্ধ করেছে। সে কারণে ছড়াসাহিত্য কেবল সাহিত্যমানই পরিগ্রহ করেনি, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্জনে এর ভূমিকা অন্য মাধ্যমগুলোর তুলনায় উল্লেখ্য।

প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী পরিবেশ-প্রতিবেশে ছড়াসাহিত্য জোয়ারের পানিতে নাচতে থাকা মাছেদের মতো জন্মানোর স্বাদ পেতে থাকে। বায়ান্ন, একাত্তর, নব্বই সে-কারণে জোয়ারকাল ছিল ছড়াসাহিত্যের। সোভিয়েত পতনের মধ্যদিয়ে যে-বিশ্বরাজনৈতিক মন্দাভাবের আগমন, তারই ছায়া-প্রছায়ায় অন্য আরও অনেক শিল্পমাধ্যমের মতো ছড়াসাহিত্যেরও প্রায় মৃত্যু ঘটেছিল; তারপরও শিশু-কিশোরতোষ ও চিরায়ত মানবিক বোধের ধারাটি সচল রয়েছিল কিছুটা মনমরা গতি নিয়ে হলেও।

দীর্ঘ চড়াই-উৎরাইয়ের ভেতর দিয়ে বাংলা আর বাঙালির এ-পর্যায়ে পৌঁছানোর নেপথ্যে ছড়ার মতো সাহিত্য-অস্ত্র দীর্ঘদিনের সাথী

আমাদের। ফলে এ-ও বলা যায়, যত কাল রবে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা/ ততোকাল রেখে যাবে ছড়া তার/ সেই সেই কৃতির নমুনা!

ছড়াসাহিত্য নিয়ে প্রবন্ধের এ সংখ্যাটির জন্য রচনা পেতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে, তারপরও শেষে বের করা সম্ভব হল বিধায় সহযোগী সবাইকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ।

শওকত হোসেন
শরমিন নিশাত
ঢাকা, **মার্চ ২০১৯**

সূচি

প্রবন্ধ
ছড়াসাহিত্য: প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গ
আমীরুল ইসলাম ০৪
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল
আনজীর লিটন ১৬

প্রবন্ধ
ছড়ার আদি-অন্ত: যুগভিত্তিক একটি আধুনিক পর্যালোচনা
আলম তালুকদার ২২
আধুনিক বাংলা ছড়া ও আমাদের ছড়া
আহমাদ মাযহার ৪২

প্রবন্ধ
শিশুসাহিত্য: বাংলাদেশের ছড়া
আসলাম সানী ৫৩
বাংলাদেশের ছড়া: সুদূরপ্রসারী ও দিগন্তবিস্তারী
রাশেদ রউফ ৫৯
বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্য: আনুপূর্বিক প্রেক্ষণ
তপন বাগচী ৭১

প্রবন্ধ
সুকুমার রায়ের ছড়ায় ব্যঙ্গাত্মক রাজদর্শন
বিলু কবীর ৮৬
লুৎফর রহমান রিটনের ছড়ায় বার্তামূল
বিলু কবীর ১১১
আমীরুল ইসলামের ছড়ায় লোক-উপাদান
বিলু কবীর ২৩৪

প্রবন্ধ
প্রবাদ-প্রবচনে সমাজচিত্রের প্রতিফলন
জাহাঙ্গীর আলম জাহান ১৫৯

প্র ব ন্ধ
লোকছড়া: লেখ্যছড়া
দী প ঙ্ক র চ ক্র ব র্তী ১৮০
ছড়া, ছড়াকার ও ছড়াবই ২০০
ফা রু খ সি দ্ধা র্থ ১৮৫

প্র ব ন্ধ
বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
সু জ ন ব ড়ু য়া ১৯০

প্র ব ন্ধ

ছড়াসাহিত্য: প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গ

আ মী রু ল ই স লা ম

ছড়ার ঐতিহ্য আছে বলেই ভবিষ্যৎ নিরবধি

একটা ছড়া কখন যে নিটোল ও সার্থক ছড়া হয়ে ওঠে তা অতি বড় সাহিত্য গবেষক-এর পক্ষেও শনাক্ত করা কঠিন। ছড়ার সংজ্ঞাও এ পর্যন্ত নিরূপিত হয়নি। কাকে ছড়া বলব? কোনটা খাঁটি ছড়া? কী কী বৈশিষ্ট্য থাকলে একটা পদ্য ছড়ায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে? কিংবা কবিতা ও ছড়ার ভেদরেখাই-বা কোনটা? এ নিয়ে অনেক সহজ-সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। খুব সহজেই কেউ কেউ আবার 'ইহাকে ছড়া' বলে– শিরোনামে সংজ্ঞাও দিয়ে থাকেন। কিন্তু যে কোনো বিষয়ের সংজ্ঞা তৈরি করা যে সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার সেটা ভুলে যান। কবিতা কাকে বলে? কবিতার সংজ্ঞা কী? এ নিয়ে সঠিক কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ছড়া কাকে বলে– এ রকম প্রশ্নের রাশি রাশি সংজ্ঞায়িত উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। আমি

ব্যক্তিগতভাবে অধিকাংশ সংজ্ঞার সাথে একমত নই। আদি ছড়ার মধ্যে যে সুর যে ধ্বনি-বৈচিত্র্য, যে ছন্দের নৈপুণ্য এবং যে আটপৌরে বিষয় ভাবনা– সবমিলিয়ে যে সহজবোধ্য অনুরণন আমাদের হৃদয়ে দোলা দেয় তাকেই আমি ছড়ার জগৎ বলে মনে করি।

ছড়ার ধ্বনি-বৈচিত্র্যের মধ্যে শিশুজগৎ মূর্ত হয়ে ওঠে। বিষয়-ভাবনাও শিশু-মনোরঞ্জনী কিংবা শিশুর দেখা পৃথিবী। তবে সেই শিশুর চোখ দিয়ে দেখা পৃথিবীর মধ্যেও অত্যন্ত সঙ্গতভাবে, প্রতীক-সংবলিত সমাজ-ভাবনা পরিস্ফুট হয়। তখন আরুর্য হয়ে আমরা উপলব্ধি করি– ছড়ার শক্তি অনিবার্য। ছড়া তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে 'বিপুলা এ পৃথিবী'র সবরসই ধারণ করতে পারে।

তবে ছড়া-সার্থক ছড়া হয়ে ওঠে লোকছড়ার ছন্দে ও গঠনশৈলীতে, প্রকরণশৈলীতে। এছাড়া ছড়া সুতোর এপারে-ওপারে দুলতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদ্য হয়ে ওঠে। কখনও কখনও কবিতা।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, সুকুমার রায়কে আমরা প্রায় বাংলা ছড়ার কিংবদন্তিতুল্য ছড়াকার হিসাবে মহিমান্বিত করেছি। আমার মানতে কষ্ট হয়– সুকুমার রায় প্রকৃত ছড়াকার কিনা। বুদ্ধদেব বসুর মতো স্বনামখ্যাত সাহিত্য সমালোচক তাঁকে 'কবি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ সুকুমার রায় রচনা করেছেন হাসির কবিতা। যে অর্থে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনেক ছড়াগন্ধী হাসির কবিতা রয়েছে। তাঁকেই কি তাহলে ছড়াকার বলব?

'আবোল তাবোল'-বা 'খাই খাই' বইয়ের অধিকাংশ রচনাই কবিতার পর্যায়ভুক্ত। তবে অগ্রন্থিত অসংখ্য রচনার মধ্যে সুকুমার রায়ের ছড়ালেখক-সত্তা পরিস্ফুট হয়েছে। সে রকম উদাহরণ অসংখ উল্লেখ্য করা যায়। উদাহরণ-কণ্টকিত না করে সুকুমার রায়কে যদি 'কবি' আখ্যা দেই তবে কি খুব অন্যায় হবে?

চরিত্রবান, খাঁটি ছড়া আসলে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থকভাবে রচনা করেছেন অন্নদাশংকর রায়। ছড়াকে ধ্বনি, ছন্দ, বিষয় ও উপস্থাপনার আঙ্গিকে কখনোই তিনি পদ্য বা কবিতা হয়ে উঠতে দেননি। আরুর্য কুশলতা তাঁর। লোকছড়ার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে অনেক গভীর দার্শনিক বিষয় ছড়ার আদলে উপস্থাপন করেছেন।

এ প্রসঙ্গে অন্নদাশংকর রায় উদ্ধৃত করেছেন : আমার তো ভয় হয় যে কখনো কখনো আমিও ছড়া লিখতে গিয়ে পদ্য লিখেছি। পথভ্রষ্ট হয়েছি। না, আমার ছড়া সবসময় ছড়া হয়নি। বোধহয় অত বেশি না লিখলেই হত। আমি যে ভেতরে ভেতরে একটি শিশু যে কথা যখন আমি নিজেই বিশ্বাস করি না বা ভুলে যাই, তখনই আমার ছড়া কৃত্রিম হয়ে পড়ে। পদ্যের মতো শোনায়।

সেই অর্থে যাঁরা অতি পরিশীলিত মনের অধিকারী, বিষয়-সচেতন, শব্দ ও ধ্বনি-সচেতন, কাব্যাক্রান্ত মননের অধিকারী তাঁরা যখন ছড়া রচনা করেন– সেসব ছড়া পণ্য হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে যে কোনো ছড়ার সংকলন বা ছড়াগ্রন্থ উল্টে-পাল্টে দেখলেই বোঝা যাবে কত অজস্র লঘুপদ্যকে আমরা ছড়ার মর্যাদা দেয়ার চেষ্টা করেছি।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের আরো দু-একটি মন্তব্যকে উদ্ধৃত করলে আমরা ছড়া সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারি।

তিনি বলেছেন, ছড়া একপ্রকার আর্টলেস আর্ট। শিশুরা সহজে পারে। বয়স্করা সহজে পারে না। অশিক্ষিতেরা সহজে পারে। শিক্ষিতরা সহজে পারে না। মূর্খেরা বুঝতে পারে। পণ্ডিতের লাগে ধন্দ।

ছড়া যে আর্টলেস আর্ট– এর মধ্যে কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন নেই। নির্মাণশৈলীতে বুদ্ধিবৃত্তির দরকার নেই। প্রয়োজন কেবল শিশুহৃদয়ের এলোমেলোমি। তাই ছড়ার আঙ্গিকের মধ্যেই ছড়া ভিন্ন হয়ে উঠবে পদ্য ও কবিতার চেয়ে। অথবা ছড়া এমন একটি বিষয় ধারণ করবে যা কবিতার উপযোগী নয়। ছড়া নিরন্তর পরীক্ষামূলক। বিষয় ও আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ছড়া ধারণ করে তার মহত্ত্বকে।

কবিতার ঘনীভূত সংঘটনের পাশাপাশি ছড়ার অবস্থান একেবারেই বিপরীতমুখী। গতি ও আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য ছড়ার কাঠামোর মধ্যে ছড়িয়ে দেয় শিশুহৃদয়ের চপলতা।

ছড়া সর্বাংশে ছড়া হয়ে ওঠে শিশুহৃদয়ের সম্পন্নতায়।

মানুষের হৃদয়ে যতদিন শিশুহৃদয় সক্রিয় থাকবে ততোদিন ছড়া সার্থকভাবে রচিত হবে। ছড়া ছেলেমানুষি আচরণ করবে। ছড়া খোলামেলা অন্তরঙ্গ। ছড়া স্বেচ্ছাচারী, বিশৃঙ্খল। ছড়া ছুটির দিনের নীলাকাশ। ছড়া আনন্দময় ফুর্তিময় অনুভূতি। ছড়া সেই সলাজ কিশোরী– যার বয়স কোনোদিন বাড়বে না। ছড়া শিশুতোষ দুষ্টুমি। ভারি দার্শনিক তত্ত্বকেও সহজ দৃষ্টিতে যিনি দেখতে পান– তিনিই সৃষ্টি করতে পারবেন খাঁটি ছড়া।

ছড়া মুক্ত আকাশের মতো নির্মল বলেই এর মধ্যে চলতে থাকবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ছড়ার চরিত্র ঠিক থাকবে। বিষয়, আঙ্গিক, উপস্থাপনার ঢঙে নিত্য পরিবর্তন আসতেই থাকবে।

ছড়া সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায়ের আরেকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে এই সামান্য রচনার পরিসমাপ্তি টানছি : একশো দুশো পাঁচশো বছর আগে সচেতন কবি/লেখকেরা ছড়া লিখতেন না। লিখতেন মেয়েরা চাষিরা। শিশুরা তাদের নাম কেউ জানে না। আজ সিরিয়াস লোকেরাও ছড়া লিখছেন। ছড়ার মধ্যে সত্যি কিছু না থাকলে এটা হত না। ছড়ার ঐতিহ্য বহুদিনকার। ছড়ার ভবিষ্যৎও নিরবধি।

ছড়াই একমাত্র মৌলিক প্রতিম

বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের অনেক মিল বা সাদৃশ্য সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। বাংলা গদ্য তার আপন ঠিকানা আজও খুঁজে পায়নি– ইংরেজি সাহিত্যের কাছেই তার অপরিসীম ঋণ।

বাংলা গদ্যরীতি দাঁড়িয়ে আছে ইংরেজি অনুকরণে। ইংরেজি স্টাইলে বাংলা গদ্য সবল হয়েছে। প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প– সবকিছুতেই ইংরেজিয়ানার ব্যাপক প্রভাব আছে। এটাই ঔপনিবেশিক প্রভাব। ইংরেজি সাহিত্যেও প্রভাব। বাংলা কবিতাও এই প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। ইউরোপীয় ঘরানার প্রত্যক্ষ ছায়া রয়েছে বাংলা আধুনিক কবিতায়। এমনকি অনেক উৎকৃষ্টমানের কবিতা পাঠের পর মনেই হতে পারে– এ বুঝি অনুবাদ কবিতা।

তবে বাংলা কবিতার যে নিজস্বতা আছে– ত্রিশের আধুনিক কবিরা সে পথে পা দেননি। ইংরেজি-শিক্ষিত এই কবিকুল– উপনিবেশবাদী সাহিত্যবোধকেই উৎকৃষ্ট ও আধুনিক মনে করেছিলেন। তাই তাঁদের কাব্যকৃতিতে ইংরেজি প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁরা বাংলা কবিতার নিজস্বতাকে উপহাস করেছেন। মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতাকে তরল ও ফেনায়িত আখ্যা দিয়ে এর কাব্যসুধাকে অস্বীকার করেছেন।

স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশীয়ানার প্রতি যাঁরা অনুগত ছিলেন তাঁরা তাঁদের কাছে 'গ্রাম্য' আখ্যা পেয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের নাম উল্লেখ করা যায়। সমকালে জসীমউদ্‌দীন চরম উপেক্ষা ও অনাদর পেয়েছেন। কিন্তু আজ আমরা উপলব্ধি করি যে, জসীমউদ্‌দীন কত বড় মাপের কবি। এবং কতটা মৌলিক কবি।

বাংলা ভাষার অধিকাংশ আধুনিক কবির কবিতা গ্রন্থাকারে সঞ্চিত হয়ে আছে। পাঠক তা ছুঁয়েও দেখে না। কারণ মৌলিক বিষয় চিরদিন মর্যাদা পেয়ে থাকে। ধার করা বস্তুর মূল্য অত্যন্ত সমকালিক।

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ বিষয়-আশয় যদি ধার করা হয়েই থাকে– মৌলিকত্ব কি কিছু নেই?

আমি সবিনয়ে বলতে চাই, এই বিষয়ে বাংলা ছড়ার কথা। বাংলা ছড়া অত্যন্ত মৌলিক মাধ্যম। এইসব লোকছড়ার সঙ্গে ইউরোপীয় ছড়ার কোনো মিল নেই। আধুনিক ছড়াতেও ইউরোপীয় ছড়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয় না।

ছড়ার এই মৌলিক ক্ষেত্রটি আমাদের গর্ব করার মতো বিষয়। ইংরেজিতে মাদার গুজ আছে। কিন্তু বাংলার ছেলেভুলানো ছড়ার সঙ্গে একে খাপ খাওয়ানো যাবে না। ইংরেজি রূপকথার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে বাংলা রূপকথার মিল পাওয়া যায়। কিন্তু ছড়ার ক্ষেত্রে কোনো মিলের সন্ধান করা যায় না।

বাংলার ছড়া একেবারেই বাংলার নিজস্ব সম্পদ। বাংলার মা-বোনেরা এর নির্মাতা। বাংলার কৃষিজীবী সমাজব্যবস্থা এর রূপকার। এর রস আস্বাদনকারী বাংলার ছেলেমেয়েরা। এর সঙ্গে ইউরোপীয় ছড়ার মিলমিশ হয়নি। খাপ খায়নি।

তাই বাংলা লোকছড়া কৃত্রিম হয়ে ওঠেনি। একেবারে নিজস্বতায় পূর্ণ হয়ে আছে। আধুনিক ছড়ার গৌরব এখানেই। আধুনিক ছড়াকারেরাও চিরন্তন ঐতিহ্য থেকে সরে আসেননি। তাঁরা সেই আবহমান কালের ধারাবাহিকতায় এখনও ছড়া রচনা করে যাচ্ছেন।

ছড়া–বিদেশি সাহিত্য দ্বারা দ্রবীভূত হয়নি। চরিত্রহীন হয়নি তাই ছড়ার। ছড়া চিরকালই স্বয়ম্ভূ, একক, মৌলিক।

একমাত্র বাংলাসাহিত্যে ছড়াকেই সংকর ধাতুতে রূপান্তর করা যায়নি। ছড়ার মধ্যে ঔপনিবেশিকতা নেই। ছড়া কোকিলের মতো নয়।

বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা আর বাঙালি জীবন-আচরণই ছড়ার প্রাণশক্তি। বাংলা ছড়া তাই আদি ও অকৃত্রিম। মৌলিক ছড়ার মৃত্যু নেই।

ছড়া কি শুধুই হাস্য-পরিহাস?

রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' কিংবা সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' বা 'খাই খাই'-এর মজারু-পথ বেয়ে ছড়া আজকের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্ধৃত বইগুলো হাস্যরস ধারার ছড়ায় রসে পরিপূর্ণ। সমালোচক বুদ্ধদেব বসু সুকুমার রায়কে হাসির কবিতা রচয়িতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ছড়াকার হিসেবে সুকুমার রায়কে মানতে রাজি নন। তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তি অনুযায়ী সুকুমার রায় কবি এবং ব্যাপক অর্থে তাঁর কবিতা কাব্যরস-সমৃদ্ধ, কবিতার শর্ত পালন করেছে যথাযথভাবে। শুধু পার্থক্য হচ্ছে– সুকুমার রায়ের কবিতা ফ্যান্টাসি-নির্ভর। হাস্যরস-নির্ভর। শব্দ ও বাক্যবন্ধে কৌতুকপ্রবণতা আছে। আর ছন্দ সহজ-সরল-স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তে দোলায়িত। লোকছন্দের মধুরতাকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। বিষয়-ভাবনা কেবলই স্নিগ্ধ পরিহাসপ্রিয়তায় আকণ্ঠ মগ্ন।

হাসির কবিতা রচনার এই ধারাটিকে লঘুচালের পদ্য হিসেবে সমালোচকেরা বিবেচনা করেছেন। আরও লঘুভাবে বলতে গেলে– পরবর্তীকালে 'ছড়া' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলা ছড়ার অনেক ট্র্যাজেডির মতো এটা একটা বড় ট্র্যাজেডি। হাসির কবিতার লাইনে আমাদের ছড়া চলা শুরু করল। তাতে ছড়া কতটা সফল হল কিংবা চারিত্র্যগুণ অক্ষুণ্ন রাখল সে আলোচনা অনেক বিস্তৃত। তবে বাংলা ছড়া (বিশদভাবে পদ্য বা কবিতা) প্রাণ পেল হাস্যরসের ধারায়– এই সত্য অনিবার্য। সুনির্মল বসু, কাজী নজরুল ইসলামের হাত ধরে সুকুমার বড়ুয়া থেকে লুৎফর রহমান রিটন পর্যন্ত সেই হাস্যরস ধারার প্রাবল্য দেখতে পাই। এঁদের সকলের ছড়াই চরিত্র-বিচারে প্রায় সমধর্মী। বিষয়-ভাবনায় পার্থক্য থাকলেও, যুগধর্মের কারণে সুস্পষ্ট ভিন্নতা থাকলেও ছড়ার সুর ও রচনা-বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম। এই জনপ্রিয় ও হাস্যরস ধারার মধ্যে গত একশো বছর ধরে বাংলা ছড়া আবর্তিত হচ্ছে। ব্যঙ্গ, কৌতুক, পরিহাস, উপহাস, কশাঘাত– ফ্যান্টাসির মাধ্যমে, ছন্দোবদ্ধ বাক্যের মাধ্যমে ছড়া অনর্গল রচিত হচ্ছে। সব যে সফল ছড়া এমনটা বলা যাবে না। হামেশাই তা রূপান্তরিত হয় হাসির পদ্য বা কবিতায়। আমরা ছড়াকে সরলীকরণ করি। তাই ভেদরেখা টানি না। ছড়া যেহেতু শিল্প-মাধ্যম, সাহিত্যমাধ্যম তাই এর গড়পরতা সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টাও একধরনের বাতুলতা। তবে হাস্যরসই কি ছড়ার মূল গন্তব্য? হাস্যরসের মাধ্যমেই কি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার রূপায়ণ হবে ছড়ায়? তাই কি এখন ছড়া সহজ ও চটুল ও স্থূল হয়ে উঠেছে? কার্টুনের পাশে স্থান পাচ্ছে ছড়া। মিল দিয়ে কয়েকটা লাইন লিখলেই ছড়া হয়ে যাচ্ছে এই সব? ব্যঙ্গাত্মক এই সব ছড়া জীবনবিচ্ছিন্ন নয়? উপহাসই কি ছড়ার প্রাণ? এই সরল পথে যাত্রা শুরু করে ছড়া কি সফল হয়েছে?

কিন্তু বাংলা লোকছড়ার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পথ বেয়ে ছড়া আধুনিক যুগে বেশি চর্চিত হয়নি। একমাত্র অন্নদাশংকর রায় সেই ঐতিহ্যধারায় সফল ও সার্থক ছড়ারচয়িতা। বাংলা লোকছড়ার সবরকম বৈশিষ্ট্যের চিহ্নকে ধারণ করে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ছড়া লিখেছেন। তাঁর ছড়া বুদ্ধিবৃত্তিক সরলতায় আচ্ছন্ন। সে কারণে অন্নদাশংকর রায়ের ছড়া দিয়ে সহজে প্রভাবিত হয়ে ছড়া রচনা করা সহজ কাজ নয়। কঠিন বিষয়কে শিশুহৃদয়ের মধুরতায়

শব্দ-ধ্বনি ও বাক্যে তিনি সজীব ও প্রাণবন্ত ছড়া লিখেছেন। তিনি বলেছেন– ছড়া হচ্ছে অশিক্ষিতের পটুত্ব। ছড়ায় কাঠিন্য ও বুদ্ধি বেশি থাকলে তা পদ্য হয়ে ওঠে। 'ছড়া' আখ্যা দিতে মন সায় দেয় না।

অন্নদাশঙ্কর রায় আজীবন সৎ ও চরিত্রানুগ ছড়া লিখতে চেয়েছেন। লোকছড়ার মণিমাণিক্য উদ্ধার করে ছড়ার মাধ্যমে নিজের ও দেশের জীবনেতিহাস রচনা করেছেন। ছড়া সচল সময়ের স্থির প্রতিকৃতি– অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়া সেই শর্ত পূরণ করেছে অনায়াসে। কিন্তু বাংলা ছড়া অন্নদাশংকর রায়ের মনোজগৎ দিয়ে কেন সম্মুখবর্তী হল না– এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। অন্নদাশংকর রায় সেই যশস্বী ও মননশীল ছড়ালেখক যিনি লোকমুখের ছড়াকে আধুনিক রক্তমাংসে, প্রাণস্পর্শে জীবন দান করেছেন। ছড়ালেখকদের মধ্যে সত্যি তিনি বিস্ময়কর প্রতিভা। বাংলাদেশের চিরকালীন লোকছড়ার সুর ও ধ্বনিমাধুর্যকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। ছড়া রচনায় তিনি অকারণ পাণ্ডিত্য, কারিকুরি কিংবা কৃত্রিমতাকে প্রশ্রয় দেননি। একলব্যের মতো নিষ্ঠাবান, এক ও অবিসংবাদিত এই ছড়ালেখক বাংলাভাষার মহান ছড়া-রূপকার। বাংলা ছড়া অন্নদাশঙ্কর রায়ের লাইনে কেন এগিয়ে যায়নি? কেন লোকছড়ার জগৎ থেকে আমরা দূরে সরে গেছি? শুধু শক্তিমান ছড়াকারের কারণেই কি আমাদের ছড়া লোকছড়ার পথ অনুসরণ করেনি?

আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত কবি ও ছড়াকার আল মাহমুদ। বাংলা লোকছড়ার উত্তরাধিকার বহন করে তিনি আরুর্য সব ছড়া রচনা করেছেন। রচনার পরিমাণ যৎসামান্য। কিন্তু খাঁটি দেশজ ছড়ার বৈশিষ্ট্য-লক্ষণ এতটাই তীব্র যে আল মাহমুদ আমাদের প্রধানতম ছড়াকার হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠ। যদিও আল মাহমুদ মাতৃহৃদয়ের সরলতা নিয়ে ছড়া লিখে থাকেন। তিনিও বিশ্বাস করেন– অশিক্ষিতের পটুত্বই হচ্ছে ছড়া রচনার সফলতা। আল মাহমুদ ছড়াকার ও কবির ভেদরেখা মান্য করেন না। ছড়া– কবিতারই অংশ। সেই অর্থে ছড়াকারও আসলে কবি। কবিতারও নানা ফরম আছে। সেই ফরমের একটি রূপ ছড়া।

আল মাহমুদের পথ ধরেও আমাদের ছড়া বেশিদূর এগোতে পারেনি। অব্যাখ্যাত ও রহস্যময় এর কারণ। লোকছড়া বা খাঁটি দেশজ ছড়া থেকে বিযুক্তির কারণ কী আমাদের? শুধুই মেধাহীনতা? আত্মনিমগ্নতার অভাব? নাকি সস্তা জনপ্রিয়তার দুর্মর লোভ?

বাংলা ছড়া এখন একঘেয়ে ক্লিশে। বহু ব্যবহৃত এর বিষয়ভাবনা। ছন্দবৈচিত্র্যের বড় অভাব। ছড়া এখন বড়ই কাব্যসংক্রান্ত। কবিদের হাতে ছড়া কবিতাগন্ধী।

নানা বিচিত্র পথে ছড়ার অগ্রযাত্রা। নানা বিষয়কে ছড়া ধারণ করে। কোন অলীক যাত্রাপথে ছড়ার অনির্দিষ্ট গন্তব্য– কোন স্বপ্নযাত্রায় তার গতিপথ তা হয়তো এই মুহূর্তেই বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। বহু বিচিত্রগামী আমাদের ছড়া। গত একশো বছরে বাংলা ছড়ার নানা গতিপ্রকৃতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন আছে। সরল ও সাদা চোখে সব বৈশিষ্ট্য হয়তো শনাক্ত করা সম্ভবও না।

বাংলা ছড়ার গর্বিত উত্তরাধিকার আমরা। লোকছড়ার বিস্তৃত পরিক্রমায় যদি আমাদের ছড়া নতুন দিনের নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাহলেই হয়তো আমরা খুঁজে পাব আমাদের সঠিক গতিপথ।

অমিত সম্ভাবনা রয়েছে ছড়া মাধ্যমটির। নতুন যুগের নতুন ছড়াকাররা সেই নতুন ভাবধারার ছড়া লিখে পূর্ণতা দান করবে।

হাস্যরসই আমাদের ছড়ার একমাত্র চরিত্রবৈশিষ্ট্য– এ কথা মানতে আমাদের বড় কষ্ট হয়। সৃজনশীল ও নতুন যাত্রার পথ বড় বন্ধুর। বড় কঠিন।

ছড়াকে একঘেয়েমির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে– তার দায়িত্ব কে নেবে? বুড়ো মগজে, ক্ষয়িষ্ণু বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে, উপনিবেশিক চেতনায় নতুন ছড়া লেখা সম্ভব নয়।

নতুন ছড়াকারদের হাতেই বাংলা ছড়া মুক্তি পাবে। তবে ছড়া লেখা বিষয়টা সহজ নয়। ভালো ছড়া লিখতে হলে জীবনপাত করা দরকার। আর একটা ছড়া সফল বা চিরন্তন হয় কেন, সেই উত্তরও ব্যাখ্যাতীত। আমরা কেউ জানি না। সার্থক ছড়া কিভাবে রচিত হয় তারও কোনো সহজ পথ নেই।

বহু বিচিত্র পথধারায় আমাদের ছড়া স্বর্ণালি তোরণে জয়ধবজা ওড়াবে– এই আশাবাদই সার্থক করে তুলবে আমাদের ছড়াসাহিত্যকে।

মিল– ছুটি নাও

কেউ কেউ মনে করেন, মিল হচ্ছে ছড়ার প্রধান প্রাণশক্তি। মিলের অভিনবত্ব, চমৎকারিত্ব ও কারিকুরি দেখিয়ে কেউ কেউ ছড়াকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই সার্থক অন্ত্যমিলের অভিনব প্রয়োগ লক্ষ করি। উৎকৃষ্ট ছড়ায় অন্ত্যমিল, বিষয় ও ছন্দের পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন হয়। অন্ত্যমিল, মধ্যমিল, অনুপ্রাস ও ছন্দ যখন পায়ে পা মিলিয়ে চলে ছড়া তখন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু শুধু মিলের বাহাদুরি সার্থক ছড়া রচনার প্রধান শর্ত নয়। মিল হচ্ছে অলংকার। দেখতে রূপসী নয় এমন নারীকে যখন অতিরিক্ত অলংকারে সাজানো হয় তখন তাকে বীভৎস লাগে। অতিরিক্ত মিলের বাহাদুরিতে ছড়া তেমনই অসুন্দর হয়ে ওঠে। বিষয় থাকে না, ভাব উড়ে পালায়। অন্ত্যমিল সহজ ও স্বাভাবিক না থাকলে ছন্দও ধাক্কা খেয়ে চলতে থাকে।

মিল হচ্ছে এক ধরনের লোভ ও মোহ। ছড়াকাররা লোভের ফাঁদে পা দিলে ছড়ার প্রাণবায়ু উড়ে যেতে বাধ্য। তাই বিষয়কে ধারণ করে এমন স্বতঃস্ফূর্ত মিলই ছড়াকে চিরকালীন করে তোলে। শব্দ ভেঙে ভেঙে মিল সৃষ্টিতে ওপর-চালাকি থাকতে পারে, চকিত-চমক খুঁজে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সহজ ছড়াপাঠ্যের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে শতভাগ।

২. কবিতায় অন্ত্যমিলের মুক্তি ঘটেছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হাতেই। গদ্য ও কাহিনিপ্রধান অনেক কবিতা তিনি রচনা করেছেন মিলহীন। তিরিশের কবিদের কাব্যচর্চায় অন্ত্যমিল নির্বাসিত হল। বাংলা কবিতার বিপুল-আয়তন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আমরা উপলব্ধি করি ছন্দ আছে, সুর আছে কিন্তু মিলকে ছুটি দেয়া হয়েছে। কবিতার প্রাণ যে মিল নয়– সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। মিলের মুক্তি ঘটে যাওয়ায় কবিতার আকাশ অনেক বিস্তৃত হয়েছে।

কিন্তু ছড়ার এই দৈন্যদশা কেন? একই কাঠামোয়, একই বৃত্তে ছড়া নেচে বেড়াচ্ছে। অন্ত্যমিল ভারাক্রান্ত বদ্ধ জলে আমাদের অধিকাংশ ছড়া নিশ্বাস নিচ্ছে মৃত্যুপথযাত্রীর মতো।

ছন্দ তো মিলের অনুগামী নয়। ছন্দময় বাক্যে মিলহীন ছড়া কি হতে পারে না? বাংলা ভাষায় যদিও মিলহীন সার্থক ছড়ার তেমন কোনো উজ্জ্বল উদাহরণ নেই। আমরা যারা ছড়ালেখার সামান্য চেষ্টা করি তারা কি নিরীক্ষাধর্মী অন্ত্যমিলহীন ছড়া লেখার চেষ্টা করতে পারি না! মিলের প্রতি আমাদের আসক্তি কেন? মিলের প্রতি দাসত্ব কেন? কবিতার ভুবন থেকে মিল অনায়াসে ছুটি পায়। আর ছড়ার পৃথিবীতে মিল অলংকারের মতো আঁকড়ে থাকে কেন?

একদা এমনদিনের প্রত্যাশা করি, যেখানে মিল তার সকল শক্তি সঞ্চয় করে দূরে বসে বিশ্রাম নেবে। বিষয় আর ছন্দই হবে ছড়ার মূল প্রাণশক্তি।

মিলকে ছুটি দিয়ে দেখা যাক না– ছড়া কোন পথে যায়?

ধ্বনি-মিল

বাংলা ভাষার শব্দ ও ছন্দবৈচিত্র্যে খুব বেশি লক্ষণযোগ্য চিহ্ন দেখা যায় না। প্রধানত ক্রিয়াপদ ও দ্বিরুক্তি শব্দের বহুল মিল-ব্যবহার আমাদের ছড়াকে করেছে একঘেয়ে, ক্লিশে, জীর্ণ ও ক্লান্তি কর। যেসব ক্ষেত্রে অভিনব মিল বা মিলের কারিসমা দেখি সেখানে মিলগুলোই উচ্চকিত হয়ে ওঠে। ছড়ার বিষয় সেখানে একেবারেই গৌণ। মিল এবং বিষয়– একত্রিত হয়ে নিটোল ছড়া হয়ে উঠেছে এমন উদাহরণ আমাদের ছড়াসাহিত্যে খুব বেশি নেই।

এমন অনেক ছড়াকার আছেন যাঁরা মিলনটাকেই প্রধান মনে করেন। অকারণে মিলের বাহাদুরিতে তাঁদের ছড়ার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত। অসংখ্য পুরনো ছড়ার দিকে তাকিয়ে আমার নিজেরই হতাশা জন্মে। কত ব্যর্থ-পরিশ্রমই-না করেছেন আমাদের ছড়াকাররা। অনেক উন্নাসিক (?) ছড়াকার আছেন যাঁরা অনুপ্রাসকে মিল বলে ভ্রম করেন এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো প্রকৃত ছড়াকারের রচনাতেও মিলের ভুল ধরে স্বস্তি পান। এই অর্বাচীন ছড়াকারেরা প্রথাবদ্ধ ধারণা মাথায় রেখে ছড়ার মিল বিচার করে থাকেন। কী অদ্ভুত ব্যাপার– মিল এবং অনুপ্রাসের সহজ পার্থক্য তাঁদের চোখে পড়ে না।

রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই ছড়ার সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন বাংলা ছড়ার পরিপুষ্টি সাধন করেছেন। মজার ব্যাপার– দাদাভাই কিন্তু মিলের চমৎকারিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। ছড়ার ভাব ও নিখুঁত ছন্দের প্রতি প্রেম ও আকর্ষণ ছিল। সম্পাদক হিসেবে দাদাভাই আমাদের ছড়াসাহিত্যকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়েছেন।

মিলের বৈচিত্র্য কেন ক্রমাগত লক্ষণযোগ্য হয়ে উঠল না ছড়ার শরীরে– এ আমার অপার বিস্ময়। মিল বলতে এখনও আমরা কী বুঝি? গাড়ি-বাড়ি/ নয়ন-চয়ন/ কান্না-পান্না/ পেয়েছি-খেয়েছি/ দেশ-বেশ/ সেলাম-খেলাম– এইসব সাধারণ মিলের প্রাচুর্য আমাদের ছড়াসাহিত্যকে দুর্বল ও খণ্ডিত করে তুলেছে। আর অলীক মোহময়, বৈচিত্র্যসন্ধানী মিলের চমকে শুধু মিলটাই আমাদের মনে থাকে। ছড়া মনে থাকে না– হারিয়ে যায়। আমবাগানে– হাম্বা গানে, আদ্দিসআবাবা– বাদ দিস না বাবা, আর্জেন্টিনাদের– গার্জেন টিনাদের, পৃথিবীটা কার বশ– পৃথিবী টাকার বশ, অভিরাম সাহা রায়, অবিরাম সাহারায়–এইসব চাতুরি মিল আমাদের

বিস্মিত করে। আমরা স্তম্ভিত হই। আমাদের স্মৃতিপটে সেসব গেঁথেও থাকে। কিন্তু ছড়া তখন কোথায় লুকায়? পুরো ছড়াটা কেন ছড়া হয়ে ওঠে না? এই প্রশ্ন আমার অনেক দিনের।

তবে খুব সাধারণ শব্দবন্ধের মিলও চমক জাগাতে পারে। আমাদের চেনা শব্দের সঙ্গে চেনা শব্দের মিল কিন্তু পূর্বে তা ব্যবহার হয়নি– এমন মিলও নতুন মিল হিসেবে বিবেচিত হয়। এবং আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। মা-নাই, ধানাই পানাই, রহমান-বহমান, জালনায়-আলনায়, লম্ফ-কম্প, চেয়ার-শেয়ার– এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়।

কিন্তু বাংলাদেশের ছড়ায় এখন পর্যন্ত ধ্বনি মিলের কোনো উদাহরণ দেখা যায়নি। একঘেয়ে মিলের শাসন থেকে ছড়ার মুক্তি ঘটবে কবে? ওপার বাংলার ছড়ায় ধ্বনি মিল নিয়ে কম-বেশি কাজ হয়েছে, হচ্ছে। লোকছড়া থেকে ধ্বনি মিলের একটি উদাহরণ দেয়া যাক–

হাট্টিমা টিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং....

পরিশুদ্ধবাদী ছড়াকাররা হয়তো টিম-এর সাথে ডিম মিলটা মেনে নেবেন কিন্তু ডিম-এর সাথে শিং মিলটা মেনে নিতে তাঁদের ঘোরতর আপত্তি হবে। কিন্তু ডিম বা শিং-এর এই যে ধ্বনিগত অন্ত্যমিল-এর সুরটা পাওয়া যায়। ধ্বনিগত এই সাদৃশ্যই ধ্বনি-মিল।

আধুনিক ছড়ালেখকরা কেন যে ধ্বনি-মিলকে উপেক্ষা করলেন এই রহস্যের উত্তর আমি জানি না। বাংলা ছড়ার অনেক নতুন বিষয়ের মতো অন্নদাশঙ্কর রায়ই প্রথম ধ্বনি-মিল ব্যবহারের চেষ্টা করেন। কোনো কোনো ছড়াকার ধ্বনি-মিলকে অনুপ্রাস বা দুর্বল মিল হিসেবে ভেবে থাকেন।

ধ্বনি-মিলের সার্থক প্রয়োগ করেছেন অল্পকিছু ছড়ার রচয়িতা কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবি বলেই হয়তো তাঁরা অতি নিরীক্ষা-প্রবণ। প্রথাবদ্ধ ছড়ার আঙিনায় তাঁরা হাঁটেননি। বাংলা ছড়াকে তাঁরা আধুনিকভাবে নতুন সুরে রচনা করেছেন। এই দুই কবির ছড়া একেবারেই ভিন্ন মাত্রায় চিহ্নিত। হয়তো তাঁদের সকল ছড়াই সার্থক হয়নি তবে অভিনতুন নিরীক্ষা-প্রবণতার কারণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ছড়াতে অসংখ্য ধ্বনি-মিলের উদাহরণ আছে। পর্বতে-বরবটি, রংপুর-মংপু, আমাদের-তামাদি– এই ধরনের অসংখ্য ধ্বনি-মিলের উদাহরণ দেয়া যায়।

কিন্তু বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ ছড়ার দিকে তাকিয়ে কিঞ্চিৎ হতাশাই বোধ করি কখনও কখনও। আমাদের ছড়ায় বৈচিত্র্যের বড় অভাব। নাম মুছে দিলে অনেক ছড়া শনাক্ত করা মুশকিল হয়। ছড়ার এই চর্বিত চর্বণঅবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি দরকার।

সেই মুক্তি অর্জনের জন্য ধ্বনি-মিলের বৈচিত্র্য নিরুয়ই আমাদের ছড়াকে নতুন পথে এগিয়ে নেবে।

আমাদের আগামী দিনের ছড়াকাররা ধ্বনি-মিলের ব্যবহার করবেন এই আশা তো আমরা করতেই পারি।

ছড়ার ভেতর দিয়ে দেখি ভুবনখানি

ছড়ার কোনো অনুবাদ হয় কি? কোনো ভাষান্তর হয় কি? ছড়া একক ও স্বয়ম্ভূ। ছড়ার সুর, ধ্বনি, ব্যঞ্জনা, শব্দের দ্যোতনা এসব এতটাই মৌলিক যে ছড়ার ভাষান্তর সম্ভব নয়।

বাংলা ভাষায় ছড়ার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ খুব বেশি নেই। ভাবার্থগত অনুবাদ হয়েছে। ইংরেজি ছড়ার রূপান্তরের উদাহরণ অনেক। ইংরেজি লোকছড়া কিংবা এডওয়ার্ড লিয়ারের অনেক লিমেরিকের রূপান্তরিত অনুবাদ ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি। মূল লেখার স্বাদ ভুলে গেছি। রূপান্তরিত ছড়া আমাদের মগজে গেঁথে আছে।

ছড়া সুর, ধ্বনি ও বিষয়ের খেলা। ভালো ছড়া সবসময় গুনগুন করে নাচে। স্মৃতির ভেতর ডালপালা বিস্তার করে।

আমরা জানি, বাংলা ছড়া অনেক শক্তিমান। বাংলা ছড়া দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহ্যময় শক্ত ভিতের উপর। বিষয়ের বৈচিত্র্য, ছন্দ-মিলের খেলা, পঙ্‌ক্তি ও স্তবকবিন্যাস, ধ্বনিঝংকার– এতসব ঐশ্বর্য নিয়ে যে বাংলা ছড়া, তাকে অবহেলা করার উপায় নেই।

বহুদিন ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ইংরেজি ছড়া পড়ার চেষ্টা করেছি। আধুনিক যুগের ছড়া কেমন হয়? আধুনিক ছড়ার বিষয় কেমন? ছোটদের ছড়া কতটা ছোটদের মনোগঠনের কাছাকাছি?

বিদেশি ভালো ছড়া আমাদের পাঠকমনকে বারবার বিস্ময়ের মুখোমুখি দাঁড় করায়। অবিশ্বাস্য সব কল্পনাশক্তি। ছড়ার নির্মাণ ও করণকৌশলও অভিনব। নিত্যনতুনের অভিযাত্রায় বৈচিত্র্যের সম্ভারে ইংরেজি ছড়া এত গভীর ও অর্থবহ তা অনুমান করাও কঠিন।

কত ধরনের ছড়া যে ইংরেজিতে লেখা হয় তার হিসাব মেলা ভার। পড়ি আর বিস্মিত হই। তারই কিছু আলোকণা, কিছু রূপ-রস-গন্ধ বাঙালি পাঠকদের কাছে তুলে ধরার ইচ্ছে আমার বহুদিনের। কখনও কখনও বিচ্ছিন্নভাবে অনেক ধরনের ছড়ার ভাব-অনুবাদ করেছি। আমার ছড়া রচনাবলিতে তার কিছু ছড়িয়ে আছে।

ইচ্ছে আছে কিছু কিছু ইংরেজি লোকছড়ার অনুবাদ করব।

রূপান্তরের মাধ্যমে আধুনিক ছড়াকারদের কিছু ছড়ার নমুনা তুলে ধরব। চিরন্তন কিছু ছড়ার অনুবাদের চেষ্টা করব।

কিন্তু মানুষের জীবনের পরিসীমা বড় সংক্ষিপ্ত। ছড়ার রূপ ও রস অনুভব করতে করতেই জীবন ফুরিয়ে যায়। বুঝতে না বুঝতে দেশি সূর্য পরিমে অস্ত যাচ্ছে। আর তাই 'হে বিদেশি ছড়া'য় শেল সিলভারস্টেনের কিছু ছড়ার ভাব-অনুবাদ করলাম। মূল রচনাকৌশলের সঙ্গে ভাবগত ঐক্য থাকলেও আমার অনুবাদিত ছড়াগুলো কিছুতেই আক্ষরিক অনুবাদ নয়। মূল ভাব অবলম্বনে নিজের মতোই লিখেছি। কখনও কখনও বড় বেশি স্বাধীনতা নিয়েছি। অনুবাদে কখনও ছন্দে লিখেছি। গদ্যছন্দেও লিখেছি। এ আমার ইচ্ছে ও খেয়ালখুশি। হয়তো কোনো কোনো ছড়া মূলের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে।

শেল সিলভারস্টেন পৃথিবীখ্যাত ছড়ালেখক। তাঁর ছড়া পাঠ করে যে আনন্দ পেয়েছি সেই উপলব্ধি অমরত্ব লাভ করুক। বিশ্বজুড়ে শিশুকিশোররা তাঁর ছড়া পড়ে আনন্দ লাভ করে। গোমড়ামুখোদের মুখে হাসি ফুটে।

তাঁর সৃষ্টিশীলতার বিশাল পৃথিবীতে বারবার আমি পথ চলে যাই। তাঁর ছড়ার অনুবাদ সম্ভব নয়। আমি উপরিতলের গন্ধটুকু সচেতন ছড়া-উৎসাহীদের তুলে ধরতে চেয়েছি।

২.

বিদেশি ভাষায় কেমন ছড়া লেখা হচ্ছে, কোন ধরনের ছড়া লেখা হচ্ছে– এটা আমরা জানতে চাই। কিন্তু বিশ্বব্যাপী চর্চিত সমসাময়িক ছড়া সম্পর্কে আমাদের তেমন কোনো ধারণা নেই। বিদেশি ছড়ার অনুবাদও হয় কম। তবে প্রশ্ন হল, অনুবাদের মাধ্যমে ছড়াকে কি অনুভব করা যায়? ব্যাপারটা অনেক সময় 'পরের মুখে ঝাল খাওয়া'র মতো।

ইংরেজি ভাষায় ছড়াকার ও কবি শেল সিলভারস্টেন আমার অতি প্রিয় লেখক। তাঁর চারটা বিখ্যাত ছড়ার বই আমি সযত্নে বহন করি। মন খারাপ থাকলে তাঁর ছড়া পড়ি। আর নিজেই একা একা হাসতে থাকি। আমার সংগ্রহে থাকা তাঁর চারটি ছড়ার বইয়ের নাম : Where the Sidewalk Ends Ges A Light in the attic, Eevrything on.

আগেই বলেছি, শেল সিলভারস্টেন একাধারে কবি ও ছড়াকার। নিজের ছড়ার সঙ্গে নিজেই ছবি আঁকেন। শিশুদের জন্য মজার মজার গল্পও লিখেছেন তিনি। গান লিখেছেন, কার্টুন এঁকেছেন, গিটার বাজাতেও পছন্দ করেন তিনি।

ধ্রুব এষের খুব প্রিয় ছড়াকার শেল সিলভারস্টেন। Falling Up বইটি কলকাতার অক্সফোর্ড বুক শপ থেকে কিনেছিলাম। বাকি বইদুটো নিউইয়র্কে 'বার্নস অ্যান্ড নোবলস' নামের বিখ্যাত বইয়ের দোকানের এক র‍্যাকে বড় অবহেলায় পড়ে থাকতে দেখে খুব দুঃখ পাই। এ ছড়াও চতুর্থ বইটি সংগ্রহ করেছি নিউইয়র্কের ইউনিয়ন স্কোয়ারের বিখ্যাত 'STRAND' থেকে।

ছড়ার কদর পৃথিবী জুড়েই কম। ছড়া লেখাও হয় কম।

ছড়ার পাঠকও কম।

তবে শেল সিলভারস্টেনের ছড়া কল্পনাশক্তি, চমকপ্রদ ইলাস্ট্রেশন এবং অভিনব বিষয়বৈচিত্র্য– সবকিছু মিলিয়ে অদ্ভুত এক পৃথিবীর সন্ধান দেয় আমাদের। তারই কিছু মণিমুক্তো স্বাধীনভাবে মনের আনন্দে অনুবাদ করেছি।

বিদেশি ছড়া, আমাদের বাংলা ছড়াকে আধুনিকতার পথে নিয়ে যাবে। বাহির এবং অন্তর্জগৎ যখন এক হয়ে যায় তখনই শিল্পের সাফল্য।

ছড়ার কি অনুবাদ হয়?

গান, কবিতা, ছড়া এসবের অনুবাদ সম্ভব নয়। ছড়ার প্রকাশভঙ্গিতে আছে নানা অনুষঙ্গ। ছন্দ, মিল, অনুপ্রাস, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, শব্দের ধ্বনিঝংকার– কত কিছু একসঙ্গে মিলেমিশে একটা ছড়া অমরত্ব পায়। বাংলা ভাষার ছড়া যেমন ইংরেজিতে অনুবাদ হয়নি তেমনি ইংরেজি ছড়াও বাংলায় অনুবাদ হয়নি। দু-একটি ব্যতিক্রম আছে অবশ্য।

কিছু লোকছড়া বা Mother Goose-এর ছড়া এবং এডওয়ার্ড লিয়রের কিছু ছড়া ছাড়া বাংলাভাষায় ইংরেজি ছড়ার ভাষান্তর হয়নি বললেই চলে। হয়তো ছড়ার অনুবাদ হয় না

বলেই লেখকদের এই উদাসীনতা। অনুবাদে মূল ছড়ার রূপ-রস-গন্ধকে তুলে আনা অসম্ভব। ইংরেজি ছড়ার অন্ত্যমিল ও অনুপ্রাসের সামান্য পরিচয়ও অনুবাদে সম্ভব নয়। ইংরেজি বৈচিত্র্য অনেক বেশি। তাদের জীবনযাপনও অনেক
বিস্তৃত। বিষয়ভাবনায় অনেক বিস্ময়কর প্রসঙ্গ থাকে।

আমি সাহস করে অনুবাদ করেছি– বিস্তর স্বাধীনতা নিয়েছি। মূল বিষয়টাকে সৎভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। ছড়ার প্রকৃত আনন্দ অনুবাদে পাওয়া সম্ভব নয়। এই সীমাবদ্ধতা আমাদের মেনে নিতেই হবে।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই– এসব অনুবাদে আমার অক্ষমতা সুস্পষ্ট। কিন্তু উদ্যোগ তো নিতেই হবে। কেউ না কেউ তো বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবেই।

দুই.

এর আগে সিলভারস্টেনের কিছু ছড়া অনুবাদ করেছিলাম। 'হে বিদেশি ছড়া' নামে সেই বইটা চন্দ্রাবতী একাডেমি থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাভাষার সঙ্গে ইংরেজি আধুনিক ছড়ার সামান্য সংযোগ স্থাপন হয়েছে 'হে বিদেশি ছড়া'র মাধ্যমে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার আরেকটি বই।

এই অনুবাদ-ছড়া লিখতে গিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ইংরেজি ছড়া পড়া হয়েছে। বারবার বিস্মিত হয়েছে ওই ছড়াকারদের বিষয়ভাবনা দেখে। তাঁদের উন্নত জীবনের প্রেক্ষাপটেই বিষয় অভিনব হয়ে ওঠে। তাঁদের ফ্যান্টাসির কিংবা উদ্ভট রসের জগৎও সম্পূর্ণ আলাদা। ইংরেজি ছড়ায় হড়হংবহপব বিশাল জায়গা জুড়ে আছে। সুররিয়ালিজম কিংবা ম্যাজিক রিয়ালিজমের সন্ধানও পাওয়া যায় এসব ছড়ায়।

তিন.

শেল সিলভারস্টেনের ছড়া অনুবাদ করতে গিয়ে বিপুল এক পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছিলাম। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা ছড়াকার। যিনি ফ্যান্টাসি আর ননসেন্সের মাথায় চড়ে বিশ্বজয় করেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ছড়াকারদের ছড়া পড়ে মাথাটা ঘুরপাক দিয়ে উঠল। এত আরুর্য সুন্দর কল্পনাশক্তি কী করে ওরা আয়ত্ত করল, যাদের ছড়া পড়ে বিমুগ্ধ হই সেই তালিকায় আছেন– Ogden Nssh, William Cole, Peter Dixon, Douglas Floirian, Hillary Beloc, Roger McHough, Jack Prelutsky, Kit Wright, Arnold Spikha প্রমুখের ছড়া পড়ে বারবার বিস্মিত হয়েছি। ছেলেবেলায় ফিরে গেছি। তারই কিছু মণিমুক্তো আমাদের ছড়াপ্রেমিকদের হাতে তুলে দেবার জন্য অক্ষম প্রয়াস।

জানি, প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। ইন্টারনেটে এই ছড়াকারদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে। অনুবাদের মাধ্যমে আমি সেই সূচনা করলাম মাত্র। আর বলতে দ্বিধা নেই, শত শত ভালোলাগা ছড়া অন্তরালে রয়ে গেল। ভবিষ্যতে আরও ছড়া অনুবাদের ইচ্ছে আছে। ছড়া যখন ধরা দেবে না, মগজের কোষে কোষে বন্ধ্যাত্ব তৈরি হবে, তখন আবারও অনুবাদে হাত দেব।

[লেখক: ছড়াশিল্পী ও শিশু-কিশোর সাহিত্যিক ।]

প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল

আ ন জী র লি ট ন

ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনাই শিশুসাহিত্য। হতে পারে গল্প, ছড়া, কবিতা, উপন্যাস, জীবনী, জীববৈচিত্র্য এবং আরও অন্যান্য বিষয়। শিশুসাহিত্য বিষয়ের দিক দিয়ে সীমাহীন। কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভাষা, বাক্য গঠন, শব্দশৈলী, বিষয় নির্বাচনে সতর্ক থাকতে হয়। এটি শিশুর মনোজগৎ স্পর্শ করছে কিনা সে বিষয়টিও বিবেচ্য। এসবের ওপর ভিত্তি করেই শিশুসাহিত্য গড়ে উঠেছে বড়দের কলমে।

শিশুসাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই, বাংলাদেশে গত পাঁচ দশকের শিশু-কিশোর উপযোগী লেখায় গুণগত পরিবর্তন এসেছে।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকে ছড়া-কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রভাবনার উত্তরাধিকার। যেখানে প্রভাব পড়েছে লোকজধারা। সত্তরের দশকে দেখা গেছে অন্ত্যমিলগত নতুন ছন্দ খোঁজার প্রবণতা এবং আশির দশকে সমসাময়িক ঘটনার আলোকে জীবনবোধের ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি। সেই সঙ্গে বিষয়বৈচিত্র্য। নব্বইয়ের ছড়ায় পাওয়া গেছে রাজনৈতিক ধারার স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ নির্মাণকৌশল। ছড়ায় যেমন উঠে এসেছে সমাজচিত্র, তেমনি শিশু-কিশোর-উপযোগী কবিতায় উঠে এসেছে বৈচিত্র্যময় পরিবেশ-প্রকৃতির ছবি। দশকওয়ারি বিবেচনায় শিশুদের উপযোগী ছড়া-কবিতায় যে উজ্জ্বলতম প্রকাশভঙ্গি বিভিন্ন লেখায় পাওয়া গেছে, তা এখনো বহমান।

রকমারি গল্পের ঝলক আছে শিশুসাহিত্যে। এর প্রাণশক্তি দিয়েছেন উপেন্দ্রকিশোর রায়, যোগীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়। জীবনের কথা, মায়া-মমতার কথা, বড় হয়ে ওঠার কথা– সব কথাই বর্ণিল হয়ে উঠেছে শিশু-কিশোরদের গল্পকথায়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসীমউদ্দীনের হাতে সেই কথাগুলো আরও মুক্তোদানা হয়ে ছড়িয়েছে পাঠকের প্রাণে-প্রাণে। এসব গল্পে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চরম উপদেশগুলো অতিমাত্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে কখনো-কখনো। কল্পনার তুমুল আলোড়ন যেমন আছে, তেমনি এসব গল্পে আছে অবিশ্বাস্য ফ্যান্টাসি জগতের কান্ডকীর্তি। না-দেখা ভূতের হাতছানিও গল্পের জগতে কখনো ভয় যুগিয়েছে, আবার ভূতকে তাড়িয়ে দেবার বাসনা নিয়ে শিশু-নায়করা ঘোড়ায় চড়ে ছুটেছে টগবগিয়ে। কত রাজকুমার, ডালিমকুমার ছুটে বেড়িয়েছে গুপ্তধনের সন্ধানে। লালপরী-নীলপরীরা শিশু-কিশোরদের জন্য তৈরি করে দিয়েছে স্বপ্নময় ভুবন। এ সব নিয়েই সমৃদ্ধ হয়েছে শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডার।

যুগ পাল্টে যায়। পাল্টে যায় সময়। কিন্তু জীবনের অনুভূতিগুলো একই থাকে। শুধু বদলে যায় বলার ভাষারীতি, বদলে যায় উপস্থাপনার কৌশল আর বিষয়-বৈচিত্র্য। তাই তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও হয়ে উঠল শিশুসাহিত্যের গল্পের বিষয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শিশু-কিশোরদের গল্পের ভাষায় ও আঙ্গিকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের কথা, একাত্তরের কথা, স্বাধীনতার কথা। দেশপ্রেমের কথা। সেই সঙ্গে আছে ছোটদের মনোজগৎ স্পর্শ করা হাস্যরস, গোয়েন্দা, অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। বিজ্ঞান, প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য, অভিযান কাহিনি, রোমাঞ্চকর কাহিনী– নানান বিষয়ে রচিত হয়েছে বাংলা শিশুসাহিত্য। হালে যুক্ত হয়েছে সায়েন্স ফিকশন। এগুলো সমৃদ্ধ করছে আজকের তরুণ গল্পলিখিয়েরা।

শিশুসাহিত্যের গল্পগুলো কীর্তিমান লেখকদের হাতে যেমন স্বর্ণালি শোভা এনেছে, তেমনি তরুণদের হাতেও সম্ভাবনার দোলা দেখিয়েছে। শিশুসাহিত্যের কপাল এতই স্বর্ণছোঁয়া যে, যতই দিন গড়িয়েছে, ততই এটি পূর্ণ হয়েছে লেখার শক্তিতে, জীবনকে দেখার অভিজ্ঞতায়। শিশুসাহিত্যের বাতিঘর যাঁরা; যাঁদের হাতে দিক রচিত হয়েছে, ভাষা রচিত হয়েছে সেইসব কীর্তিমান লেখকদের লেখাতেও আছে জীবনের কথা, সময়ের কথা, সমাজের কথা। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলা যায়। তাঁর লেখা মানেই বড়দের লেখা। এরকম একটি ধারণা সাহিত্যাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তারাশঙ্করের শিশু-কিশোর-উপযোগী লেখাগুলো পাঠ করলে সেই ধারণা ভুল প্রমাণ হতে পারে। কারণ, তিনি অতি বিশ্বস্ত ছিলেন শিশু-কিশোর উপযোগী লেখাতেও।

ছোটদের জন্য রচনায় শ্রেণি-সংগ্রামের দ্বন্দ্ব যেমন তুলে ধরেছেন তেমনই প্রকাশ করেছেন স্বাধীনতা ও মুক্তির আকুতি। প্রথাগত নরম তুলতুলে প্রকৃতির ছবি ঘাসফুল জলফড়িং প্রজাপতির কথাই লিখেননি শুধু তুলে এনেছেন জমিদারদের শোষণের কথা, নাঙ্গাভুখা মানুষদের স্বপ্নের কথা 'সংগ্রামের কথা', কেমন করে স্বাধীন হওয়া যায় তার কথা। হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতেও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছেন। তেমনই এক গল্প 'সুকু ও ভুকু'।

ভিখারি ওরফে ভুকু– ওরফে ভাকি। আর সকুমার ওরফে সুকু। ভুকু একটি কুকুর। শুধু একটি এগারো-বারো বছরের ছেলে। সুকুর জেঠতুতো বোন মিনি সুকুকে ক্ষেপাবার জন্য ঘরের দেওয়ালে ছড়া লিখল–

সুকুর এবং ভুকুর
মিলন দেখিয়া ঠাকুর
হাসিছে খুকুর খুকুর।

সুকু ছড়াটা মুছে দিল একদিন। মুছে দেয়া ছড়ায় পাশে মিনি আবার লিখল–

ভিখিরি হলেন ভুকু
চুকু-চুকু-চুকু
ওরে নেড়ি কুত্তার হারাধন
রইল তোর নিমন্ত্রণ
বল দিকিনি কোথা?
বাড়ির পিছে ময়লা গাদা যেথা।
ভুকু যাবে খেতে
সুকু যাবে সাথে।

জবাবটা হঠাৎ গেল সুকুর মাথায়। সে লিখল তার পাশেই

পুলিশ কুকুর লাকি
সুকুর কুকুর ভাকি
সাবধান মাছ চোখী
(মিনির নাম মিনাক্ষী)
চুরি করে খাচ্ছ কী
ভাকি গিয়ে ধরবে
কাঁদলে না ছাড়বে
সাবধান সাবধান
যাবে প্রাণ যাবে মান।

ছন্দময় রচনার সাবলীল ভঙ্গিতে তারাশঙ্কর ছোটদের জন্য কলম ধরেছেন। শিশুসাহিত্যের গদ্য শাখায় বড় ক্রান্তিকাল চলছে বলে মনে করি। রূপরেখা নির্ণয় করা যাচ্ছে না। বিজ্ঞান প্রযুক্তি আর তথ্যপ্রবাহের নানা মাধ্যম শিশুদের মগজকে গুলিয়ে দিচ্ছে। শিশুদের কাছে অনিবার্য হয়ে উঠছে না তাদের উপযোগী বইপত্তর। তার মানে কি শিশুর কল্পজগতে আর চেনা জগতের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো যাচ্ছে না? প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা তারাশঙ্করের মতো লেখকদের কাছে আশ্রয় খুঁজি না কেন? কী দেননি তিনি! সামাজিক সংঘাত মূল্যবোধ আর নৈতিকতার চিত্রমালা যিনি গল্পে গল্পে বুনে গেছেন তাঁকেই-বা সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যকর্মীরা কতটুকু মনে রাখছেন? শহরঘেঁষা জীবনের উপরভাসা চিত্রমালা কি পারছে ছোটদের মনোজগতে নতুন ব্যাকরণ তৈরি করতে? আমি মনে করি তারাশঙ্করের গল্প আজও পাঠের বিষয়।

প্রসঙ্গত তাঁর কিছু কথা না বললেই নয়– তখন যুদ্ধ চলছিল বাংলাদেশে। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ। লেখকের দায় থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে এলেন। সংহতি প্রকাশ করলেন এই অঞ্চলের মুক্তিকামী মানুষের প্রতি। গড়ে তুললেন বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি। সমিতির সভাপতির দায়িত্ব নিলেন তারাশঙ্কর। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে চূড়ান্ত দিন পর্যন্ত নিতে পারেননি। তার আগে ১৯৭১-এর ১৪ সেপ্টেম্বর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় চিরবিদায় নেন।

কিন্তু রেখে যান বাংলা সাহিত্যের অমর কীর্তি। বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

রাজনৈতিক উত্তাপ তাঁকে স্পর্শ করেছে কৈশোরকালে। যৌবনে যোগ দেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে। সক্রিয় কর্মী হিসেবে গান্ধীতত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর কাগমারী রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে (১৯৫৭, ফেব্রুয়ারি) ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছেন তিনি।

রাজনীতিকে চেতনায় ঠাঁই দিয়ে তুমুল আবেগে রচনা করেছেন গল্পকথা। অভাগী নিম্নবর্গের মানুষ আর তাদের সংগ্রামী জীবনকে উপজীব্য করে লেখা যেসব আখ্যান তারাশঙ্করের কলমে উঠে এল বাংলা কথাসাহিত্য সে ভিন্নমাত্রায় অবস্থান করার একটা প্রেক্ষাপট খুঁজে পেল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে এমন এক জগৎ তৈরি করেছেন যে জগতে বারবার পৌঁছতে হয় আমাদের। বড়দের জন্য লিখে তিনি ছোটদের জন্য কলম ধরতে ভোলেননি। তাঁর সাহিত্যজগতে ছোটরাও ছিল প্রাণ। বর্তমান শিশুসাহিত্যের যে ধারা প্রবহমান– এই ধারার সাম্প্রতিককালের শিশুসাহিত্যিকরা তারাশঙ্করকে আমলে নিতে শেখেননি বলা যেতে পারে। এর প্রধানতম কারণ ছোটদের জন্য তারাশঙ্করের লেখা অনেকটা অনালোচিত। প্রাবন্ধিক-সমালোচকদের একপেশে দৃষ্টিও এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। *জলসাঘর*, *কবি* কিংবা *চাঁপাডাঙ্গার বউ আর হাঁসুলি বাঁকের উপকথার* মাঝে তারাশঙ্করকে বারবার খুঁজতে গিয়ে ছোটদের সাহিত্য রচনায় যে ভূমিকাটি রয়ে গেছে তা ধরা পড়ছে না আধুনিক পাঠক প্রজন্মের কাছে? বড়দের জন্য লিখেও ছোটদের জন্য কলম ধরে সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছেন এমন লেখকদের তালিকায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটিও উজ্জ্বল। ১৩৫০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় ছোটদের *মৌচাক* পত্রিকায় ছাপা হয় 'ডাইনি' গল্প। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে ছাপা হয় 'সত্যাজয়ে কাহিনী'।

ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি যে টান আমরা অনুভব করি সেই ধ্রুপদী সাহিত্যকে শিশুসাহিত্য থেকে আলাদা করা যায় না। বরং শিশুসাহিত্যের মোড়কে ধ্রুপদী সাহিত্য রচিত হলেও তা বড়দেরকেও বারবার টেনেছে। তারাশঙ্কর সেই ধ্রুপদীধারার একজন লেখক। এই তালিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও উঠে আসে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয়ের গল্পই শোনাতে চেয়েছেন ছোটদের কাছে। ছোটদের সাহিত্যকে কখনোই তুলতুলে নরম পেলব, ন্যাকামি ভরা শব্দের জাদু দিয়ে ভোলাতে চাননি। এমনকি প্রচলিত ভূত-পেত্নীর গল্পকেও তিনি কুসংস্কার দিয়ে ভরাতে চাননি। ছোটদের কাছে

উন্মোচন করেছেন, জানিয়ে দিয়েছেন ভূত সেজে থাকা মানুষের আসল রহস্য। তিনি তাঁর ছোটদের লেখায় মাটি আর মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন। ছোটদেরও চেনাতে চেয়েছেন মানুষের এক জীবনে থাকা নানান সংঘাতের কথা। এগুলো শক্ত হাতে দমন করে সমাজসচেতন থাকার প্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি। সমাজ-সচেতনতা তৈরি হয় ছোটবেলা থেকেই। যে জন্য ছোটদের লেখায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন 'বিষয় ও অনুসন্ধিৎসা' দৃষ্টি। তিনি বলেন– 'বড়দের জন্য লেখা এমন গল্প যদি বেছে নেওয়া যায় যাতে কিশোর-মনকে বিগড়ে দেবার মতো কিছুই নেই, বরং গল্প পড়ে বড়দের জীবন-সংঘাতের কম-বেশি পরিচয় পেয়ে কিশোর-মন নাড়া খাবে, বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসা জাগবে, সেরকম গল্প কিশোরদের পড়তে দিলে দোষ কী?'

যেভাবে বড়দের কাছে বড়দের কথা বলেছেন তেমনি ছোটদের কাছেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে চেয়েছেন, বড় হতে হলে ছোট থেকেই কীভাবে নিজেকে তৈরি করতে হয় সেই কথা। লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই এসব কথা জানানো যায় না বলেই তিনি কলম ধরেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বাসের জায়গাই ছিল লেখালেখি।

আজকের সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছেন পাঠক-গবেষকদের কাছে। তাঁর রচনাশৈলী নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ চলছে। বেরিয়ে আসছে তাঁর মনোজগতের অলি-গলি। যদিও জীবৎকালেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা আলাদা বৈশিষ্ট্যে সাহিত্যের উচ্চ আসন পেয়েছিলেন, অর্জন করেছিলেন পাঠকপ্রিয়তাও তবুও সময়ের প্রতিনিধিত্বকারী প্রাবন্ধিক-গবেষকরা হয়তো খামোখাই এড়িয়ে গেছেন মানিক-অধ্যায়। তা না-হলে *পদ্মানদীর মাঝি*, *পুতুল নাচের ইতিকথা*, *জননী*, *প্রাগৈতিহাসিকের* মতো রচনাগুলো যখন বাংলাসাহিত্যের আলোকবর্তিকা হয়ে আসে তখন উল্লেখহীন হয়ে থাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত শিশু-কিশোরদের সাহিত্যভাণ্ডার।

ক্রমশই বাংলা সাহিত্যের পাঠক হিসেবে আমরা আরও সচেতন হয়ে উঠছি। অস্তিত্বের শেকড় খুঁজতে গিয়ে তুলে আনছি চিরন্তন বাংলার রূপ ঐতিহ্যপূর্ণ জীবনযাপনের সংস্কৃতি। জানছি সে সময়কার ভাষারীতি। চিনছি দুঃখ-সুখের বলয়ে থাকা চরিত্রগুলোকে। দেখছি সংসারজীবনের টানাপড়েন, মানবিকতা, সাহসিকতা, সংগ্রামী চেতনা আর জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পসমূহ। এই সূত্র ধরে আধুনিক পাঠকদের কাছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন আলোয় উদ্ভাসিত একজন কীর্তিমান লেখক। যিনি তাঁর সময়ে বসে আমাদের বর্তমান সময়কে দেখেছেন একই স্রোতধারায়। আমরা তাঁকে বরণ করে নিচ্ছি নতুন প্রজন্মের লিখিয়েদের অভিভাবক হিসেবে।

সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বলা হয় নতুন যুগের কবি। শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ্যে তাঁর একটি চিঠি প্রকাশ পায় ১৯৪৪ সালের ৭ অক্টোবর। তখন কবি যুক্ত ছিলেন রাজনীতির সঙ্গে। চিঠিতে সুকান্ত লিখেছিলেন– 'তোমরা প্রথমে নিজেদের লেখাপড়া ও আচার-ব্যবহার-চরিত্রের উন্নতির দিকে নজর দেবে। নিজেদের স্বাস্থ্য ও খেলাধুলার দিকেও নজর দেবে সেই সঙ্গে। তোমরা গরিব ও অসুস্থ ছেলেদের সবসময় সাহায্য এবং সেবা করার চেষ্টা করবে। নিজের

পাড়ার বা গ্রামের উন্নতির জন্য প্রাণপণ খাটবে। আর এই সমস্ত কাজ দেখিয়ে অভিভাবকদের মন জয় করার চেষ্টা করবে।'

রাজনীতি করার মধ্য দিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাধীনতার আদর্শ ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন গণমানুষের কল্যাণে। তাঁর রাজনৈতিক সংগঠনের নাম কমিউনিস্ট পার্টি। এই পার্টির একটি শাখা গড়ে উঠেছিল কিশোরদের জন্য। কবি সুকান্তকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কিশোরদের মেধা ও মনন বিকাশের জন্য। কবি সুকান্ত দায়িত্ব নিয়েছিলেন কিশোরদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা, দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধগুলো জাগিয়ে দিতে। কিশোর সংগঠনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে তাঁর এই চিঠির ভাষাই বলে দেয়, বড় হয়ে ওঠার প্রধান শক্তি কী কী হতে পারে।

সুকান্ত যে সময়টাতে কলম ধরেছেন, সে সময় রাজনৈতিকভাবে মানুষ তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। ধনী আর গরিবের মধ্যে সংঘাত তৈরি হয়েছিল। সুকান্ত তা কখনোই চাননি। তিনি চেয়েছিলেন সমতাভিত্তিক সমাজকাঠামো। যেখানে মানুষে-মানুষে থাকবে সহমর্মিতা আর থাকবে সম্পদের সুষম বণ্টননীতি। তাই তো সম্পদশালীদের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে কবি সুকান্ত হয়ে উঠলেন সোচ্চার। 'পুরনো ধাঁধা' নামে একটি ছড়ায় এ বিষয়টি সম্পর্কে আরো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। তিনি লিখলেন–

বলতে পার বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে?
গরিব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?
বড়মানুষ ভোজের পাতে ফেলে লুচি-মিষ্টি,
গরিবরা পায় খোলামকুচি, এ কী অনাসৃষ্টি?
বলতে পার ধনীর বাড়ি তৈরি যারা করছে
কুঁড়েঘরেই তারা কেন মাছির মতো মরছে?

কুঁড়েঘরে গরিব কেন মাছির মতো মরছে, এই যে প্রশ্ন– এই প্রশ্নের উত্তর কবি খুঁজে পাননি বটে কিন্তু তাঁর সাহসী কলমে রচিত প্রতিটি পঙ্‌ক্তিমালা আমাদের উজ্জীবিত করেছে। একটা বিভেদহীন সমাজ গড়ে তোলার জন্যে কবি সুকান্ত সংগ্রাম করেছেন। সুকান্ত এমন কবি 'যাঁর কাছে ক্ষুধার রাজ্যে পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি' হয়ে আসে। তাই তো তিনি ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শেখান আমাদের।

আমরা স্বাধীন দেশের লেখক। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার। এই অহংকার নিয়েই স্বাধীন দেশে জন্ম নেয়া আজকের শিশুরা দেশটাকে গড়বে। আর তাই তো দেশ গড়বার প্রেরণামূলক লেখা ছড়িয়ে দিতে হবে শিশুদের মনে। এই দায়িত্বটি শিশুসাহিত্যিকদের ওপরই বর্তায়। কারণ

শিশুসাহিত্যিকরা কল্পনার রঙে বিজয়ের গল্প শোনান। তাঁরাই শিশু-মনে জ্বালাতে পারেন আলোর প্রদীপ। শিশুসাহিত্যের দু'শ বছরের ইতিহাসে যে আলো ছড়িয়ে আছে সেখানে সমাজ বিনির্মাণের কথাও আছে। নৈতিকতার কথা আছে। আছে দেশপ্রেমের কথা। সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে শান্তিময় বৈষম্যহীন সমাজ গড়বার কথা। আজকের শিশুসাহিত্যিকরা এই বোধের জায়গা

থেকে জীবনের দেখা নতুন অভিজ্ঞতাগুলো তুলে ধরবেন লেখার ছন্দে-গদ্যে। আর এভাবেই তৈরি হতে পারে শিশুসাহিত্যের নতুন বাঁক, নতুন পথ। তৈরি হতে পারে শিশুদের জন্য রঙিন স্বপ্নময় জগৎ। পাঠকসমাজের কাছে আজকের শিশুসাহিত্যিকদের থাকতে হবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেমন ছিলেন নতুন যুগের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। বলেছিলেন–

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান ;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব– তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি–
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

[লেখক: শিশু-কিশোর সাহিত্যিক ও ছড়াশিল্পী। ডিজি, শিশু একাডেমি।]

প্র ব ন্ধ

ছড়ার আদি-অন্ত: যুগভিত্তিক একটি আধুনিক পর্যালোচনা

আ ল ম তা লু ক দা র

রবীন্দ্রনাথ দিয়েই শুরু করা যাক। "প্রাচীন ঋগবেদ ইন্দ্রনাথ বরুণের স্তবগান উপলক্ষে রচিত আর মাতৃহৃদয়ের যুগল দেবতা খোকা এবং পুটুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি।"[১]

বাংলা ছড়ার উৎস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ঐ উদ্ধৃতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রী বলেছেন, "এই স্তবটাইতো আসলে বুদ্ধির খেলা। বুদ্ধি দিয়ে বানানো ছন্দে কঠিন ঈশ্বরকে

কোমল ও দয়ালু বানানোর কৌশল। ঈশ্বরের মন গলাতে যেমন স্তব তেমনি কাঁদুনে ছেলেকে আহ্লাদে নাচিয়ে তুলতে ছড়া।"[২]

তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষের সাথে ছড়াও এসেছে। মানুষের-জন্ম সময়টা যেমন কেউ মনে রাখতে পারে না ঠিক তেমনি ছড়ার জন্মটা কবে হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে অদ্যাবধি কেউ বলতে পারেনি।

বাংলা ছড়ার উৎস সম্বন্ধে ড. নীতা কুঠিয়াল বলেছেন, "প্রাচীনকালে ছড়ার প্রচলন ছিল তবে তার রূপ ছিল ভিন্ন। অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে অপভ্রংশ ও অবহট্ট ভাষায় বাংলাদেশে বৌদ্ধ বজ্রমানিক ও বৌদ্ধনাথপন্থী যোগী সিদ্ধাচার্যগণ সন্ধ্যা ভাষায় ধর্ম বিষয়ক ছড়ার গান রচনা করেছিলেন। সে যুগে অবহট্ট ভাষায় রচিত নীতিবাক্য বহুদর্শীয় উপদেশ, আবহাওয়া ও কৃষি সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতামূলক ছড়াই কালক্রমে বাংলার ডাক ও খনার বচন নামে মৌখিক সাহিত্যরূপে উপস্থাপিত হয়। এতে ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা সামাজিক উপদেশাবলিই বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়।"

অর্চিতা রায় চৌধুরী বলেন, 'ছাড়া লিখিত সাহিত্যের পুরোগামী। একে আমরা বলতে পারি বাণীর সর্বপ্রথম অঙ্কুর। কবিতার আদিম বীজ। আদতে ছড়াই কবিতার জনক।'[৩]

অর্চিতা রায় চৌধুরী ঐ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতে– "ছড়ার সঙ্গে শৈশব সংস্কারের নিবিড় সংযোগ। বস্তুত শিশুর জন্যই ছড়া রচিত হয়েছিল এবং ছড়া ছিল মূলত শৌখিন প্রবাহী হালকা চালের ছন্দ। অপ্রত্যাশিত মিল ও বাগভঙ্গির বক্রতা না থাকলে ছড়া কবিতা হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু ছড়া হয় না।

ছট্ শব্দ হতে ছড়া শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা। ছড়া মানে ছড়ানো, ছড়িয়ে থাকা, বিস্তার করে থাকা। সাধারণ স্বরবৃত্তে ছন্দে রচিত যা গতিশীল এবং শ্রুতিমধুর। ছড়া একই সাথে জীবন্ত, চলন্ত এবং আর্ন্তজাতিক। সাহিত্যের সবগুলো শাখার মধ্যে স্মার্ট শাখা হল ছড়া। ছড়া যেখানে পাঠ করা হয় সেখানে অন্য মাধ্যম ম্রিয়মাণ, পানসে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি ছড়াকে মেঘের সাথে তুলনা করিয়াছি। উভয়ই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত। বায়ু স্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কাল বিচার-শাস্ত্রের বাহির। মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্র নিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃংখল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনা শিশু হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা গুণেই... "হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে এবং ছড়াগুলিও ভাবহীনতা অর্থ বন্ধনশূন্যতা এবং চিত্র বৈচিত্র্যবশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে– শিশুমনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।"[৪]

ছড়ার ইংরেজি প্রতিশব্দ জযুসব; Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend (১৯৪৭) গ্রন্থে Rhyme শব্দের আলাদা বিবরণ নেই; Nursery Rhyme শব্দটি আছে মাত্র, কিন্তু সংজ্ঞা নেই। তবে Encyclopedia Britannica (vol. vii) গ্রন্থে

Nursery Rhymes সম্পর্কে বলা হয়েছে; Verses customarily said or song to small children. শিশুদের কাছে প্রথাগতভাবে যে পদ্য বলা হয় তাই ছড়া খুব সাদামাটা কথা। G.A. Gurlling সম্পাদিত Every Man's Encyclopedia (vol a) গ্রন্থে বলা হয়: The verse generally consist of a rhyming couplet or a quatrain. There is frequently a refrain accuse paying the traditional musical settings. পারুত্যে দুই বা চার চরণের কবিতা আছে যাতে ঐতিহাগত ধুয়ার আবর্তন থাকে... Lullaby, craddle songs সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আলাদা পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে ছড়ার ভাবমূর্তি প্রকাশিত হয় না।[৫]

আর "ছড়া হল সমষ্টিগত লোকমনের সৃষ্টি, সমাজের সাধারণ মানুষের আবেগ, কল্পনা স্বপ্ন স্মৃতি অভিজ্ঞতার কথা পদ্যের ভাষায় ছন্দের বন্ধনে ক্ষুদ্র অবয়বে যে বাঙময় রূপ লাভ করে তাই ছড়া।"[৬]

তিনি উল্লেখ করেছেন ছড়ার কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন:

(১) "ছড়া মূলত আবেগ (২) ছড়া চর্চায় অংশগ্রহণ সব বয়সেই চলে। (৩) ছড়ায় বিষয়-বৈচিত্র্য প্রবল। (৪) ছড়ার নিজস্ব ছন্দ আছে। (৫) ছড়া আবৃত্তি-সুখকর (৬) ছড়ার ভাষা প্রকাশভঙ্গি সহজ সরল প্রত্যক্ষ (৭) ছড়া চিত্রবহুল ও ধ্বনি-স্পন্দিত বলে স্মৃতি ধরে রাখা সহজতর। (৮) ছড়া চিত্তবিনোদনের নির্মল মাধ্যম, নৈতিকতার বিচারে তা মূলত শ্লীল ও রুচিসম্পন্ন (৯) ছড়ার মধ্যে চিরত্ব আছে। পৃথিবীর সব দেশে সবসমাজে ছড়া আছে, এই সার্বজনীনতা ও সর্বকালীনতার গুণে ছড়া পুরাতন হয়েও চির নতুন।"[৭]

ঐসব বৈশিষ্ট্যের কারণে ছড়া সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখায় পরিণত হয়েছে। "ছড়া আন্তর্জাতিক ও জীবন্ত শিল্প।"[৮]

ছড়ার ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, মুখে মুখে ছড়া আদিকাল হতেই ছিল। ছড়ার লিখিত রূপটা বেশি দিনের নয়। ১৮৯৯ সালে যোগিন্দ্রনাথ সরকার খুকুমনির ছড়া শীর্ষক একটি গ্রন্থ সংকলিত করেছিলেন। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী গ্রন্থের ভূমিকায় প্রথম বারের মতো ছড়াকে সাহিত্যের বিষয় বলে উল্লেখ করেন।

যুগভিত্তিক আলোচনার আগে ছড়ার আত্মা-শরীর, তার পোশাক-আশাক নিয়ে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। ছড়া-বিশেষজ্ঞগণ ছড়ার গঠন-কাঠামো নিয়ে অনেক আলোকপাত করেছেন। ড. ওয়াকিল আহমদের *বাংলা লোকসাহিত্য: ছড়া* গ্রন্থে এসব বিষয় উল্লেখ রয়েছে।[৯]

১. আত্মকথন (Monologue)

সাধারণত একবচন বা বহুবচন উত্তম পুরুষের উক্তি হিসেবে এসব ছড়া রচিত হয়ে থাকে। যেমন:

"তাই তাই তাই
মামাবাড়ি যাই
মামার বাড়ি দুধভাত
পেটভরে খাই।" –জসীমউদ্‌দীন

অথবা
“কাঠ বেড়ালি কাঠ বেড়ালি
পেয়ারা তুমি খাও, গুড়-মুড়ি খাও?
বাতাবী লেবু তাও?” –কাজী নজরুল ইসলাম

২. সংলাপ (Dialogue)

সংলাপের ভিত্তিতে এসব ছড়া রচিত হয়ে থাকে। যেমন:
“আমি তোমার কে? তুমি আমার গঙ্গাজল
আমি তোমার কে? তুমি আমার জবাফুল।”
অথবা
“ও বুড়ো কী করো?
গাছ কাটি
কী গাছ?
খেজুর গাছ।”

৩. সম্বোধন আহ্বান (Address/Invitation) যেমন:
“আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যায়
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যায়।”

৪. গণনা (Enumetration) যেমন:
“আহম্মক এক
ছোট হইয়া বড়র সাথে যে দেয় টেক।
আহম্মক দুই
ঘর বাঁধিয়া যে না ধরে টুঁই।”
অথবা
“হারাধনের দশটি ছেলে.....”

৫. তালিকা (List/Series) যেমন:
“যাদু এতো বড় রঙ্গ
যাদু এতো বড় রঙ্গ
চার কালো দেখাতে পার
যাব তোমার সঙ্গ।”
অথবা
“ভালো ভালো কোন তিন ভালো।”

৬. গল্পমূলক: গল্পকে কেন্দ্র করে পুরো গল্পটাই ছড়ায় প্রকাশ করা। যেমন:
ভালুকের গল্প

৭. প্রশ্নোত্তর (Question-Answer) যেমন:
“ঢেঁকি লো? কী লো
কনে যাস? বাদাবনে।”

অথবা

"ঘুঘু সই
পুই কই?
কী ছেলে
ব্যাটা ছেলে
কোথায় গেছে?
মাছ ধরতে
ছুতোর কই?
নৌকা গড়াচ্ছে।
নৌকা কই?
জলে ডুবেছে।" রবীন্দ্রসংগ্রহ: ছেলেভুলানো ছড়া

৮. বিবরণ (Description) ঘটনা, ব্যক্তি, বিষয়, আশয় অবস্থার সাধারণ বর্ণনা নিয়ে এসব ছড়া লেখা হয়। যেমন:

"ফুলি ফুল তুলতে যায়
ফুলি ঠাণ্ডা ভাতা চায়
পা পিছলি ফুলি থুক্কু আছাড় খায়।"

৯. ধ্বন্যাত্মক শব্দগুচ্ছ: ছড়ার ছন্দলালিত্য ধ্বনিসৌন্দর্য, চিত্ররস, আকর্ষণীয় গুণ। শ্রুতির তৃপ্তির জন্য ধ্বনিমাধুর্য আবশ্যক। এই শ্রুতিসুখকর ধ্বনিচেতনা থেকে পদ্যে অন্ত্যমিল অনুপ্রাস অলংকার সৃষ্টি হয়। যেমন:

"ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি
আঁটল বাটুল শামলা শাটুল
হাড় কটকট হাড় কটকট
প্রাণ কট কট করে
সেই যে গেছে সেই মানুষ
আর আসেনি ঘরে।"

১০. পুনরুক্তি: যেমন:

"হরম বিবির খড়ম পায়
লাল বিবির জুতা পায়।"

অথবা

"হাতের নাচন
পায়ের নাচন
বাটা মুখের নাচন
নাটা চক্ষের নাচন
কাটালি ভুরুর নাচন।" রবীন্দ্রসংগ্রহ: ছেলেভুলানো ছড়া

১১. অনুসঙ্গ (Association) ছড়ার অবয়ব নির্মাণে সহচর-অনুচর প্রতিষ্ঠার শব্দসমূহ বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন বাবা-মা, ভাই-বোন, আজকাল, উঁচু-নিচু, আগাগোড়া, প্রতি শব্দ সোনা-রুপা, তেল-জল অনুচর শব্দ।

১২. ক্রমগুঞ্জতা: এরূপ ছড়ায় একটা কাজের সাথে আরেকটা কাজের শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। যেমন: কাক ও চড়ুই-এর আগুন সংগ্রহের গল্প ছড়ায় রূপান্তর করা হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যেও এরকম দেখা যায়। ছড়ার অফুরন্ত ভাণ্ডারে সন্তরণ সম্ভব নয়। যেমন:

"I'll tell you a story
a-Nory
And now my story begun,
I'll tell you another
About jake and his brother
And now my story is done."

সুকুমার রায় জ্যাক আ নরি নাম বদলিয়ে আবোল তাবোলে লিখেছেন:

"শোন শোন গল্প শোন
এক যে ছিল গরু
এই আমার গল্প হল শুরু।
যদু আর বংশীধর
যমজ ভাই তারা
এই আমার গল্প হল সারা।"

কাঠামোগত বিশ্লেষণের পর আমরা ছড়ার আত্মবিকাশের ধারাবাহিকতা নির্ণয়ের জন্য যুগভিত্তিক আলোচনা করে ছড়ার আদি-অন্ত অবলোকন প্রয়াসী হব। এ আলোচনায় প্রথমে আসবে আদিযুগ, তারপর মধ্যযুগ এবং সব শেষে আধুনিকযুগ।

সব কিছুর যেমন শ্রেণিবিন্যাস আছে ছাড়ারও তেমনি শ্রেণিবিন্যাস আছে। আধুনিক যুগ মানেই বিজ্ঞাননির্ভর যুগ, বিশেষজ্ঞের যুগ। যেমন– নাক কান গলার ডাক্তার, হার্টের ডাক্তার, গাইনি বিষয়ক ডাক্তার। একজন মানুষকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজনে ৫/৭ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়, তেমনি ছড়াকে বুঝতে হলে ছড়ার ১০-১৫ পদের শ্রেণিবিন্যাস বুঝতে হবে। পণ্ডিতেরা প্রথমত ছড়াকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করেছে। যথা:

১. লোকজ ছড়া
২. সার্বজনীন ছড়া

লোকজ ছড়ার আবার উপ-শ্রেণি আছে। যেমন: (ক) ছেলেভুলানো ছড়া (খ) ছেলেজাগানো ছড়া (গ) শিশুতোষ ছড়া। আবার সার্বজনীন ছড়ার উপ-শ্রেণি আছে। নিম্নে ছকে উপস্থাপন করা হল। লোকজ ছড়ার উপ-শ্রেণি এখানে আলাদা বিশ্লেষণে দেখানো হয়নি। কারণ পর্যালোচনায় তা পাঠকদের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হবে।

সার্বজনীন ছড়া

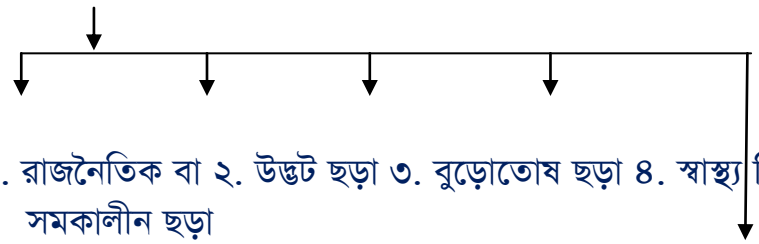

১. রাজনৈতিক বা সমকালীন ছড়া ২. উদ্ভট ছড়া ৩. বুড়োতোষ ছড়া ৪. স্বাস্থ্য বিষয়ক ছড়া

৫. প্রকৃতি বিষয়ক ছড়া ৬. প্রেমের ছড়া ৭. যুদ্ধের ছড়া ৮. আন্দোলনের ছড়া ৯. প্রযুক্তির ছড়া ১০. ইমোশনাল ছড়া

১. রাজনৈতিক বা সমকালীন ছড়া:

" তেলের শিশি ভাঙ্গলো বলে
শিশুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো–
তার বেলা?"– অন্নদাশংকর রায়

ঐ ছড়াটি ১৯৪৭ সালের দেশবিভাজনের কয়েক বছর আগের লেখা। তারপর ঊনসত্তরের গণ আন্দোলনের সময় আল মাহমুদ লিখলেন:

"ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক
শুয়োর মুখো ট্রাক
দুয়োর বেঁধে রাখ।
কেন বাঁধবে দোর জানালা
তুলবো কেন খিল?
আসাদ গেছে মিছিল নিয়ে
ফিরবে সে মিছিল।
ট্রাকের মুখে আগুন দিতে
মতিউরকে ডাক।"

২. উদ্ভট ছড়া: প্রথমেই আসে যোগীন্দ্রনাথের আজগুবি ছড়া। তাঁর 'হাসি রাশি'তে 'মজার মুল্লুক' ছড়াটার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি:

"এক যে আছে মজার দেশ
সব রকমের ভালো
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ

দিনে চাঁদের আলো ।”
আকাশ সেথায় সবুজ বরণ
গাছের পাতা নীল
ডাঙ্গায় চরে রুই কাতলা
জলের মাঝে চিল ।
ছেলেরা সব খেলা ফেলে
বই নে বসে পড়ে
মুখে লাগাম দিয়ে গোড়া
লোকের পিঠে ছড়ে ।”

ছড়াকার সুকুমার রায়ের উদ্ভট ছড়া আবার অন্য ধরনের:

“হাঁস ছিল সজারু (ব্যাকরণ মানি না)
হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানি না ।”

আমাদের বাংলাদেশে শামসুর রাহমান লিখেছেন:

“একটা লোকের উঠোন জোড়া
জুতোর বহর মস্ত
জুতোর ভেতর লোকটা জানি
উঠত এবং বসত ।
ঘরহারা কেউ ঝড়ের পরে
ধরলে ঘরের বায়না
লোকটা তখন বলত ডেকে
জুতোর ভেতর আয় না ।”

রোকনুজ্জামান খান (দাদাভাই), এখলাস উদ্দিন, হাসান জান, ফয়েজ আহমেদ, সুকুমার বড়ুয়া, আখতার হুসেন, রফিকুল হক থেকে শুরু করে এই উদ্ভট ছড়ার গতি-প্রকৃতি এখনো প্রবলভাবে প্রবহমান ।

৩. বুড়োতোষ ছড়া: বুড়োতোষ ছড়ার অর্থ হল যে সব ছড়া সার্বজনীন । আবেগ ও যুক্তি দুই আছে । সেসব ছড়ার মধ্যে কবিতাও আছে । যেমন, আল মাহমুদের দুটি লাইন:

“সবাই বলো ভাঙ্গো ভাঙ্গো
কেউ কখনো ভাঙ্গে
ষাটের দশক বগল বাজায়
বউ কেড়ে নেয় লাঙ্গে ।”

শামসুর রাহমান লেখেন:

“পাঞ্জাবিরা চেয়েছিল
বাংলা ভাষা মুছে দিতে
বাংলাদেশের সকল কিছু
গায়ের জোরে লুটে নিতে ।

আঁধার ছিল নয় মাস জুড়ে
নাচল শেষে আলোকলতা
রক্তসাগর সেচে পেলাম
সূর্যোদয়ে স্বাধীনতা ।"
–সূর্যোদয়ে স্বাধীনতা

৪. স্বাস্থ্য বিষয়ক ছড়া: আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ এবং সচেতনতার যুগ। স্বাস্থ্যবান মানুষ ছাড়া স্বাস্থ্যবান জাতি, সৃজনশীল জাতি আশা করা দুরূহ ব্যাপার। সুকুমার বড়ুয়া ডায়েবেটিক নিয়ে লিখেছেন:

"সর্বশরীর বিষ
রোগ হলো জন্ডিস
আখের রসে সুস্থ হতেই
বাড়লো ডায়াবেটিস ।"

আমাদের দেশে এনজিওগুলো যেমন, ব্র্যাক, আশা প্রভৃতি এনজিও স্বাস্থ্য সচেতনমূলক কবিতা ছড়া ইত্যাদি প্রচার এবং প্রসার করে যাচ্ছে।

৫. প্রকৃতি বিষয়ক ছড়া: গাছপালা, নদীনালা, পাখি ফুল ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর ছড়া লেখা হচ্ছে। যেমন:

"একটি ডাহুক দুইটি ডাহুক
তিনটি ডাহুক মিলে
ভীষণ জোরে চেঁচাচ্ছিল
তিমির মুখির বিলে ।"
সব রকমের লেখা: ডাহুক, রহীম শাহ, পৃ. ৩৯০

৬. প্রেমের ছড়া: প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা আদিম এবং অকৃত্রিম। জীবন-জানোয়ারের একটা প্রধান গুণ হল তার ভালোবাসা, স্নেহ-প্রীতি। ছড়াকারগণ এ বিষয় নিয়ে প্রচুর লিখে যাচ্ছেন। যেমন:

"আমার মন ভালো নেই
অথচ আকাশে জোছনা
আমার মন ভালো নেই,
জোছনারও দোষ না ।"– আবদুর রহমান

৭. যুদ্ধের ছড়া: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে অনেক ছড়া লেখা হয়েছে। যেমন:

"ছড়া ছড়া ছড়া
লিখছি যখন ছড়া
তখন দেখি পায়ের তলায়
সতের লাখ মরা ।"
–আসাদ চৌধুরী

৮. আন্দোলনের ছড়া: '৬৯-এর গণআন্দোলন, ৯০-এর গণআন্দোলন, হরতাল, অবরোধ নিয়ে অনেক ছড়া লেখা হয়েছে যা শ্লোগানধর্মী। যেমন:

"আমার তোমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা যমুনা।"

অথবা

"এক দফা এক দাবি
অমুক তুই করে যাবি?"

৯. প্রযুক্তির ছড়া: বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্ব। এই প্রযুক্তির নানা দিক নিয়ে দেদারসে ছড়া লেখা হচ্ছে। যেমন:

"হ্যালো হ্যালো হ্যালো
সব ভেসে গ্যালো।

ঢাকা থেকে পুবাইলে
ফোন করি মোবাইলে
কতগুলা গরু এসে
কত ধান খেলো?
লোন করে ফোন কিনে
কোন খেলা খেলো?
হ্যালো হ্যালো হ্যালো
সুকুমার বড়ুয়া, হ্যালো: ঠিক আছে ঠিক আছে, পৃ. ৮

১০. ইমোশনাল ছড়া: যেমন:

"রংতুলিতে ছোপ ছাপ
মাঠের পাশে ঝোপ ঝাপ
বনের পাশে সোনার গাঁও
একটুখানি দেখে যাও।
বসতে বসতে সন্ধ্যা
বইছে বাতাস মন্দা।"
হাসান জান

অথবা

"কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছ
দোয়েল নাচায় পুচ্ছ
খুকুর চোখে জল টলোমল
হীরে মানিক তুচ্ছ।"
হাসান জান

এভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রে যেমন মানুষের বিভিন্ন অঙ্গের বিশেষজ্ঞ তেমনি ছড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা হচ্ছে আজকাল অফিস-আদালতে বিভিন্ন রকম ছড়ার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। এমনকি বিজ্ঞাপনের ভাষাতেও ছড়া ব্যবহার করা হচ্ছে।

আদিযুগ

তথ্য-তালাশে আমরা জানতে পারি বাংলা ভাষার লিখিত আদি চর্যাপদ। ঐতিহাসিক গবেষকরা চর্যাপদ সাহিত্যকেই বাংলা ভাষার আদি রূপ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। চর্যাপদে যে ৫৪টি নিদর্শন পাওয়া গেছে তা ছন্দোবদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মের আচার-আচরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশমূলক রচনা। চর্যা ছড়া তখনকার সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল। কাহ্নপদ চর্যা ছড়া লিখেছিলেন। তাঁর একটি ছড়া এরকম:

"আলি এ কালি এ বাটা বুদ্ধেলা
তা দেখি কাহ্ন বিসন ভইলা।"[১০]

এখানে উল্লেখ্য যে, গবেষক সুকুমার সেনের মতে, 'বাংলা ভাষা জন্মিবার আগে হতেই এদেশে কবি-পণ্ডিতেরা সাহিত্যচর্চা করতেন। তবে সে ভাষা ছিল সংস্কৃত।' রচনা তিন রকমের হত: বড় কাব্য, নাটক এবং প্রকীর্ণ শ্লোক বা চুটকি কবিতা। সূত্র: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬ [১১]

"সেকালের বাঙালির রসনারোচন ভোজের জন্য তালিকা পাই এই কবিতায়:

ওগগর ভত্তা মোইনি মচ্ছা
রম্ভঅ পত্তা নালিচ গচ্ছা
গায়িকা ঘিত্তা দিজ্জই কন্তা
দুগ্ধ সজুত্তা খাই পুন বন্তা

সূত্র: ঐ পৃ. ৫০

আদিযুগ বাংলা ভাষার প্রস্তুতিকাল। শ্লোকনির্ভর রচনাই ছিল প্রধান। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাই প্রধান রচনাকারী, তবে কবিদের প্রায় সকলেই ছিলেন বাঙালি।

মধ্যযুগ

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এদেশে মুসলমানদের রাজত্ব শুরু হয়। ছড়া শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকের ধারণা, চর্যা> আর্যা > ছড়া। সেকালের 'সেক শুভোদয়া' নামে একটি বই এক মুসলমান কবি লিখেছিলেন অনুমান ষোড়শ শতাব্দীতে। 'সেক শুভোদয়ায়' কয়েকটি বাংলা ছড়া ও গান আছে। সেসব ভাবে ও ভাষায় পঞ্চদশ শতাব্দী আগের বলে মনে হয়। (সূত্র: সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৮৩) উদাহরণ– শ্রী মল্লক্ষণ যেন মহাবীর/কর্ণরন্ধে ভেজে তীর।

মধ্যযুগে ছড়ার ইতিহাস তথ্য-তালাশে দেখা যায় সংস্কৃত সাহিত্যে খুব ছোট ছোট শ্লোক ব্যতীত ছড়ার কোনো নজির পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগে যা পাওয়া যায় তাকে গানা বা স্তুতি গান বলা হত। ছড়া বলা হত না। ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীতে মাত্র দু/চারটি ছড়ার সন্ধান

পাওয়া যায়। রাজনৈতিক কারণে অনেক কিছু রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম অনুচর গোপনীয় খবর পাঠাবার জন্য হেঁয়ালি ছড়ার সাহায্য নিয়েছিলেন। যেমন:

"বাউলকে কহিয় লোকে হইল আউল
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল।"

বড়ু চণ্ডীদাসও আদিরসাত্মক ছড়া রচনা করেছিলেন। যেমন:

একবার নাচা চাঁদের কোনা
(আমি) মুরলি বাঁধিয়ে দেব যত লাগে সোনা।

গোবিন্দদাস বড়দের জন্য লিখেছেন। যেমন:

'শরদ চন্দ পবন মন্দ/বিপিনে ভরিল কুসুম গন্ধ।'

লোচনদাস লিখেছেন:

'জ্বালার উপর জ্বালা সই জ্বালার উপর জ্বালা
জলকে যাই পথ না পাই বসন টানে কালা।'

কবি ভারতচন্দ্রও ছড়া রচনা করেছিলেন। যেমন:

আয়রে চন্দন তোরে ডাকে সদাশিব
মেয়েগুলো খা খা কোরে তোরে রক্ত দিব।

শাক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন লেখেন,

"ভূতলে থাকি মাগো করলে আমায় লাঠিপেটা
তবু আমি কালী বলে ডাকি সাবাস বুকের পাটা।"

মধ্যযুগে কবিতা যতটা অগ্রসর হয়েছে সে তুলনায় ছড়ার বিষয়টা উল্লেখ করার মতো নয়। কিন্তু চর্চা বাদ যায়নি। ছড়া প্রবাদে প্রবচনে, শ্লোকে-বাণীতে প্রচারে সব সময় উজ্জ্বলভাবেই বিরাজ করেছে। একটা বিষয় খেয়াল করার মতো আর সেটা হল আদি বা মধ্যযুগে যা লেখা হয়েছে তা ছন্দে বা পদ্যে লেখা হয়েছ। গদ্য তখনও শুরু হয়নি। আধুনিক যুগের শুরুতে বা যুগ-সন্ধিক্ষণে গদ্যের পদচারণা শুরু হয়। মধ্যযুগে অবশ্য 'চম্পু কাব্যে' বিদ্যুৎচমকের মতো চমকানি দিয়েছিল কিন্তু চমকানি স্থায়ী হয়নি। 'চম্পু কাব্য' হল পদ্যে গদ্যে মেশানো রচনা।

মধ্যযুগে মুসলমান লেখকদের আগমন ঘটে। সে এক ভিন্ন উজ্জ্বল প্রদীপ। বাংলা ভাষার প্রথম মুসলমান কবির নাম শাহ মোহাম্মদ সগির। তাঁর কাব্যের নাম 'ইউসুফ জুলেখা'। শাহ বাহরাম লিখেছেন 'লাইজী মজনু'। আরো কবি আসেন। তাঁদের মধ্যে সৈয়দ সুলতান, শেখ পরাণ, হাজি মুহম্মদ, আবদুল হাকিম, কাজি দৌলত, আলাওল, মাগন ঠাকুরসহ আরো অনেকের নাম করা যায়। লোকসাহিত্যকে ড. হুমায়ুন আজাদ বুকের বাঁশরী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। মধ্যযুগের শেষ এবং আধুনিক যুগের শুরু। তিনি 'সম্বাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ছিলেন। তাঁর কবিতা হালকা তবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ভরা। তিনি ছোট ছোট পয়ারে ছড়াগন্ধী কবিতাও লিখেছেন। যেমন:

"বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফোটে।"
অথবা

"কিছু মাত্র নাহি জানি রাম রাম হরি।
কারে বলে রেডি কেস কারে বলে টোরি।।
হুইগ কাহারে বলে কেবা তাহা জানে।
হুইগের অর্থ কভু শুনি নাই কানে।।
টোরি আর হুইগের যে হন প্রধান।
আমাদের পক্ষে ভাই সকল সমান।।"[১২]

আধুনিক যুগ

অষ্টাদশ শতাব্দী হতে আধুনিক কালের যাত্রা শুরু। লোকজ ছড়া, প্রবাদ, খনার বচন, ধাঁধা ইত্যাদি জীবনের ছন্দোময় সময়ের নান্দনিক শ্রান্তি বিনোদন এক উর্বর মাঠকে অতিক্রম করে আধুনিক মানুষের মন ও মননে অনুপ্রবেশ করেছে। পরিবেশ অবস্থান শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতার উন্মেষ রাষ্ট্রব্যবস্থা, ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা সংস্কার সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি সময়ের দাবিতে আপেক্ষিক হয়ে যায়। নিত্যনতুন আবিষ্কার মানুষকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করে। শিল্পকলার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটতে থাকে। সাহিত্যে পদ্য শাখা হতে গদ্য শাখায় বৈপ্লবিক যাত্রা শুরু হয়। ছড়াকে তার ধাক্কা সহ্য করে যুগোপযোগী হতে হয়।

১৮১২ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হতে 'ইতিহাস মালা' নামে একটি বই ছাপা হয়। (Collection of Stories) এটির সংগ্রাহক ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষার অধ্যাপক উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪)। বইটির শেষ পৃষ্ঠায় একটি ছড়া ছাপা হয় যার কাহিনি এইরূপ: এক কৃষক মাঠে হালচাষ করতে গিয়ে ২৪টি মাছ ধরে বাড়িতে নিয়ে গেল। বউকে রান্না করতে বলে সে আবার মাঠে হালচাষ করতে গেল। রান্নার সময় তার বউ এক এক করে চাখতে চাখতে ২৪টি মাছ একাই খেয়ে ফেলে। কৃষক খেতে বসে মাছ দাবি করলে তার বউ ছড়ার মাধ্যমে মাছের হিসাব দিচ্ছে এইভাবে:

"মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা
চিলে নিল দু'গণ্ডা
বাকি রহিল ষোল
তাহা ধুতে আটটা জল পলাইল
তবে থাকিল আট।
দুইটায় কিনিলাম দুই আঁটি কাঠ
তবে থাকিল ছয়।
প্রতিবাশিকে চারিটা দিতে হবে

তবে থাকিল দুই
আর একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই ।
তবে থাকিল এক–
ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ ।
এই হইল যদি মানুষের পো
কাঁটাখানা খাইয়া মাছখান থো ।
আমি যেই মেয়ে
তেই হিসাব দিলাম কয়ে ।"

বিশেষজ্ঞদের মতে এটিই প্রথম মুদ্রিত লৌকিক ছড়া এবং সংগৃহীত ছড়া । বাংলা ভাষায় বিগত শতাব্দীতে বা তার কিছু আগে থেকে বাংলা লৌকিক ছড়া সংগ্রহের বই বা সে বিষয়ে লেখালেখি হলেও ছড়ার যথার্থ গ্রহণযোগ্য সমালোচনা ও বিজ্ঞানমনস্ক বিচারের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথই প্রথম । (প্রসঙ্গ: ছড়া চর্চা ও ছড়া সাহিত্য; ছড়া: পর্যালোচনার শতবর্ষ, সনৎ কুমার মিত্র, পৃ. ২৪) । তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব । তাঁদের বিভিন্ন রচনায় কিছুটা লঘু চালের কবিতা, গান ও ছড়ার উপস্থিতি দেখা যায় । যেমন: মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে লিখেছেন:

"বাইরে ছিল সাধু আমার মনটা ছিল ধোয়া
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য, ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া ।"

দীনবন্ধু ছোটদের নিয়ে লিখেছিলেন:

"রাত পোহাল ফর্সা হলো ফুটল কত ফুল
কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা ছুটলো অলিকুল ।"

(*নানা কবিতা*: প্রভাত)

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ইন্দিরা' উপন্যাসে লিখেছেন, যেমন:

"ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে বাঁশতলাতে জল
আয় আয় সই জল আনিগে জল আনিগে চল ।"

(*ইন্দিরা*: ৫ পরিচ্ছেদ)

দ্বিজেন্দ্রলালকে বাদ দেয়া ঠিক হবে না । তাঁর তির্যক ব্যঙ্গ মর্মভেদ করে শাণিত করে দেয়ার মহা অস্ত্র । হাসির ছড়া গান লেখায় ওস্তাদ । যেমন:

"হ'ল কি! এ হ'ল কি এত ভারি আরুর্য্যি
বিলেত ফের্তা টানছে হুক্কা, সিগারেট খাচ্ছে ভরুর্য্যি
হোটেল ফের্তা মুন্সেফ ডাকছেন "মধুসূদন কংসারি"
চট পটির দোকান খুলে দস্তুর মত সংসারি ।"

(*হাসির গান*: হ'ল কি?)

তারপর রবীন্দ্রনাথ! একেবারে আসল রবি । মানে প্রতিদিনের সূর্য । শিশুদের জন্য প্রচুর লিখেছেন । তাঁর 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছন্দ', 'ছড়া' এসব বই খালি শিশুদের জন্য লেখা । আরো আছে শিশু, পলাতকা, শিশু ভোলানাথ ও প্রহাসিনী । ছড়া গ্রন্থের একটি উদাহরণ দেয়া যাক:

"গলদা চিংড়ি ডিংডিংমিড়ি
লম্বা দাঁড়ার করতাল
পাকড়াশিদের কাঁকড়া ডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল ।"
অথবা
"আমি আজ কানাই মাস্টার
পড়ো মোর বিড়াল ছানাটি"
অথবা
"মা আমাদের চুমো খেতে
মাথা করে নীচু
তখন কি মার মুখটি দেখায়
মস্ত বড় কিছু ।"
এরকম অন্যরকম নানা উদাহরণ দেয়া যাবে । অফুরন্ত যা কখনও ফুরন্ত নয় ।

রবীন্দ্রযুগের মধ্যে বা তার সমকালে তা তার পরে বিভিন্ন কবিরা ছড়ার ছন্দের এবং ছড়ার নানা বিচিত্র ব্যবহার বিশেষ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছেন । সেই ধারা তাঁর তিরোধানের পর গত পাঁচ দশকে আরো প্রসারিত হয়েছে । রজনীকান্ত সেনের 'বুড়ো বাঙালের সংলাপ', নজরুল ইসলামের 'খুকি ও কাঠবিড়ালী'র কথোপকথন, সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোলের ছড়া', জসীমউদ্‌দীনের 'নকসী কাঁথার কাহিনী', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশি' 'শিশু চয়নিকা' জাতীয় শিশু-কিশোর পাঠ্য কবিতাবলি, অন্নদাশংকর ও সুনির্মল বসুর ছড়া, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিদের বিচিত্রধর্মী রচনা পাঠক স্বভাবতই এসব মনে করতে পারবেন । রবীন্দ্রোত্তর দুই বাংলার কবিদের মধ্যেও সুভাষ, নীরেন্দ্রনাথ, শঙ্খ, আলোকরঞ্জন, শক্তি, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আশরাফ, নির্মলেন্দু, হায়াৎ মামুদ প্রমুখ অজস্র নাম আসবে ।

ছড়া আদি এবং মধ্যযুগ অতিক্রম করে আধুনিক যুগে এসে জীবন, জগৎ পরিবর্তনের সাথে কী ভাবে পরিবর্ধিত হয়েছে তা একটি লক্ষণীয় বিষয় । ছড়ার ফ্রেম ঠিক রেখে ফ্রেমের ভেতরের ছবি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে । জাতিগতভাবে মানুষ সভ্যতার আলোকে অনেক কিছু আলোকিত করেছে । বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনে ধাবমান হয়েছে । ১ম ও ২য় মহাযুদ্ধে অন্তরে-বাহিরে অনেক বিয়োজন-সংযোজন হয়েছে । এ অবস্থায় ছড়ার অবস্থান কী?

"ছড়া এক দুর্লভ জারক রসের অধিকারী । সেই রসে সে নীরব, কঠিন বস্তুকেও, ভাটপাড়ার শব্দকেও সরস এবং কোমল করে শিশু-রসনার উপযোগী রূপ দিয়ে ফেলে । সাহিত্যের ভাষায় মোটামুটি হিসেবে একেই আমরা বলি ছড়ার সংজ্ঞা । মুখ্যত স্বরাশ্রয়ী এবং স্বরাঘাতে উচ্ছ্বল বা বিলম্বিত সুরময়তাই জারক রস এবং এর মধ্যে যার জন্ম, তারই নাম ছড়া ।[১৩]

ছড়া যে আধুনিক ছড়া যে কবিতার চেয়ে আলাদা তা অন্নদাশংকর রায় একটি ছড়া লিখে বুঝিয়েছেন । যেমন:

"ছড়া দিয়ে মিটবে না কবিতার স্বাদ
তবু তো যায় না ভোলা বচন ও প্রবাদ
খোকা ঘুমাবে না, যদি না পায় এর স্বাদ
পাড়া ঘুমাবে না, যদি এটা পড়ে বাদ ।"

"ছড়া ও কবিতা কিন্তু সব কবিতাই ছড়া নয় । তবে ছড়া যে কী জিনিস, কী কী থাকে ছড়ার শরীরে, কোন কোন উপকরণে এ ধরনের যাদুময়তা সৃষ্টি হয় তা কি কখনো স্পষ্ট করে বলা যাবে? সংজ্ঞা সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুকুমার সেন ঘাঁটাঘাটি করেও ছড়ার সংজ্ঞানির্দেশ স্পষ্টভাবে পাইনি ।"[১৪]

"আসলে ছড়া ব্যাপারটা যতই উপভোগের ততটা বিশ্লেষণের নয় । মালাই বরফের সংজ্ঞা দেয়া যায়? গোধূলি রঙের সংজ্ঞা হয় কোনো? শেফালির গন্ধ কাকে বলে? এ সর্ম্পকে কিছু লেখা যাবে? ছড়াও সে রকম সংজ্ঞার বন্ধন ছাড়িয়ে যায়, ছাড়িয়ে যায় ।"[১৫]

কবি আল মাহমুদ ছড়া আর কবিতা সম্বন্ধে লিখেছেন:

"ছড়া সে-ও কাব্য কথা
হৃদয় ভাঙ্গা মিল
ঠিক দুপুরে উড়তে থাকা
পাখ ছড়ানো চিল ।"

ছড়া নিয়ে আরো একটি ছড়া:

"ছড়া হবে সাবলীল
চমকে দেয়া অন্ত্যঃমিল
টইটুম্বর হাওড় বিল
দশটা আকাশ বিশটা চিল ।
ছড়া হবে সাবলীল
চমকে দেয়া অন্ত্যঃমিল
দশ দরজা একটা খিল,
শান্ত দিঘি ছোট্ট ঢিল । –আলম তালুকদার

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর বাংলাদেশে ছড়া চর্চায় যাঁরা ব্যাপৃত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন: মঈনুদ্দীন (১৯০১-৮১), জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-৭৬), বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-৭৯) এবং কাজী কাদের নেওয়াজ (১৯০৯-৮৩) । তারপর আছেন, সুরেন্দ্র মোহন বিশ্বাস, সুজাত আলী (১৯০৮-?), বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-৯৯), এ. কে জয়নুল আবেদীন, শামসুদ্দীন, আজিজুর রহমান (১৯১৭-৭৮), কাজী আবুল কাশেম । চিত্রকলার ক্ষেত্রে নন্দিত শিল্পী কাজী আবুল কাশেম দেশবিভাগের আগে হতেই শিশুসাহিত্যের অনুরাগী । ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত "কাঁচা মিঠে' নামে একটি ছড়াগ্রন্থ প্রকাশিত হয় । তাতে কৌতুকধর্মী ১৬টি ছড়া সংকলিত হয় ।" টোটকা' নামে একটি ছড়া এরকম:

"নাকের ডগার লংকা ফোড়ন
হ্যাচ্চোরে ভাই হ্যাচ্চো

সন্ধে বেলায় টেংটেঙিয়ে
যাচ্ছো কোথায় যাচ্ছো?
যাচ্ছিরে ভাই বিষ্টিপুরে
যায় না পাওয়া দিনদুপুরে
আশটে ফলের শাসটি
যাচ্ছে না ভাই শাসটি
যাচ্ছে না ভাই কাশটি ।
সেথায় আছে আদ্যিকালের
সর্দি লাগা বদ্যি
ঝট করে সে রোগ সেরে দেয়
ষাট বছরের মধ্যি ।"

হোসনে আরা ছিলেন সর্বাংশেই একজন শিশুসাহিত্যিক । এর পরে যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন প্রজেশ কুমার রায় । আমরা তাঁর নাম অনেকেই জানি না । তার একটি ছড়া এরকম:

"তাইরে নাইরে নাইরে না
ঢাকা গেলেই টাকা পাবে
টাকার অভাব থাকবে না ।
ঢাকা থেকে খবর এলো
টাকার জন্য আসবে না ।
ঢাকা গেলেই চিনি খাবে
খাবার অভাব থাকবে না ।
ঢাকা থেকে জনাব এলো
খাবার জন্য আসবে না ।"

এরপর যাঁর নাম উল্লেখ করা যায় তিনি হলেন সফলকাম শিশুসাহিত্যিক আহসান হাবিব । তারপর মার্জিত আধুনিক কবি সিকান্দর আবু জাফর (১৯১৯-৭৫), তিনিও শিশুদের জন্য প্রচুর লিখেছেন । তাঁর সাথে আছেন ভিন্ন মাত্রার কবি ফররুখ আহমদ (১৯২৮-৮৪) এবং তালিম হোসেন (১৯১৮-৯৯) । সমসাময়িক আরো আছেন নুরুল ইসলাম (১৯১৮-?), চৌধুরী ওসমান (১৯১৯), হাসান জান (১৯২৭-৭৪), আবুল হোসেন মিয়া এবং বেগম জেবু আহমেদ । হাস্যরসের জীবন্ত ভাণ্ডার নিয়ে এর পরে উদিত হতে দেখা যায় হাবীবুর রহমানকে । তাঁর একটি ছড়া এরকম:

"কাঠি দিয়ে মারলাম
কাঁটা দিয়ে ঝাড়লাম
খোক্কস
কড়ি দিয়ে আনলাম
দড়ি দিয়ে টানলাম

কোক্কস ।
খোক্কস কোক্কস তাধিন ধিন
নাচ দেখে করে শুধু গা ঘিনঘিন ।”

বাংলাদেশের শিশু অঙ্গনে একটি নাম খুবই প্রাসঙ্গিক এবং অনিবার্য। দাদা ভাই, রোকনুজ্জামান খান (১৯২৫-৯৯)। তিনি একজন সফল সংগঠক। ‘কচিকাঁচার মেলা’র প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৫৬ সালে শুরু, এখনও বেঁচে আছে। ড. আশরাফ সিদ্দিকী এক সময় শিশুদের জন্য বেশ লিখেছেন (১৯২৭-)। বর্তমানে নীরব। এঁদের সাথে আরো আছেন কাজী গোলাম আহমদ (১৯২৭-), আবদুর রশীদ খান (১৯২৭-), মনোমোহন বর্মণ (১৯২৭-), আবদুর রহমান ও আলমগীর জলিল উল্লেখযোগ্য।

এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) সত্যিকারের শ্রেষ্ঠ শিশুবান্ধব কবি। তাঁর প্রকাশিত ছড়াগ্রন্থ ১৪টি। তাঁর ছড়ার ভাষায়:

“আমার ছড়া টিয়ের মত
ঠোকর মারে জোরসে
দোষ দিবিনে দুই চোখে তুই
দেখিস যদি সর্ষে ।”

ফয়েজ আহমদ সর্বাংশেই শিশুসাহিত্যিক (১৯৩১-)। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা অনেক। কাজী লতিফা হক (১৯৩২-), তিনিও একজন শিশুসাহিত্যিক। তার পর নাম আসে হোসনে আরা কামাল (১৯৩৪-)। তারপর দেখা যায় সুকুমার বড়ুয়াকে। তিনি ব্যঙ্গাত্মক ছড়া লেখায় পারদর্শী। কৌতুকধর্মী খোঁচা মারা তাঁর ছড়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য:

“এই শোন শোন
রাত দুপুরে কে করেছে ফোন?
চিনতে বুঝি পারনি তারে
ভারী গলার টোন?
কি হয়েছে? হাজার টাকা
চেয়েছিল লোন?”

এখলাস উদ্দিন আহমদ (১৯৪০-) ছড়া সাহিত্যে আরেক আকাশ। হেমায়েত হোসেন (১৯১২-)-এর বেশ কিছু ছড়া এক সময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বদরুল হাসানের রচনা খুব কম, কিন্তু লেখায় বৈচিত্র্য আছে। তারপর চিন্তাভাবনায় আরো অগ্রসর ছড়াকার হিসেবে বেশ খ্যাতিমান ’৭১-এর আগে তাঁদের মধ্যে রফিকুল হক, শামসুল আলম, মসউদ-উশ-শহীদ, মোহাম্মদ মোস্তফা, আখতার হুসেন, আবু কায়সার, অচিন্ত্যকুমার ভৌমিক প্রমুখ। তাঁদের সাথে আরো নাম সংযোগ হতে পারে। তাঁরা হলেন: প্রতিবাদী ছড়াকার আবু সালেহ, রশীদ সিনহা, ইফতেখার হোসেন, মাহমুদ উল্লাহ, খালেক বিন জয়েনউদ্দিন, হোসেন মীর মোশাররফ, শাহাদত বুলবুলসহ অনেকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এঁরাই কেউ কেউ স্পিডের সাথে ছড়া লিখতে থাকেন। তারপর আমীরুল ইসলাম, ফারুক নওয়াজ, লুৎফর রহমান রিটন, আহসান মালেক, রহীম শাহ, আলম তালুকদার, শাহাবুদ্দীন নাগরী, হাসান

হাফিজ, দীপংকর চক্রবর্তী, অজয় দাশ সুপ্ত, শামসুল হক দিশারী, রাশেদ রউফ, দীপক বড়ুয়া, তপংকর চক্রবর্তী, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, মনোমোহন বর্মণ, আবুল খায়ের মোসলেহউদ্দিন, নিয়ামত হোসেন, সনজীব বড়ুয়া, সিরাজুল ফরিদ, আসলাম সানী, আইয়ুব সৈয়দ, সুজন বড়ুয়া, ফারুক হোসেন, আবু হাসান শাহরিয়ার, সালেম সুলেরী, আশরাফুল আলম পিন্টু, মুস্তফা মহিউদ্দিন, আশরাফুল মান্নান, জ্যোতির্ময় মল্লিক, আনজির লিটন, ওবায়দুল গণি চন্দন, রোমেন রায়হান, টিপু কিবরিয়া, জগলুল হায়দার, রোকেয়া খাতুন রুবী, রফিকুর রশীদ, নাসের মাহমুদ, বকুল হায়দার, তাহমিনা কোরাইশী, তপন বাগচী প্রমুখ। এরপরে আরো একঝাঁক তরুণ ছড়াকার ছড়ার জগতে বেশ উজ্জ্বলভাবে আর্বিভূত হয়েছেন।[৯]

পরিশেষে যুগভিত্তিক আলোচনায় একটি বিষয় খুব পরিষ্কার– লোকজ ছড়া গ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে শহরে-বন্দরে ছড়িয়ে গেছে। ছড়া প্রাত্যহিক জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ। অনেকটা চণ্ডীপাঠ হতে জুতো সেলাই পর্যন্ত ছড়ার উজ্জ্বল উপস্থিতি।

অবশেষে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি: "বিশ্বচরাচরে দেখি ছড়া ছড়ানো রয়েছে। প্রজাপতি যখন ওড়ে, বাতাস তার ডানার কম্পন ছন্দোময়। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটা নির্দিষ্ট যতি। কোকিলও যেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ডেকে ওঠে। প্রজাপতির পাখার কিংবা সমুদ্রের ঝিনুকের গায়ে যে রং তা কিন্তু হিবিজিবি নয়। একটা ছন্দ আল্পনা। হরিণ, জেব্রা, চিতা– এদের গায়ের মধ্যে রয়েছে ছন্দ। ফুলের পাপড়িরা ছন্দে গ্রন্থিত। রসুনের কোয়াটাও। কার্বোহাইড্রেট অণু বা অ্যামিনো এসিডের সমবেত হওয়ার মধ্যে যে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া তার মধ্যেও রয়েছে ছন্দের বন্ধন। একটি মানব-কোষের জিনের মধ্যকার বন্ধনে রয়েছে ছন্দ-শৃংখলা। আর আমাদের হৃদপিণ্ডটি ভীষণ রকম শৃংখলিত ছন্দেই শরীরের মধ্যে লাবডাব বেজে চলেছে। রক্তের চলাচলে ছন্দ, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ছন্দ। ছন্দই মানুষের আদি সখা। তাই আদিম নৃত্য তালপ্রধান। আদি সংগীত তালপ্রধান। আদিমন্ত্র ছন্দোসম্পৃক্ত।" (স্বপ্নময় চক্রবর্তী– *ছড়ার শরীর ও আত্মা*; পৃ. ১৩১)

ছড়া আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের জাদুঘরে ভ্রমণ করায়। ছড়া আগামী দিনের জাদুঘরের মালমশলা যোগান দেয়। ছড়া আমাদের স্বপ্ন দেখায়, ছড়া আমাদের ঘুম ভাঙায়। ছড়া আমাদের উজ্জীবিত করে, আনন্দ দেয়, নান্দনিক কবিতায় অবগাহন করায়। ছড়া আন্তরিক, মানবিক এবং বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞান। একই সাথে ছড়া আপ টু ডেট। ছড়া আধুনিক চলমান বিশ্বের বিস্ময়কর আদিম আবিষ্কার।

তথ্যনির্দেশ

প্রসঙ্গ : ছড়া চর্চা ও ছড়া সাহিত্য: *উচ্চারণ*, সম্পাদক– অশোক চক্রবর্তী, প্রকাশকাল-১৯৯৪, পরিমবঙ্গ । ছড়ার জামা-পান্‌জাবি আলখাল্লা : পূর্ণেন্দু পত্রী, পৃ- ১১৪, ঐ পৃ. ১১৪

ঐ, ছড়া চর্চা: অর্চিতা রায় চৌধুরী, পৃ ৮৪-৮৫

লোকসাহিত্য: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; *ছেলে ভুলানো ছড়া*, ১ম প্রকাশ-১৩১৪-ভাদ্র-১৪০৯, প্রকাশক- বিশ্বভারতী

বাংলা লোকসাহিত্য- ছড়া: ওয়াকিল আহমেদ, প্রকাশক: বাংলা একাডেমি, প্রকাশকাল: ১৯৯৮ জুন, ভূমিকা- ১-২ পৃ.

ঐ, পৃ. ০২

ঐ পৃ. ০২

ঐ পৃ. ০২

ঐ, পৃ. ০৬-১৯

প্রসঙ্গ: ছড়া চর্চা ও ছড়াসাহিত্য: প্রসঙ্গ: বাংলা ছড়া; একটি আলোচনা: অর্চিতা রায় চৌধুরী, পৃ. ৮৪.

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ড. সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী: ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭

শিশুশিক্ষা ও শিশুতোষ প্রবন্ধ সংগ্রহ ; আতোয়ার রহমান, বাংলা একাডেমি, ১ম প্রকাশকাল-২০০৩, প্রবন্ধের নাম; শিশুতোষ ছন্দিত রচনা, পৃ. ৫৩

প্রসঙ্গ : ছড়া চর্চা ও ছড়া সাহিত্য: ছড়ার শরীর ও আত্মা; স্বপ্নময় চক্রবর্তী, পৃ. ১১৬-১১৭ ঐ

[লেখক : ছড়াশিল্পী । অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ।]

আধুনিক বাংলা ছড়া ও আমাদের ছড়া

আ হ মা দ মা য হা র

বাংলাভাষায় ভাব প্রকাশ করার জন্য অনেক রকম শিল্পমাধ্যম আছে, ছড়া তার মধ্যে একটি। অনেকের মনে থাকে না যে, ছড়াও আসলে এক ধরনের কবিতা। মহাকাব্য, গীতিকবিতা, গাথাকবিতা, এলিজি, সনেট, লিমেরিক, ট্রিওলেট, হাইকু– এই সবই যেমন কবিতার বিশেষ বিশেষ আঙ্গিক, ছড়াও তেমনি। আবার উপর্যুক্ত সবগুলো আঙ্গিকেরও বিশেষ ধরনের কবিতাকে ছড়া সংরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তবে সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে কবিতা ও ছড়ার মধ্যে প্রধান কিছু বৈশিষ্ট্যের মিলের পাশাপাশি স্পষ্ট কিছু পার্থক্যও রয়েছে। কিছু পার্থক্য সূক্ষ্ম, কিছু মোটাদাগের।

ছড়া হচ্ছে সেই ধরনের কবিতা, যে কবিতায় কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষযোগ্য হবে। একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, যত ভাবগম্ভীর বিষয় নিয়েই ছড়া গড়ে উঠুক না কেন অথবা এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যত গভীরই হোক না কেন তার উপস্থাপনা হতে হবে হালকা চালের। আর একটা প্রধান দিক হল এই যে, ছড়ায় ছন্দ থাকতেই হবে। অন্ত্যমিলও ছড়ার কাছে খুবই প্রত্যাশিত। আধুনিক কবিতার মতো আধুনিক ছড়াও হয়তো অন্ত্যমিল ছাড়াও কেউ লেখার প্রয়াস নিতে পারেন, কিন্তু

অন্ত্যমিল ছাড়া ছড়া হয়ে-ওঠা একেবারে অসম্ভব না হলেও তা যে খুবই কঠিন ব্যাপার সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আল মাহমুদ এমন একটি কবিতা লিখেছিলেন যার বিষয়বস্তু এমন যে এর উপস্থাপনাতেই মনে হতে চায় যে এটি ছড়া। তাঁর 'বোশেখ' কবিতাটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি:

যে বাতাসে বুনো হাসের ঝাঁক ভেঙে যায়
জেটের পাখা দুমড়ে শেষে আছাড় মারে
সেই পবনের কাছে আমার এই মিনতি
তিষ্ঠ হাওয়া তিষ্ঠ মহা প্রতাপশালী !
গরিব মাঝির পালের দড়ি ছিঁড়ে কী লাভ
কী সুখ বল গুঁড়িয়ে দিয়ে চাষীর ভিটে!

আল মাহমুদ এই ছড়াটি প্রথমে তাঁর বিখ্যাততম কবিতার বই, সোনালি কাবিন-এর

অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। পরে অবশ্য প্রথম ছোটদের ছড়া-কবিতার বই পাখির কাছে ফুলের কাছে-তে স্থান দিয়ে বর্জন করেছিলেন 'সোনালি কাবিন' থেকে। অন্ত্যমিল নেই বলে আল

মাহমুদের এই কবিতাটাকে ছড়া বলে মানতে চাইবেন না অনেকেই। কিন্তু এই কবিতাটির দৃষ্টান্তই অন্ত্যমিল ছাড়াও ছড়ার পক্ষে সফল হবার সম্ভাবনাকে জাগিয়ে রাখছে।

ছড়াকে কেবলমাত্র শিশুসাহিত্যের সামগ্রী মনে করা হয় বলে ছড়া সাধারণত সাহিত্য পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত হয় না। এমনকি ছড়ার বিচার বা ছড়ার রসাস্বাদনমূলক আলোচনাও সাহিত্য পত্রিকায় বা দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকীতে স্থান পেতে দেখা যায় না। অথচ ছড়া নিয়ে গাম্ভীর্যপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলাসাহিত্যের অন্যতম সেনাপতি বুদ্ধদেব বসু শিশুসাহিত্য বিষয়ে আলোচনাকে তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যেখানে ছড়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। বাংলা যে একটি শক্তিশালী ভাষা তা বোঝার একটা উপায় এই ছড়া! বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাপন, হাসি-আনন্দ, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদির অন্তরঙ্গ পরিচয় ধরা আছে ছড়ার সুললিত ছন্দে, ভাবের নির্ভারতায়, বক্তব্যের তীক্ষ্ণতায়। সেই দিক থেকে বলতেই হয় বাংলার সমাজজীবনের সঙ্গে ছড়ার সম্পর্ক খুবই গভীর। লোকায়ত ছড়াগুলোর দিকে তাকালেও আমরা তা দেখতে পাব। যদিও নির্মল হাসি আর শিশুর অপরিণত মনের ভাবনা অথবা শিশুর অবুঝ কাণ্ডকারখানা নিয়ে লেখা ছোটদের কবিতাই আধুনিক কালের সূচনায় লেখা হয়েছিল। বেশিরভাগ শিশুর উপযোগী কবিতার স্বভাবলক্ষণ ছিল এরকম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা মানুষের ভাবনাতে স্থান নেয়। ফলে ব্যঙ্গ আর উইট যুক্ত হয়ে ছড়াকে করে তুলেছে আধুনিক। অন্নদাশংকর রায় ছড়ার এই আধুনিকতার পথিকৃৎ। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়ার কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু যে বলেছিলেন,

আধুনিক কবির হাতে ছড়া বেরোতে পারে শুধু এই শর্তে যে তিনি বক্তব্য কিছু দেবেন, অথচ সেটুকুর বেশি দেবেন না যেটুকু এই হালকা ছোট চটুল শরীরে ধরে যায়। একেবারে সারাংশ কিছু না-থাকলে তা নেহাতই ছন্দের টুংটাং হয়ে পড়ে, আবার মাত্রা একটু বেশি হলেও আর ছড়া থাকে না।

বুদ্ধদেব বসু এ-কথা বলতে পেরেছিলেন তাঁর সামনে অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়া ছিল বলে। সুতরাং ছড়ার একটা মাত্রা অন্নদাশঙ্কর রায় আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর নিজেও যে তত্ত্ব দিয়েছেন ছড়া সম্পর্কে তার খোঁজ করা দরকার। তিনি ছড়ায় বৈচিত্র্য যোগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জোর করে নয়। সাম্প্রতিক কালের অনেক ছড়াপ্রয়াসীকেও বৈচিত্র্য যোগ করতে দেখা যায়। তাতে জোরের চিহ্ন রয়ে যায়। তাই অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন,

ছড়া যদি কৃত্রিম হয় তবে তা ছড়াই নয়, তা হালকা চালের পদ্য। তাতে বাহাদুরি থাকতে পারে, কারিগরি থাকতে পারে, কিন্তু তা আবহমানকাল প্রচলিত খাঁটি দেশজ ছড়ার সঙ্গে মিশ খায় না। মিশ খাওয়ানোটাই আমার লক্ষ্য। যদি লক্ষ্যভেদ করতে পারি তবেই আমার ছড়া মিশ খাবে, নয়তো নয়।

মুখের কথার সঙ্গে তিনি কথার সুরও ধরতে চেয়েছিলেন। কথার সুরও তিনি পেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মুখে মুখে কাটা ছড়ার কাছ থেকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে অন্নদাশঙ্করের মতে লোকজ ছড়ার সঙ্গে মিশ না খেলে তা খাঁটি ছড়া নয়। তিনি কিন্তু এই তত্ত্ব আধুনিক ছড়ার

পক্ষ থেকেই দিয়েছিলেন। তাঁর শর্ত পূরণ করতে পারেনি বলে রবীন্দ্রনাথকেও ছাড় দেননি তিনি। রবীন্দ্রনাথের ছড়াও তাঁর 'কানে লাগেনি।' ছড়াকে তিনি নিতে চেয়েছিলেন মুখের বুলির কাছে। তাই তাঁর মতে,

ছড়া লেখা কথাটা ঠিক নয়। হওয়া উচিত ছড়া কাটা। ছড়া কাটতে হয় মুখে মুখে। কলমের মুখে নয়। ঠাকুমা দিদিমারা এখনো মুখে মুখে ছড়া কাটেন। পুরনো ছড়া নয়, নতুন ছড়া। তাঁদেরই বানানো।

দেখা যাচ্ছে ছড়ায় তিনি চিরায়ত-লোকায়তের অনুসারী। সময়বদলের অনুষঙ্গকে তিনি লোকজ ছড়ার অনুসরণে ধরতে চান। সেজন্যই কি তিনি সুকুমার রায়ের নাম ছড়ার প্রসঙ্গে তোলেননি? অন্নদাশঙ্করের অনুরাগী বুদ্ধদেব বসু তো সুকুমার রায়েরও অনুরাগী। বুদ্ধদেব বসুও সুকুমার রায়ের ছন্দিত শিশুরচনাকে ছড়া বলেননি, পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন কবিতা। হয়তো অন্নদাশঙ্করেরও মত তাই ছিল বলেই তাঁর নাম একবারও আনেননি। তাছাড়া অন্নদাশঙ্কর কবিতার সঙ্গে ছড়ার সুস্পষ্ট পার্থক্য করতে চেয়েছেন। সুকুমার রায়কে তিনি কবি মনে করেছিলেন বলেই ছড়ার আসরে তাঁর নাম নেননি। বুদ্ধদেব বসু বা অন্নদাশঙ্কর রায় সুকুমার রায়কে ছড়াকার না মানলেও গত সত্তর বছরেরও বেশি সময় ধরে ছড়াকার নামেই তিনি পরিচিত হয়েছেন। এর কারণ সুকুমার রায়ের কবিতায় হাসির অস্তিত্ব রয়েছে শিশুর জগতের ওপর ভিত্তি করে। সেই দিক থেকে সুকুমার রায়কেও আধুনিক ছড়ারই অন্যতম পথিকৃৎ বলতে হবে। অন্নদাশঙ্কর রায় না মানলেও রবীন্দ্রনাথ এই দিক থেকে আধুনিক ছড়াকারই। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ শিশুতোষ রচনা কবিতা- বৈশিষ্ট্যের হলেও কিছু কিছু কবিতাকে এক ধরনের ছড়ার দলেই ফেলা যায়। এগুলোর বৈশিষ্ট্য সুকুমার রায়ের ছড়ার গোত্রের। যেমন,

ক্ষান্তিবুড়ির দিদিশ্বাশুড়ির পাঁচবোন থাকে কালনায়
শাড়িগুলি তারা উযুনে বিছায় হাঁড়িগুলি রাখে আলনায়!

এই রচনায় হাসির উপকরণ আর শিশুর জগৎ আছে সমান গুরুত্বে হাত ধরাধরি করে। এই ধরনের রচনার অনুসরণে আধুনিক ছড়া প্রচুর লেখা হয়েছে পরবর্তী কালে। অন্নদাশঙ্কর রায় স্বীকার না করলেও এই ধারার রচনাকে ছড়া হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। ফররুখ আহমদ, শামসুর রাহমানের কিছু রচনা, রোকনুজ্জামান খান, ফয়েজ আহমদ, সুকুমার বড়ুয়া বা লুৎফর রহমান রিটন খানিকটা এই ধারাতেই এগিয়েছেন; যদিও এঁদের অনেকেরই রচনায় অন্নদাশঙ্করী বৈশিষ্ট্যও দুর্লক্ষ নয়। আমীরুল ইসলামেও এই ধারার ছড়া একেবারে কম নেই। আবদার রশীদের অসাধারণ হাস্যমুখর ছন্দিত রচনাগুলো ছড়া নামেই অভিহিত! অন্নদাশঙ্কর রায়ের কথা মানলে তাঁকেও নির্জলা হাসির কবিই বলতে হবে, ছড়াকার নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনটা ছড়া, কোনটা ছড়া নয় তা নির্ধারণে কোন মানদন্ডকে মান্য করা সঙ্গত হবে তা নির্ধারণ করা খুব সহজ নয়। অন্নদাশঙ্কর রায় কেবল তত্ত্বই দেননি, নিজে লিখেও দেখিয়েছেন। তাঁর যুক্তির জোর প্রবল। অন্যদিকে সুকুমার রায়ের শিশুকবিতাকে ছড়া না মানলে বাংলা শিশুকবিতার খুব কম অংশকেই ছড়ার মর্যাদা দেয়া যাবে। তাছাড়া দীর্ঘকাল

ধরে এই ধারার রচনাকে ছড়া জ্ঞান করেই বাংলা ছড়াসাহিত্য পুষ্ট হয়েছে। সুতরাং এই পক্ষের দাবিকেও একেবারে উপেক্ষা করা যায় না।

ছড়া নামে পরিচিত ছন্দিত রচনার আরও অনেক দিক রয়েছে যা নিয়ে আলোচনার অবকাশ প্রবলভাবে বর্তমান। যেমন এমন কিছু ছন্দিত রচনা রয়েছে যেগুলোর চাল হালকা হলেও বক্তব্যে গুরু। কবিতার আসরে এগুলোর স্থান হয় না। সকলেই ছড়ার দলে ফেলেন এগুলোকে। বিশেষ করে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রধান হয়ে ওঠে এসব রচনায়। কোথাও কোথাও উইট বা ব্যঙ্গপ্রধান ছন্দিত রচনাকেও ছড়া নামে অভিহিত করা হয়। কার্টুনে যেমন চিত্র ও অর্থের বিপর্যয়ের মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশ করা হয় তেমনি কিছু ছন্দিত বক্তব্যকেও চিহ্নিত করা হয় ছড়া নামে। আবু সালেহ ছড়া বা দৈনিকের পাতায় প্রকাশিত ছন্দিত রচনাকে এই দলে ফেলা যায়। কিন্তু এগুলোকে ছড়া বলা ঠিক কিনা তা নিয়ে রয়েছে বিস্তর প্রশ্ন।

২

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছড়া: বিষয়বৈচিত্র্য ও ভবিষ্যৎ প্রবণতা

আধুনিক ছড়া এমন এক ছন্দিত শিল্পসংরূপ যার শক্তি এর মিতায়নে, মিতকথনে, লঘুভার জীবনভাষ্যে, উপস্থাপনের তীক্ষ্ণতায়, অন্ত্যমিলের মজায় ও সর্বোপরি শিশুর জগতের উপস্থিতিতে। কিন্তু উজ্জ্বল কল্পনাশক্তি ও গভীর দার্শনিকতা, বাকচাতুর্য ও হাস্যরস পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলি সহযোগে যে-সব ছড়ায় উপস্থাপিত হয় সে-সব ছড়া হয়ে উঠে আরও মহার্ঘ। কবিতার ভুবনে ছড়া তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত থাকে বলেই অনেকে ছড়াকে কবিতা থেকে আলাদা করে দেখেন। তাঁরা ভুলে যান যে বিশেষ ধরনের এক প্রকার কবিতাকেই ছড়া বলা যায় যে-কবিতায় আধারিত হয় মোটের ওপর উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যাবলি। এতক্ষণ সংক্ষেপে যে-সব বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লিখিত হল সে-সব বৈশিষ্ট্য-মানদন্ডের বিচারে যথার্থ ছড়ার খোঁজ খুব বেশি পাওয়া যাবে না। সাম্প্রতিককে ধারণ করার ব্যাপারে ছড়ার একটা সর্বগ্রাসী ক্ষমতা আছে বলে ছড়াকাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিতে পড়েন; ফলে তাঁরা সাম্প্রতিক বিষয়াবলির ছন্দিত উপস্থাপনকেই ছড়া ভেবে বসেন। একটু ঘুরিয়ে যদি বলি তাহলে বলা যায়, মিতায়তন ছন্দিত তীক্ষ্ণভাষ্যমাত্রকেই ছড়া জ্ঞান করেন অনেকেই। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় এভাবে যে, চটুল ছন্দের অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ রচনামাত্রই তাঁদের কাছে ছড়া বলে প্রতিভাত হয়।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছড়ায় বিষয়বৈচিত্র্য ও ভবিষ্যৎ-প্রবণতা বিষয়ে লিখতে গিয়ে উপর্যুক্ত কথাগুলো মনে এল। সম্ভবত গত প্রায় এক দশককাল ধরে বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় সাম্প্রতিক বিষয়াবলি নির্ভর ছড়া প্রকাশের নামে যে-ধরনের ছড়া প্রকাশিত হয়ে চলেছে তা নিয়মিত পাঠ করলে এমন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে দৈনিক পত্রিকার পাতায় ছড়ার এই উপস্থিতিকে আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিতেই দেখতে হবে। কারণ ছড়ারচনা যে তুচ্ছ কোনো কাজ নয়, ছড়া যে শিশু-মনোজগতের ভাষায় কথা বললেও এর ক্ষমতা কেবলই শিশুপাঠ্য জগতের জন্য সীমিত নয়, ছড়া যে সর্বগ্রাসী ও সর্ববহ হয়ে উঠতে পারে তার আপাত চটুল, মিতায়তন, মিতবাক আধারের মধ্যে– এমন ধারণা এর মাধ্যমে সূচিত

হয়েছে। দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া সত্তরের বা আশির দশকে ছড়ার অবস্থান গণমাধ্যমে এতটা দৃঢ় ছিল না। ছড়া নিয়ে মননশীল সাহিত্যের চর্চাও সাম্প্রতিক কালে লক্ষযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। বেশকিছু লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে ছড়াকে উপজীব্য করে। ছড়া নিয়ে এই যে মননশীলতার চর্চা ক্রমশ বেড়ে চলেছে এটাও একটা আশাব্যঞ্জক ব্যাপার। ছড়াকেন্দ্রিক লিটল ম্যাগাজিনে ছড়াগ্রন্থের সমালোচনাও প্রকাশিত হচ্ছে কিছু যা একসময় প্রায় ছিলই না বলতে গেলে। এইসব লিটল ম্যাগাজিনে ছড়া বিষয়ক প্রবন্ধের পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যায় নতুন ও বিচিত্র ছড়া ছাপা হচ্ছে যাতে রয়েছে বিষয়বৈচিত্র্যও। সবচেয়ে যেটা চিহ্নযোগ্য বিষয় তা হল ছড়ারচনাপ্রয়াসী অসংখ্য নতুন নাম চোখে পড়ছে আমাদের। চর্চা যদি এ-রকম অব্যাহতগতি হয় তাহলে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, আমাদের ছড়াসাহিত্যের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল।

ছড়া যে কেবল শিশুপাঠ্য নয় এ-কথা গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন মনস্বী অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি বড়দের জন্য আলাদাভাবে ছড়ার বই প্রকাশ করে তার সে অনুধাবনকে জনসমক্ষে হাজির করেছিলেন। তাঁর মতো দিকপাল প্রতিভা বিষয়টির দিক স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা সত্ত্বেও ছড়ার শিশুত্ব ঘোচেনি। ছড়া যে বড়দের কাছেও আলাদা ভাবে উপভোগ্য শিল্প-সংরূপ তা প্রতিষ্ঠা করা গেছে এমন কথা এখনও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। এর সবচেয়ে বড় কারণ এই সংরূপের মধ্যে শিশু মনোজগতের অবশ্যম্ভাবী উপস্থিতি। শিশুমনোজগতের ইচ্ছে-খুশির ভেলায় চড়ে সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়ে মণিমাণিক্য আহরণ করা ছড়ার অন্যতম লক্ষ্য। ফ্যান্টাসির উজ্জ্বলতা ছড়ার গায়ের অন্যতম আবশ্যিক জামা হয়ে লেগে থাকে বলে ছড়ার জামা গায়ে দেয়া পদ্যমাত্রকে কেবলমাত্র শিশুর ভোগ্য জিনিস বলে ভেবে বসা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল এই যে, ছড়া বিষয়ে এন্তার লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ছড়ারচনাপ্রয়াসী ব্যক্তি এই ব্যাপারটি অনুভব করতে পারেন না। এমনকি অনুভব করতে পারেন না ছড়াসাহিত্যের অধিকাংশ সমালোচক বা তাত্ত্বিকও। লিটল ম্যাগাজিনের পাতায় অনেক ছড়াগ্রন্থের সমালোচনা পাঠ করতে গেলে দেখা যায় যে, ছড়া-সমালোচকেরা তাঁদের সমালোচনায় ছড়াকারের ছড়াত্বকে খোঁজার চেয়ে অন্যতর আনুষঙ্গিক বিষয়ে কথা বলেন। অর্থাৎ সত্যিকারের ছড়া বিচারের উচ্চতর কোনও মানদন্ড তাঁদের হাতে রয়েছে বলে মনে হয় না। তাঁদের সমালোচনা পাঠ করে ছড়া-আস্বাদনে পাঠকদের মধ্যে নতুন কোনও মাত্রা যোগ হয়েছে এমন রচনা পাওয়া যায় হাতে-গোনা-সংখ্যায়। ছড়া নিয়ে সাম্প্রতিক মননশীলতার চর্চা তাই একদিকে আশাবাদী করে তুললেও অপরপক্ষে খানিকটা নিরাশও করে আমাদের।

ছড়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে গোড়াতেই ছড়া শব্দটির আগে আধুনিক শব্দটি জুড়ে দেয়া হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের ছড়ালেখকেরা লোকায়ত জীবনে ছড়ার কী চর্চা হচ্ছে তার খোঁজ খুব একটা রাখেন বলে মনে হয় না। লোকায়ত ছড়ার সাম্প্রতিক সংগ্রাহকদের ঝুলিতে এখনও যে-সব ছড়া যুক্ত হয়ে চলেছে তার প্রায় সবই প্রাচীন। কারণ আধুনিকতার অভিঘাত মানুষের চৈতন্যের সজীবতাকে করে দিয়েছে বিকৃত, কৃষিভিত্তিক লোকায়ত জীবনচর্চা বলতে যা বোঝায় তা প্রায় অবসিত হতে বসেছে। ফলে আমাদের লোকায়ত অতীতের ভিত্তির ওপর

লাগাতে হচ্ছে আধুনিক চেতনার পলেস্তারা। এ-কারণেই আমাদের সাম্প্রতিককালের লোকায়তগন্ধী ছড়াগুলোও আর কোনও ভাবে লোকায়ত থাকছে না, হয়ে উঠেছে আধুনিক; নতুনতর ব্যাখ্যায় কোনও কোনো ছড়াকে উত্তর-আধুনিক বা আধুনিকোত্তর বলেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আধুনিকতার জীবনচেতনাই প্রাধান্য বিস্তার করে এই ধরনের যে-কোনও সৃষ্টিকর্মে। সেইসূত্রেই ছড়াও আধুনিক হয়ে উঠছে, লোকায়ত আর থাকছে না। বিশ্বায়নপুঁজি মানুষের মধ্যে লোকায়তিক সংস্কৃতিকে দানা বাঁধতে দিচ্ছে না বলে আধুনিক না-হয়ে তার উপায়ও নেই; এমনকি আধুনিক না-হতে পারলেও সে আর পারছে না কিছুতেই লোকায়তিক থাকতে।

ষাটের দশকে রাজনীতি-উত্তাল বাংলাদেশে ছড়াকারদের কাউকে কাউকে রাজনৈতিক বক্তব্য-প্রধান ছড়া রচনায় আগ্রহী হতে দেখা গিয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলোর স্থান হত ছোটদের পত্রিকায় বা দৈনিক পত্রিকার ছোটদের বিভাগে। ঊনসত্তরের অভ্যুত্থানের সময়ও ছড়ার তেজ দেখেছি আমরা। ষাটের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশে ছড়াচর্চায় হাস্যরসের প্রাধান্য ছিল। এর একটি ধারায় প্রাধান্য পেয়েছে ঘটনার অসংগতি, আর একটি ধারা গড়ে উঠেছে লোকছড়া থেকে প্রেরণা নিয়ে। অপর একটি ধারায় চেষ্টা করা হয়েছে বক্তব্যকে উজ্জ্বল করে তুলতে।

সমসাময়িক ঘটনার অসংগতিকে ছড়া যেভাবে তিরস্কার করতে পারে তার রয়েছে এক আলাদা সৌন্দর্য। স্বাধীনতা-উত্তর কালে বক্তব্যপ্রধান ছড়ার এই ধারাটিই প্রধানত রাজনীতি-আশ্রিত হয়ে উঠেছে। দুর্নীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নানা অসম্পূর্ণতাকে তিরস্কার করে সৃষ্টি হয়েছে আর এক ধরনের ছড়া যার প্রাধান্যও ছিল যথেষ্ট। বঞ্চিত মানুষের পক্ষে বাম রাজনীতি-চেতনার একটা তীক্ষ্ণ ধারাকেও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে দেখা গেছে সত্তরের ও আশির দশকে।

বাঙালির সবচেয়ে বড় অর্জন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র লাভ। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম এবং রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তা অর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়ে মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা নিয়ে লেখা হয়েছে প্রচুর সংখ্যক ছড়া। এর ফল হিসেবে আমরা পেয়েছি এই জাতীয় বেশকিছু ছড়া-সংকলন। এরই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা ছড়ার কথাও। সম্ভবত তাঁকে নিয়ে যত ছড়া লেখা হয়েছে আর কোনও একক ব্যক্তিকে নিয়ে এত ছড়া লেখা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা-বঙ্গবন্ধু একাকার হয়ে গেছে দেশপ্রেমের ছড়ায়। এ-ছাড়াও সাম্প্রদায়িক চেতনাবিরোধী ছড়ারও একটা শক্তিশালী ধারা বর্তমান রয়েছে সাম্প্রতিক ছড়াযাত্রায়।

সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে অপ্রাপ্তির হতাশা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির চাপ ছড়ারচনাপ্রয়াসীদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল অনেক প্রতিবাদী ও ক্রোধী ছড়া। পঁচাত্তরের রক্তক্ষয়ী ট্র্যাজেডির পরও দীর্ঘ সামরিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের কালে ছড়া হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদের অন্যতম হাতিয়ার। সামরিক স্বৈর শাসনামলে একাত্তরের স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তির পুনর্বাসন ঘটলে তার বিরুদ্ধেও রুখে উঠেছে ছড়া। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পক্ষাবলম্বনকারী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধেও ছড়া গর্জে উঠেছিল অন্তহীনভাবে। তখন থেকে ছড়া স্থান পেতে শুরু করেছে নানা ধরনের সংকলনে বয়স্কজনের পাঠ্য কবিতার পাশে সমমর্যাদায়।

আশির দশকের গোড়ায় বাংলা একাডেমিতে কবিতা-পাঠের আসরে ছড়াকারদের স্থান হয়েছিল পৃথক মর্যাদায় তাদেরই যোগ্যতার চাপে। এ-সব কিছুই সাম্প্রতিক ছড়ালেখকদের প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে। একাত্তরের পাকিস্তানি হানাদারদের দোসর শক্তির বিরুদ্ধে ছড়ার গর্জমানতা অব্যাহত রয়েছে। মোদ্দা কথা যে-কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধেই ছড়ার এই হুংকার এক চির-সাম্প্রতিক ব্যাপার।

প্রযুক্তির উন্নতিতে আজ অন্তর্জাল চলে এসেছে মানুষের হাতের মুঠোয়। বাঙালি আজ ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বব্যাপী। জীবনে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন বাস্তবতা। সৃষ্টিশীল ছড়াকারগণও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছেন একই ধারাবাহিকতায়। ছড়াতেও লেগেছে এর হাওয়া।

অন্তর্জাল-নির্ভর সামাজিক-সচেতনতামূলক ব্লগেও আজকাল চলছে স্বতঃস্ফূর্ত ছড়াচর্চা। নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক ছড়ায় এইসব অযুষঙ্গ যুক্ত হয়ে ছড়াকে উত্তীর্ণ করেছে ভিন্ন মাত্রায়।

সাম্প্রতিক কালে দৈনিক পত্রিকাগুলো নিয়মিত যে-সব সাপ্তাহিক সাময়িকী প্রকাশ করে তার মধ্যে রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকপ্রধান এক ধরনের সাময়িকীর দেখা পাওয়া যায়। দেশের প্রায় সব প্রধান দৈনিকগুলোই তা প্রকাশ করে। এসব কৌতুকপত্রে ছড়ার রয়েছে বিশেষ স্থান। প্যারোডিজাতীয় ছড়ার চর্চায় এইসব সাময়িকী তো বড় ভূমিকা রাখছেই তারচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে বয়স্কজনের ছড়ারসনা পরিতৃপ্তিতে। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত ছড়ার বইগুলোর দিকে তাকালেও এ-কথা স্পষ্টভাবে অযুভূত হবে।

ছড়া শিশুমনোজগতের আধার বলে শিশুসাহিত্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকবে চিরকাল। ইদানিং যাঁরা ছড়া লিখছেন তাঁদের একটা অংশ চেষ্টা করছেন খুব কম বয়সী শিশুদের শিক্ষাসহযোগী ছড়া লিখতে। দুর্ভাগ্য, যাঁরা ছড়াকে শিক্ষাসহযোগী করে তুলতে চান তাঁদের অধিকাংশই সফল হন না বলে ছড়ার মতো এইসব দুর্বল রচনা ছড়ার প্রতি শিশুদের বিরাগই বাড়িয়ে তোলে। বিশেষত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কিংবা নানা ধরনের সাহায্য সংস্থার উদ্যোগে এই ধরনের ছড়া লেখা হচ্ছে।

শিশুতোষ ছন্দিত রচনামাত্রই সাধারণত এক বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে শিশুতোষ ছন্দিত রচনাকে ছড়া ও কিশোর-কবিতা এই দুই অভিধায় বিভাজিত করে ছড়ার বৈশিষ্ট্যকে আরও নির্দিষ্ট করার একটা প্রয়াসও চলছে। সংখ্যায় স্বল্প হলেও ছড়াকারদের কারও কারও হাতে নারীজীবনের বৈশিষ্ট্য ও বঞ্চনার কথাও উঠে এসেছে যা পৃথক উল্লেখের দাবি রাখে।

এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে বহু সংখ্যক লেখকের সম্মিলিত প্রয়াসে রচনাপ্রাচুর্য ঘটেছে বাংলাদেশের ছড়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু একটা প্রচলপথেরও সৃষ্টি হতে চলেছে এর। দু-একজন প্রতিভাবান ছড়াকার প্রচল ভাঙতে হয়েছেন সচেষ্ট। তাঁরা কেউ ছড়ার সাংগীতিকতাকে প্রধান করে এর সঙ্গে যুক্ত করছেন ইতিহাস-চেতনা ও নিজস্ব বক্তব্যকে। কেউ লোকায়ত ছড়ার আদলকে ভেঙে সাম্প্রতিকতাকে স্থাপন করছেন। সংক্ষিপ্ততার মধ্যে স্থাপন করছেন অনেক গুরুভাষ্যের সারল্যকে। কেউ এমনকি ছুটি দিয়ে দেখতে চাইছেন ছড়ার সবচেয়ে বড় শত্রু

অন্ত্যমিলকেও। ছড়ার সারল্যে কবিতার সামর্থ্য সৃষ্টি করবার জন্য আমদানি করছেন ইনটেলেক্টকে। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা

ক্রমশ যেভাবে ঘটনাবহুল হয়ে উঠছে তাকে ধারণ করতে চাইছে ছড়ার আঙ্গিক। জীবনাভিজ্ঞতার জটিলতা ছড়ার আপাতসরল সংরূপে ক্রমশ হয়ে উঠছে আধারিত। ভবিষতের ইশারা কি আমরা এর মধ্যেই দেখছি না? লোকায়তকে ভেঙে লোকোত্তরতার পথে ছড়ার যাত্রা শুরু হয়ে যাওয়াকে এর মধ্যেই কি দেখা যায় না? গোড়ার দিকে ছড়া নিয়ে যে মননশীল চর্চার কথা বলা হয়েছিল তার মধ্যে বিপুল সংখ্যক তরুণের অংশগ্রহণের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। সেই তারুণ্য সবকিছুকে ব্যর্থ হতে দিতে পারে না।

দীর্ঘকাল ধরে আধুনিক বাংলা ছড়া কেবল শিশুমনোরঞ্জনের ভূমিকাই পালন করতে চেয়েছে। কিন্তু আজ আর ছড়া এই সীমানায় আবদ্ধ নেই! এই উপলব্ধিই ছড়াকে নিয়ে যাবে আরও বেশি সম্ভাবনার পথে। একসময় ছড়া লেখা হত সংখ্যায় খুবই অল্প। আজ বাংলাদেশ এমন বেশ কয়েকজন ছড়াকারকে পেয়েছে তারা যেমন অজস্রপ্রসূ তেমনি সৃষ্টিশীল নানা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই উজ্জ্বলতাও ছড়ার উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎকেই নির্দেশ করে।

আপাতদৃষ্টিতে ছড়া-আঙ্গিককে সীমিতসাধ্য মনে হলেও ছড়া জীবনের অনেক গভীর ভাবকেও ধারণ করতে পারে সে-ছড়া শিশুতোষই হোক আর বয়স্কজনপাঠ্যই হোক। বিশ্বব্যাপী মানবজীবনের যে বৈচিত্র্য রয়েছে তাকে যিনি অনুভব করতে পারবেন ছড়াকারের হৃদয় দিয়ে তিনি পারবেন ছড়াকে জীবনের বৃহত্তর অযুভবের মাধ্যমে পরিণত করতে। বিশ্বায়নপুঁজির সর্বগ্রাসিতার মধ্যে থেকেই জীবনসামগ্র্যকে অনুভব করবার জন্য ছড়াকারকে চোখ-কান খোলা রেখে চালিয়ে যেতে হবে তাঁর সংগ্রাম। এই সংগ্রামে যে-ছড়াকার সামর্থ্য দেখাবেন তিনিই সৃষ্টি করবেন উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের অভিমুখ।

৩

আমাদের ছড়া

আধুনিক অর্থে ছড়াও গভীর মননশীল এক শিল্পমাধ্যম। ছড়াসৃষ্টি অনায়াসসাধ্য কোনো কাজ নয়। ছড়াকারকেও হতে হয় কল্পনাপ্রতিভাসম্পন্ন ও সমাজরাজনীতিবিষয়ে ওয়াকিবহাল মানুষ। কারণ শুধুমাত্র খুঁতহীন ছন্দসম্পন্ন অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ রচনার শেষে ঘটনাগত চমক থাকলেই কোনো রচনা ছড়া হয়ে ওঠে না। কিংবা ঝাঁঝালো কোনো বক্তব্যকে ছন্দোময়ভাবে উপস্থাপনের নামই ছড়া নয়। কারো কারো ধারণা লোকায়ত ছড়ার আদলে রচিত ছন্দোবদ্ধ রচনামাত্রই ছড়া। আবার চিরকালের লোকায়ত ছড়ার কিছু শব্দকে উল্টেপাল্টে পুনর্লিখন করাকেও অনেকে ছড়া মনে করেন। কেন এগুলো ছড়া নয় তা অনুধাবনে আগ্রহী ব্যক্তিমাত্রেরই থাকতে হবে গভীর মননশীলতা ও সমাজতত্ত্বের বোধ; তাঁর থাকতে হবে আধুনিক ও লোকায়ত বাংলাছড়ার বিস্তৃত পঠন-পাঠন। বাংলাসাহিত্যে কল্পনাপ্রতিভা ও মননশীলতায় যুগপৎ ঋদ্ধ সুকুমার রায় বা অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো কালজয়ী ছড়ালেখক থাকা সত্ত্বেও ছড়াকে সাহিত্যমূল্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেককে দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখা যায়; অনেকেই এটাকে নিচু স্তরের সাহিত্যমাধ্যম বলে গণ্য করেন। কিন্তু প্রকৃতঅর্থে ছড়া হচ্ছে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত একটি কবিতাসংরূপ। এর শরীর সূক্ষ্ম ও পলকা হলেও এবং জগৎ প্রধানত শিশু-পরিমন্ডলের হলেও এর সামর্থ্য বিরাট। শিশুর জগতের সবকিছুই এই বস্তুপৃথিবীরই অন্তর্গত। শিশুও বাস

করে রাজনীতি-সমাজ-অর্থনীতির বাস্তবতায়। যে অসম্পন্ন বোধের জগতে বাস করে শিশু তারও রয়েছে একটা সম্পন্নতার রূপ। যে অবুঝ অযৌক্তিকতার মধ্যে সে থাকে তাতেও আছে এক পারম্পর্য ও বুঝদারত্ব। এই সবকিছুকে গভীরভাবে অনুধাবন কি অমননশীলের কাজ? ছোটদের জগতের কারবারি বলে ছড়ার স্থান কেবল ছোটদের অঙ্গনেই থাকবে? যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর সংগৃহীত লোকছড়া সংকলন খুকুমনির ছড়া বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে ছড়াকে শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত বলে উল্লেখ করেছিলেন। বোধহয় সেই থেকে ছড়ার স্থান কেবল ছোটদের সীমানায়। এখনও ছড়াকে শিশুসাহিত্যের বিভাগে ফেলে রাখা হয়। সাহিত্য সাময়িকীগুলোতে ছড়া ছাপা হয় না সাধারণত। মনে করা হয় কেবল ছোটদের বিভাগেই হবে এর স্থান। অথচ বাংলার লোকায়ত ছড়াগুলো বৈশিষ্ট্যে সর্বদা ছোটদের নয়, বরং বড়দেরও উপযোগী।

তবে এটা ভালো লক্ষণ যে, ছড়া সম্পর্কে কৌতূহল সাম্প্রতিককালে কিছুটা প্রবল হয়ে এ বিষয়ে নানাজনের ভাবনার প্রকাশ ঘটাচ্ছে লিটল ম্যাগাজিনের গবেষণাধর্মী সন্দর্ভ রূপে। সাহিত্যমাধ্যম হিসেবে ছড়ার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার বিবেচনায় এটা একটা শুভ লক্ষণ। আবার এ-ও ঠিক যে, ছড়া নিয়ে অনেক প্রবন্ধ রচিত হলেও প্রণিধানযোগ্য লেখা পাওয়া যায় কমই। অধিকাংশ রচনায় ছড়ার প্রচলিত ও খন্ডিত সংজ্ঞার পুনর্বয়ানই পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় কিছু নামের বিশেষত্বহীন তালিকা। তাই বর্তমান রচনার লক্ষ্য ছড়ার ইতিহাস রচনা নয়, বরং বাংলাদেশের আধুনিক ছড়ার অভিমুখকে শনাক্ত করা।

ঢাকাকেন্দ্রিক ছড়াচর্চার সূচনা যাঁদের হাতে তাঁদের অনেকেরই যাত্রা শুরু সাতচল্লিশেরও আগে, কলকাতা থেকেই। বন্দে আলী মিয়া, জসীমউদ্‌দীন, সুফিয়া কামাল, কাজী আবুল কাশেম তখন কলকাতাতেই রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত। ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, হাবীবুর রহমান, আশরাফ সিদ্দিকী ও রোকনুজ্জামান খানও ঐ সময়ে আমাদের ছড়াসাহিত্যের পরিচিত মুখ। প্রধানত এঁরাই বাংলাদেশের সাহিত্যে আধুনিক ছড়াচর্চার সূচনা ঘটান। তাঁরা প্রত্যেকেই লোকায়ত ছড়া থেকে তাঁদের আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন। এর সঙ্গে নিয়েছেন সুকুমার

রায়-সুনির্মল বসুর ধারা থেকেও। বাড়তি ছিল তাঁদের কবিত্বশক্তির নবীনত্ব। কিন্তু তাঁদের ছড়াচর্চা রয়ে গেল প্রধানত শিশুসাহিত্যের অঙ্গনেই। লোকায়ত ছড়ার আরও যে-সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলোর আধুনিকতায় রূপান্তরের অযুশীলন হল কমই।

এ অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করল পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে। ঢাকা মহানগরী তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে গড়ে উঠতে থাকায় বিস্তৃতি ঘটতে থাকে এখানকার জনসংখ্যার, সামাজিক জীবনে আসতে থাকে নানা রূপান্তর। পরিধি বাড়তে থাকে মধ্যবিত্ত সমাজের। ছড়া ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে থাকে পূর্বতন লোকায়ত জগৎ থেকে। যুক্ত হতে থাকে নাগরিক জীবনের নানা অযুষঙ্গ। এই ধারার সবচেয়ে সফল ছড়াকার ফয়েজ আহমদ। তিনি চিরকালের ছড়ার আধারে ধারণ করলেন নাগরিক জীবনের বিচিত্র উপলব্ধিকে। আমাদের সাহিত্যের প্রধান কবিদেরও অনেকেই সোৎসাহে এগিয়ে এলেন ছড়ার সৃষ্টিতে। বিশেষ করে নিতে হয় শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদের নাম। এই দুজনই লোকছড়ার চিরকালের আদলকে তাঁদের আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসায় রাঙিয়ে দিলেন। শামসুর রাহমান

লোকায়ত আঙ্গিকের মধ্যে উদ্ভট রসকেও ছাড়লেন না। আল মাহমুদ তাঁর কবিকল্পনার শক্তিতে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতির অযুষঙ্গ মিশিয়ে লোকায়ত আঙ্গিককে দিলেন নতুন মাত্রা। এঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন সুকুমার বড়ুয়া। বাংলা ছড়ায় তাঁর পূর্বসূরি সুকুমার রায়-সুনির্মল বসুর হাস্যরসের ধারার সঙ্গে যোগ করলেন রাজনীতি-অর্থনীতির বাস্তব অযুষঙ্গকে। কখনও কখনও রাজনৈতিক উপলব্ধি প্রকাশের বিশুদ্ধ হাতিয়ারও করে তুললেন ছড়াকে।

ষাটের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ছড়াকে প্রভাবিত করেছে। ষাটের দশকে ছোটদের উপযোগী পত্রিকা বের হল কয়েকটি। ছড়ার আশ্রয় হল মূলত তাতেই। আগে যাঁদের কথা বলেছি তাঁরা যেমন ছোটদের জন্য ছড়া লিখেছেন তেমনি লিখেছেন তরুণেরাও। ষাটের দশকেই মূলত হাস্যরসের ছড়া লিখেছেন আবদার রশীদ। হাস্যরসের ছড়া লিখলেও তা ছিল সুকুমারীয় ধারা থেকে আলাদা স্বভাবের ও বৌদ্ধিকতায় তীক্ষ্ণ। ঐ সময়েই ছড়া লিখেছেন মাহমুদউল্লাহ, আখতার হুসেন। তাঁদের ছড়ায় হাস্যরস ও রাজনৈতিক ভাষ্য দুটোরই প্রভাব ছিল।

সত্তরের দশকে স্বাধীন বাংলাদেশে ছড়ার একটা প্লাবন ঘটল যেন। প্রবীণেরা তো রইলেনই, একঝাঁক নবীনেরও আবির্ভাব ঘটল। লোকায়ত ছড়ার ধারাকে সাঙ্গীকার করেও আধুনিক ছড়া লিখলেন খালেক বিন জয়েনউদ্দিন। লোকছড়ার কল্পনারঙিন অযুভূতিময়তা ও পরিশীলিত সুরময়তায় ছড়াকে করে তুললেন স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত। ষাটের আবু সালেহ রাজনৈতিক বক্তব্যকেই ছড়া বানিয়ে তুলতে চাইলেন স্বাধীনতা-উত্তর কালে। এ-সময়েই দেখা দিলেন আমাদের অতিপ্রজ ছড়াকারেরা। ছড়া লেখায় উৎসাহীদের সংখ্যা বেড়ে বিপুল হল। অর্থনীতির বিস্ফারিত ভূমিকার ফলে আমাদের জীবনযাত্রার নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটল। নাগরিক জীবনে যুক্ত হল নতুন অযুষঙ্গ, যেখানে ডাক পড়ল ছড়ার। বিজ্ঞাপনে তথা প্রচারণার বিচিত্র ক্ষেত্রে ছড়া হয়ে উঠল উপযোগী অস্ত্র। বিনোদনের ক্ষেত্রেও বিচিত্র ও বিস্তৃত সমাদর হল ছড়ার। ছড়া প্রবেশ করল সে-সব অঙ্গনে। ছড়ায় শিল্পরূপের চেয়ে প্রধান হয়ে উঠল উদ্দেশ্যের সাধন। সমকালীন ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকল 'ছড়া', যদিও এগুলোর কোনোটাই প্রায় ছড়া সংরূপের উল্লেখযোগ্য শর্ত পালন করতে পারে না। এইসব কারণেও ছড়ার রূপ নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে চলেছে। ছন্দোবদ্ধ অন্ত্যমিলসম্পন্ন ঝাঁঝালো ও তির্যক বক্তব্যকেই ভাবা হচ্ছে ছড়া। গত তিরিশ-চলিশ বছরে সে-অর্থে প্রচুর চড়া রচিত হলেও সত্যিকারের ছড়া পাওয়া গেছে কমই।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে সংখ্যার বিপুলতায় ও স্বভাবের বিচিত্রতায় লুৎফর রহমান রিটন এবং আমীরুল ইসলামের নাম আসবে সবার আগে। সুকুমারীয় ধারায় নিখুঁত অন্ত্যমিলে, হাস্যরসে, রাজনীতিলগ্নতায় ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে লুৎফর রহমান রিটনের ছড়া খুবই প্রাণবন্ত ও স্ফূর্তিময়।

অকুণ্ঠ প্রকাশ-আকাঙ্ক্ষায় তিনি সমকালের প্রায় প্রতিটি ঘটনা-তরঙ্গকে যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেঁধে ফেলতে পারেন ছড়ায়। আমীরুল ইসলাম সুকুমারীয় হাস্যরস ও উদ্ভটরসের পথে যাত্রা শুরু করলেও সেখানেই থিতু ও সন্তুষ্ট রইলেন না। চললেন

অন্নদাশঙ্করীয় বুদ্ধিবাদিতার পথে। লোকছড়ার বিপুল পঠনপাঠনের অভিজ্ঞতার ও জীবনোপলব্ধির গভীরতার ছাপ রাখতে পারলেন তাঁর ছড়ানিরীক্ষায়। আসলাম সানীও একই সময়ের ছড়াকার। তবে মোটের ওপর সুকুমারীয়-অন্নদাশঙ্করীয় ধারাতেই তাঁর ছড়ার প্রবাহ। এই ধারায় রচিত তাঁর ছড়ায় অনেক সময় আধুনিকতার পরিশীলনের অভাব দেখা গেলেও প্রকৃতিতে বিশিষ্ট এক ধরনের ছড়া লিখেছেন তিনি। পুরনো ঢাকার হিন্দি-উর্দু মিশ্রিত ডায়ালেক্টের সঙ্গে চিরায়ত ছড়ার সংস্কৃতির মিশ্রণে এক বিশিষ্ট রীতির ছড়া লেখেন তিনি যাকে আধুনিক ছড়ার অঙ্গনে ব্যতিক্রমী প্রয়াস বলা যায়। এই সময়ে আধুনিকতার পরিশীলনে প্রকৃত ছড়া যাঁরা লিখতে পারলেন তাঁদের মধ্যে হাসান হাফিজ অন্যতম। কিন্তু লোকছড়ার স্মৃতি ও সুরকে ধারণ করেও সমকালীনতার অনুভবকে ধারণ করে সৃষ্টি করতে পেরেছেন বৈচিত্র্য। পূর্বোল্লিখিতদের সমসাময়িক আহমাদউল্লাহও প্রচুর ছড়া লিখেছেন সুকুমারীয়-অন্নদাশঙ্করীয় ধারায়। কিন্তু শেষের দিকে তাঁর ছড়ায় আধারিত হয়েছে অধ্যাত্মচেতনা। ফলে তাঁর ছড়াও বাংলাদেশের ছড়ায় স্বাতন্ত্র্য যোগ করেছে। ছড়ার বহমান ঐতিহ্যের পথেই এগিয়ে চলতে পছন্দ করেন তিনি। সেইজন্যই হয়তো লোকছড়ার আঙ্গিক-সংগঠনকে গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের ছড়ার গতায়ুগতিক ইতিহাসে ফাহমিদা মঞ্জু মজিদের নাম তেমন উল্লিখিত হয় না। কিন্তু শিশুর জগৎ সৃষ্টিতে ও বিষয়স্বাতন্ত্র্যে তাঁর ছড়া বৈশিষ্ট্যমনিন্ডত। তাঁর ছড়া হাস্যরসে ও শিশু-কল্পনার বর্ণিলতায় যেমন উদ্ভাসিত তেমনি মানবিক মমতায় কোমল।

অতি সাম্প্রতিক কালে যাঁরা লিখছেন তাঁদের কারো কারো ছড়া নিয়ে সামান্য আলোচনা করা গেলে ভালো হত। কিন্তু এর জন্য দরকার সময় ও অভিনিবেশ। সেটা আপাতত সম্ভব হল না বলে এখানেই ক্ষান্ত দিতে হল। আর তা ছাড়া এমন একটি ছোট্ট রচনায় বাংলাদেশের ছড়ার অনুপুঙ্খকে ধারণ করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় উপস্থাপিত সিদ্ধান্তের সম্পন্ন ব্যাখ্যা দেয়া। এখানে কেবল সূত্রাকারে কয়েকজন সফল ছড়াকারের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে। বিস্তৃত গবেষণাকর্মে এই সূত্রসমূহের বিবেচনা কাজে আসতে পারে।

[লেখক: শিশু-কিশোর সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক।]

শিশুসাহিত্য: বাংলাদেশের ছড়া

আ স লা ম সা নী

[এ প্রবন্ধের লেখক হাতে লিখে এটি হালখাতাকে দিয়েছিলেন।
হাতে-লেখা রচনা বলে কম্পোজের সময় কিছু জায়গায় বুঝতে সমস্যা হয়েছিল। লেখককে অনেকবার অনুরোধ করা হয়েছিল সমস্যার জায়গাগুলো সমাধান করে দেয়ার জন্য। কিন্তু লেখক সেটি করে দিতে পরেননি সম্ভবত তার অতি ব্যস্ততার কারণে। তা সত্বেও লেখাটি হালখাতায় প্রকাশিত হলো। সুতরাং বেশ কিছু ভুল বা অসম্পূর্ণতা লেখাটিতে রয়েছে, যা মাথায় রেখে পড়ার জন্য পাঠককে অনুরোধ করা গেল। -প্রধান সম্পাদক।]

বিশ্বসাহিত্যের পূতপবিত্র সহজ সরল সৃষ্টি শিশুসাহিত্য। শিশু-আদি-অন্তিম-সার্বজনীন ও অনিবার্য। শিশুর জগৎ সাবলীল-নরম কোমল-ভাব ও কল্পনার। সৃষ্টির ভ্রূন। কার শিশু সাহিত্য ছোট-বড়-বৃদ্ধাকার। শিশুর ভাষা আধো আধো বোল-'মা, শিশুসাহিত্যের সূচনা, চন্দ্র-সূর্য-বৃক্ষ-লতা-পাতা-ফুল-পাখি-নদী-প্রকৃতি- আলো ঝলমল- চিত্র কল্পে সুর ও ছন্দে দোলায়িত। সবভাষায়-সবদেশে আর বাংলাদেশে তো বটেই। বাতাসের বয়ে চলা অনুরণণ নদী বা ঝরনার কলো কলো সুর শিশুসাহিত্যের ভাষা-স্বপ্নময়-আবেগ-সংবেদনশীল রূপকথার ব্যঞ্জনায় সুললিত। আসলে শিশুসাহিত্য এক পুণ্য স্বপ্নের জগৎ। এখানে বৃষ্টির রিমঝিম সুরে। বাতাসের ঝিরিঝিরি ছন্দে-শব্দ-বর্ণ-তাল-লয়-মাত্রায় মূর্ত হয় প্রতি মূহুর্তে। অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী-সত্যেন দত্ত-আনন্দ মোহন বাগচী-আশাপূর্ণা দেবী-'ঠাকুর মা'র ঝুলি''ক্ষীরের পুতুল'-অমর উপন্যাসে-রূপকথার গল্পে কিংবা মাইকেল-কবিগুরু-নজরুল-সুকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র অমর সর্ব শিশুসাহিত্যিকদের মঙ্গলকাব্য-ছড়ায় অমর বাংলা শিশুসাহিত্য।

এখানকার জনমানুষের সুখ-দুঃখ-কষ্ট-কাহন পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন-হাবীবুর রহমান

শিশুসাহিত্যিক-সাধক-গবেষকদের মেধা-মনন-চিন্তা চেতনা-আরাধনা স্বপ্নে উদ্দীপ্ত-জ্জীবিত-আলোড়িত-আলোকিত। শিশুকিশোর মন ঋতন্ত্র ভাবালুতা,কাল্পনিক জগৎ-সত্য-সুন্দর-বর্ণিল-উজ্জ্বল-চঞ্চল এক স্বপ্নজগৎ এ অঞ্চলের লোক-সাহিত্যই তার চিত্র বহন করে। অথচ এখানে কয়েক হাজার বছর ধরে-বহিঃশত্রু -দূর্বৃত্ত-শাসক-শোষক-হায়েনা, লুটেরা-রোগ-

শোক-খরা-দুর্ভিক্ষ মহামারী-সড়ক-এ অঞ্চলের মানুষের জনজীবনকে বেশ অতিষ্ঠ করেছে-নাড়া দিয়েছে। যা এখানকার ছড়ায়-উচ্চকিত-পদ্য-ছড়া-কবিতায়-শিশু ঘুমোলে-পাড়া জুড়োলো বর্গি এলোদেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে-খাজনা দেবো কিসে, ধান-কুড়োলো পান ফুরোলো, বাঁচার উপায় কী? আর কটাদিন দেরি করো রসুন বুনেছি... ।

তারপর ও আমাদের শিশুসাহিত্য অত্যন্ত মোলায়েম-অথচ দেশভাগের মর্ম জ্বালা-মোঘল-ইংরেজ-পাকিস্তানি-শোষণ বৈষম্য-স্বাধিকার-স্বাধীনতা-সামাজিক-রাষ্ট্রিক-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এখানকার সাহিত্যকে-শানিত প্রতিবাদী করেছে নিরন্তর। প্রকট ভাবে এসব চিত্রকল্প-উপমা-উদাহরণে মূর্ত হয়েছে-গল্প-উপন্যাস-কাব্য-ছড়া-নাটক-যাত্রা-সংগীত-নৃত্যে-চিত্রকর্ম ভাস্কর্যে ।

বাহান্নে ভাষা আন্দোলনে দুঃখিনী বর্ণমালার রক্তস্নাত পথ ধরে মোদের গরব-মোদের আশা আ'মরি বাংলাভাষা প্রানন্ত প্রাঞ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে বিশ্বময়ধনে ধান্যে-পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি

এই মহাকাশজয়ী অমর কথা-সুর ছন্দে আমরা মহিমান্বিত-গর্বিত। আবার বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা আমাদের স্বাধিকার-স্বাধীনতার ব্যাকুলতা চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন-বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন-ছিষট্টির-বাঙালির জীবনকবচ ছয়দফা-ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান-সত্তরের গণতান্ত্রিক বিজয়-সাধারণ নির্বাচন আর এক চার হাজার বছরের বাঙালির আরাধ্য পুরুষ-বীর-মহামানব-গণনায়ক বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি-মাইকেল-মধুসূদন-বিদ্যাসাগর-রাজা রামমোহন- নেতাজি সুভাষ-বিদ্রোহী নজরচল-বাউল ঋষিত্ব লালন-হাসন-সুকান্ত-জীবনানন্দ-জসীমউদদীনের স্বপ্নচারী-সিরাজ-তীতুমীর-শরিয়তউলাহ ক্ষুদিরাম-সূর্যসেন-প্রীতিলতা- রোকেয়ার-পথ অনুসারী-হক ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রবাহক-বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির লোকজীবন সংস্কৃতি-রাজনীতি রূপকথার রাজ্য-আমাদের শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতি তথ্য লোকঐতিহ্যকে গৌরবান্বিত করেছে-যাঁর ডাকে একাত্তরের সর্বোজ্জ্বল সর্বত্যাগী-সাহসী মহান মুক্তিযুদ্ধ-আমাদের-জীবন-কর্ম-কীর্তিকে অনুরণিত- প্রেরণা যুগিয়েছে-যে কারণে- ভারতবর্ষের (আদি) শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি-বিশেষ করে আমাদের শিশুসাহিত্য এক অনন্য-স্বতন্ত্র-মাধুর্য-মহিমা পেয়েছে-আমাদের গল্প-ছড়া কিশোর কবিতা-গান নৃত্য-চিত্রকর্ম-ভাস্কর্য অসাধারণ মাত্রা পেয়েছে। আমাদের গোলাম মোস্তফা-ফখরুল আহমেদ-কাজী আবুল কাশেম-হাবীবুর রহমান-আহসান হাবীব-সুফিয়া কামাল-শামসুর রাহমান-আল মাহমুদ-সৈয়দ শামসুল হক-সরদার জয়েনউদ্দিন- রোকনুজ্জামান খান (দাদাভাই) এখলাসউদ্দিন-আতোয়ার রহমান রফিকুল হক (দাদুভাই) উজ্জীবিত হয়েছেন-নবউলাসে-নতুন মাত্রায় আমাদের শিশুসাহিত্য বা ছড়াসাহিত্যকে-বিশ্বজনীন-সাধুতা দিতে পেরেছেন-অমরত্ব-দিয়ে গেছেন। আর আমাদের জীবন গঠনের উদ্যেশমূলক ছড়া তো সেই-তলকালঙ্কারের-সকালে উঠিয়া-আমি মনে মনে বলি-সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি,.. বা আজিকে-পাখি সব করে শুধু কলরব....বা সুকুমার রায়ের- সেই সর্বাধুনিক ছড়া-হাতি-আর তিমি মাছের-সমন্বয়ে হাতিমির ছড়া বা হাঁস

আর সজারুর সমন্বয়ে হাঁস-জারুর লেখাগুলো সেই আদিকাল থেকেই আমাদের আন্দোলিত করেছে।

আধুনিক শতাব্দীর-বিশ্বায়নের ছড়া-কবিতা পদ্য-গদ্য আমাদের বাংলা ভাষায় বাংলাদেশে-সুকুমার বড়ুয়া-আখতার হোসেন-খালেক বিন জয়েনউদ্দীন-মাহমুদউলাহ-আমীরুল ইসলাম-লুৎফর রহমান রিটন-সৈয়দ আল ফারুক। আসলাম সানী-ফারুক নওয়াজ-সুজন বড়ুয়া-আলম তালুকদার-ফারুক হোসেন-রহীম শাহ- রোকেয়া খাতুন রুবী, রিফতিনিগার শাপলা-আনজীর লিটন-রাসেদ রউফ-সারওয়ারউল ইসলাম-ওবায়দুল গনি চন্দন- রোমেন রায়হান-উৎপল কান্তি বড়ুয়া-ওয়াসিফ এ-খোদা প্রমুখ শুধু স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে-বা বাংলাভাষায়ই নয় বিশ্বসাহিত্য ভা-ারকেও সমৃদ্ধ-সম্পূর্ণ করেছে বলে আমি মনে করি।

বাঙালি মাত্রই কবি-এই অঞ্চলের মানুষের কণ্ঠসুর-ছন্দে ছন্দে কথাবলা- প্রেমে- দ্রোহে এই ঐতিহ্য লক্ষণীয় সর্বত্র। সেই শৈশবে-নানী-দাদিদের মুখে শোনা-শিশুভোলানো-ঘুমপাড়ানিয়া ছড়া 'আয় আয় চাঁদ মামা-টিপ দিয়ে যা, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা...। পুরান ঢাকার ঢাকাইয়্যারা-(.....) বলে 'চান মামু লোরি-দুধ-ভাত কাটোরি-চাঁদ গিয়া নাহানে বিবি বাই ঠিখনে আওরে চান হামোকা বাবুকা কপ্পাল মে টিপ দেকে যা...'

সেই দেশবিভাগের প্রেক্ষাপট নিয়ে ছড়াগুরু অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই অমর ছড়া 'তেলের শিশি ভাঙলো বলে-খুকুর 'পরে রাগ করো- তোমরা যেসব বুড়ো খোকা-বাংলা ভেঙে ভাগ করো/দেশটা ভেঙে ভাগ করো তার বেলা...?

বা তারও আগে-কাজলা দিদির ছড়া-'বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই-মাগো আমার শোলকবলা কাজলা দিদি কই? দিদিকে হারানোর শিশুমনের সেই বিরহশোকের কথা–

আবার পল্লিকবির সেই ছড়া যেন আমাদের মাটির সেই প্রিয় গাঁয়ের কথা 'তুমি যাবে ভাই যাবে?মোরসাথে-আমাদের ছোট গাঁয়? গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায় তুমি যদি যাও দেখিবে সেখানে মটর লতার বনে শিম আর শিম হাত বাড়ালেই মুঠি ভরে সেক্ষনে...।

আবার 'ববর' কবিতায় দু' চোখ ভাসায় দাদু-এইখানে তোর দাদুর কবর ডালিম গাছের তলে-তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে...'

আবার উনিশ পঁচাত্তরের পনেরই আগস্টষৃণ্য-খুনি ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে বঙ্গবন্ধু নিহত হলে-এত-শত-হাজার-সহস্র- কোটি-ছড়া-পদ্য-গীতিনাট্যর মধ্যে একটি ছড়া সর্বাগ্রে-কয়েকটি শব্দে-বর্ণে-পঙ্‌ক্তিতে-সমগ্র ঘটনার প্রকাশ-প্রতিবাদ -প্রতিজ্ঞাকে অমর করে রাখে অন্নদাশঙ্করের 'যতকাল র'বে পদ্মা মেঘনা গৌরী-যমুনা বহমান/ততোকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান...'

এ অঞ্চলের শিশুসাহিত্য বা ছড়ায় কখনো-রূপকথা-রাজা-রানি-দৈত্য-দানো-হাতি-ঘোড়া-ভূত- পেত্নী-কল্পনা-নানা কিছুকে আশ্রয় করেছে-আবার গান মানুষের সংগ্রাম-আন্দোলন-লড়াইয়ে-মিছিলে-রাজপথে- শোগানে-ছড়া উঠে এসেছে প্রকৃতভাবে-যেমন

বাহান্নের ভাষা আন্দোলনে ছড়া হয়েছে শানিত হাতিয়ার-রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই-নুরুল আমিনের কলা চাই-নাজিমুদ্দিনের কলা চাই...

আবার একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে সরদার জয়েনউদদীন লেখেন লোকছড়ার আদলে 'ইলিশমাছের তিরিশ কাঁটা- বোয়ালমাছের দাড়ি-টিক্কাখানে ভিক্ষাকরে শেখ মুজিবের বাড়ি...

সাতমার্চ-একাত্তরের গণমিছিলে শোগান ওঠে 'ধরো বাঙালি অস্ত্র ধরো-বাংলাদেশ স্বাধীন করো...' জেলের তালা ভাঙবো- শেখ মুজিবকে আনবো... ।

কবি আল মাহমুদ লেখেন 'ট্রাক-ট্রাক-ট্রাক-শুয়োরমুখো ট্রাক আসছে দুয়ার-খুলে রাখ, কেন বাঁধব দোর-জানালা তুলব.....? আসাদ গেছে মিছিলে নিয়ে ফিরবে সে মিছিল... ।

আবার স্বাধীন-সার্বভৌম দেশে তিনিই লেখেন । আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেছে শেষে- হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে...

আর শৈশব-কৈশোরের পাঠশালা-পাঠ্যসূচিতে কবি সুফিয়া কামালের, নূর-পুষি আয়সা-সুফি-সবাই এসেছে-আমবাগিচার তলায় যেন সবাই হেসেছে... ।

বা হোসনে আর'র সফদার ডাক্তার,মাথাভরা টাক তার,ক্ষিদে পেলে পানি খায় চিবিয়ে, চেয়ারেতে রাতদিন বসে গনে দুই-তিন পড়ে বই আলোটা নিভিয়ে... ।

বা-আহসান হাবিবের- মেঘনাপারের ছেলে আমি, মেঘনা-নদীর নেয়ে,...বা অন্য কোনো ছড়ার অংশবিশেষ-উদ্ধৃতি...

বা- রোকনুজ্জামান খান দাদাভাইয়ের-'একটা গাথার দু'দিক থেকে টানছে দু'দল ছেলে-তাই না দেখে সকল বানর লাফায় খেলা ফেলে,সকল বানর ফন্দি আঁটে জবর মজার খেলা । এমন খেলা খেলে সবাই কাটিয়ে দেব বেলা... ।

আবার খান মোহম্মাদ মঈনুদ্দীন এর ছড়া 'ওই দেখা যায় তালগাছ ওই আমাদের গাঁ, ওইখানেতে বাস করে কানা বগির ছা, ও বগী তুই খাস কী পান্তা ভাত চাস কি, পান্তা আমি খাই না । পুঁটি মাছ পাই না, একটা যদি পাই । অমনি ধরে, গাপুস গুপুস খাই... ।

যখন সাংবাদিক ছড়াকার ফয়েজ আহমদ লেখেন সাংবাদিক সংগঠক- ছড়া-শিল্পী রফিকুল হক দাদুভাইয়ের লেখা ছড়া আবার সুকুমার বড়ুয়ার ছড়া । 'অসময়ে মেহেমান ঘরে এসে ঢুকে যান- দেখলাম ঝামেলার যতগুলো দিক আছে, মেহমান হেসে কন ঠিক আছে, ঠিক আছে, বেয়ানের পচা চাল টল টলে বাসি ডাল, থালাটাও ভাঙাচোরা বাটিটাও লিক আছে, খেতে বসে জানালেন, ঠিক আছে ঠিক আছে... ।

আখতার হুসেন ছড়ায় বলেন প্রগতি শীলতার কথা-.....

ছড়াকার খালেক বিন জয়েন উদদীন-একটু লোক ঢঙে.....

মাহমুদ উলাহর ছড়া বঙ্গবন্ধু-বাঙালি-বাংলাদেশ তথা দেশপ্রেমের ছড়া-মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতার ছড়া বা ঢাকায়্যা ছড়া 'সবচেয়ে বেশিগভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করে যাচ্ছেন শিশুসাহিত্যিক ছড়াকার কবি আসলাম সানী যেমন বাংলা আমার, বাঙালি আমি মহাকাশের

সন্তান, মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস আমার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান, ত্রিশ লক্ষ শহীদ আমার চিরকালের শ্রদ্ধা ।

মাহমুদ উল্লাহর ছড়া

ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটনের বহুল প্রচারিত ছড়া যেমন 'আব্দুল হাই করে খাই খাই...বা খুব জোরালো-সাহসী-রাজনৈতিক ছড়া 'কনতো দেহি আজকা দ্যামো সবচেয়ে' শরিল-তাজা করি?: যেই সলারা রাজাকারে.....

বহুমাত্রিক-সর্বাধুনিক প্রজ্ঞাবান-বিশ্বজনীন শিশু সাহিত্যিক-গবেষক-ছড়াকার আমিরুল ইসলাম বলেন- লোক ঐতিহ্য-শিশুর জীবনবোধ মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেমের কথা নানাভাবে যেমন-নীল আকাশের তারায় তারায় মুগ্ধ আমার দু' চোখ হারায়

সুজন বড়ুয়া , ফারচ্চ নওয়াজ, রহীম শাহ, আলম তালুকদার, ফারচ্চ হোসেন, রাসেদ রউফ, আনজির লিটন, সসারওয়ার উল ইসলাম কী অবলায় লেখেন 'একটি চড়ুই বৃষ্টিতে কাল,ভিজেছিলো বৃষ্টিতে সে গোসল সেরে লীচ্ছিল, লোতার পালক এবং পুচ্ছ-চড়ুই পাখি গোছল করে বুজছো., রোমেন রায়হান, আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, কিংবা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ছড়া, শুধু পদ্য বা ছড়ায় কেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অন্য ভাষায় বিশেষ করে ইংরেজী জুভেনাইল লিটারেচার বা রাইমস । এর প্রচলন লিলয়ের ছড়া বা লিমেরিক এর চর্চা লেখন পঠন আমরা দেখি । উর্দু বা হিন্দি শায়েরি বা মুশায়েরা বেশ পঠন-পাঠন- লেখেন-বা ব্যবহার হার লক্ষণীয়-যদিও-বাংলাছড়া-পদ্য-কিশোর কবিতা-লিমেরিক-পুঁথি স্বরবৃত্ত-অক্ষর বা মাত্রাবৃত্তে লিখিত হলেও-মুশায়েরা বা শায়েরির ও একটা তাল-লয়-ছন্দ-আদি-মিল-মধ্য বা অন্তমিল-এর আশ্রয় থাকলেও বাংলা ভাষার মতো-মাত্রা-তাল-লয়-ছন্দ ব্যবহার হয় না তেমন ।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ,একাত্তরের স্বাধীনতা । উত্তর বাংলাদেশের ছড়া হয়েছে.....শানিত বক্তব্যপ্রধান কেবলইকরি মিকড়ে উদ্ভব শব্দ-উইটি ছড়ার চেয়ে বেশি যুদ্ধজয়ী ছড়া কবি আমাদের বাংলা ছড়াসাহিত্যকে এ অঞ্চলের ছড়াশিল্পী অমর ও বিশ্বজনীন করেছে মহৎ মর্যাদাসম্পন্ন করেছে

তেমন আবার পঁচাত্তর পরবর্তী জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করলে-.....ক্ষোভে কবিদের পাশাপাশি ছড়াকাররাও প্রতিবাদী হয়েছে- প্রকাশিত হয়েছে.....আমরা রাখবো কোথায়' বা লাশের গন্ধ'

আবার নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে- মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গণজাগরণে রাজনৈতিক মঞ্চ ও ছড়াকার-আসলাম সানী-লুৎফর রহমান-রিটন, আমীরুল ইসলাম-আনজীর লিটন-প্রমুখ ছড়াশিল্পীরা উত্তপ্ত করেছে গণসমর্থন অর্জন করেছে ছড়া আর ঘরবন্দী-গ্রন্থবন্দী রইল না-বাহান্ন একাত্তর-পঁচাত্তর নব্বই-এর পর থেকে গণআন্দোলনের ন্যয্য হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে বেশ ।

বাংলা শিশুসাহিত্যে- কেবল পদ্য-ছড়া-কিশোর কবিতা-পুঁথি বা গানই শুধু নয় । আমাদের গদ্য বা ছোটদের গল্প-উপন্যাস-নাটক প্রবন্ধ-নিবন্ধ-চিঠি পত্র ও দেশ-জাতি-অঞ্চল-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-কৃষ্টি গৌরব-ইতিহাসকে-ধারণ বহন করে, যা বিশ্বজনীন-মেধা-মনন-চিন্তন ও চেতনা বেশ স্পর্শ করে ।

সেই বাংলাসাহিত্যের আদি উপন্যাস 'আলারে ঘরের দুলাল'বা ঠাকুরমার ঝুলি' অথবা 'বুড়ো আংলা'র কথা আমরা জানি যা অন্য ভাষীদের ও বিশ্বসাহিত্যের অমর সাহিত্যসম্পদ-যেমন রজনীর কাহিনী আরব্য উপন্যাস বা লোককাহিনি গল্প । এন্ডারসনের গল্প-গ্রিমভাইদের গল্প-কথা-'আঙ্কেল টমস কেবিন' গোপালভাঁড় বা মোলা দোপেয়াজার গল্প-কথা । আমাদের সোজন বাদিয়ার ঘাট' বা নকশি কাথার মাঠ' বা আধুনিককালের হাবীবুর রহমানের বোন মোরগের বাসা' বা
সেলিনা হোসেনের, বুলবুল ওসমানের, আনোয়ারা সৈয়দ হক, মুনতাসির মামুনের, আলী ইমামের, ফরিদুর রেজা সাগরের, রাহাত

খানের, শাহরিয়ার কবিরের, নাসির উদ্দিন ইউসুফের, ইমদাদুল হক মিলনের.....

তবে আমাদের বাংলা ভাষা বা বাংলাদেশের .....উজ্জ্বল-অমর সৃষ্টি আমাদের ছড়া রচনাসমূহ-কিছুটা কিশোর কবিতা । বহুযুগ পূর্ব থেকে এই আধুনিক যুগে তো বটেই আমার-বচন-প্রবচন বা বিজ্ঞাপন বাণিজ্যিক প্রচারে ও ছড়া-পদ্য ছড়ার অন্ত্যমিলের কথা বলার ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ করা যায় । অর্থাৎ ছড়ার সবল বাণী সাহিত্যে অতি অগ্রগামী এবং এর মতো 'টুইকেল টুইংকেল লিটিল স্টার'.....বা.....

বাংলাদেশের বাংলা ভাষার রূপকথা-ঘাসফড়িং-ফুলপাখি-প্রজাপতির স্নিগ্ধ-নরম- কোমল-মানবিক ছড়াগুলো ও একটি বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, কবে'-চাঁদ মামার হাত ধরে জ্যোস্না ছড়াতে বা প্রবল-প্রতিবাদী-জীবনসম্পন্ন ছড়াগুলো ও সমতালে স্বদ্যেতেনায়-উজ্জীবিত-আলোড়িত-আলোরিত-আন্দোলিত হবে বিশ্ব শিশুসাহিত্য মানস-আন্তর্জাতিক উচ্চকিত সাহিত্য পরিমণ্ডলে-অন্য ভাষা-অন্য জাতি-সাহিত্যের ও দৃঢ় স্থান করতে পারবে-এই আমার বিশ্বাস-তবে এই ক্ষেত্রে অনুবাদ বা ভাষান্তর হওয়া-এবং অনুবাদক-বহুভাষাবিদ-গবেষক-গুণীজনের আন্তরিক প্রচেষ্টা-উদ্যোগ খুবই প্রয়োজন ।

বাংলা ভাষায় চলচিত্রে ও আমরা ছড়া-পদ্য বা সংকল্প-কথনে অত্তমিল বা বটন বসের সন্ধান পাই-ছড়ার রাজা সুকুমার রায়ের সুযোগ সন্তান-বহুমাত্রিক-লেখা শিশুসাহিত্যিক-চলচিত্রনির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশ' বা' গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিগুলোতে । বিজ্ঞাপন সিঙ্গেল-বিল বোর্ডের পণ্য প্রতিষ্ঠানের চমকপ্রদ বা সহজ-সরল-সাবলীল-ম্যাসেজ পৌছাতেও আমরা লক্ষ করি এই ছড়া বা পদ্যের ব্যবহার ।

যেমন মাছের রাজা ইলিশ আর বাতির রাজা ফিলিপস বা এমনি ****** 'আম আটির ভেঁপু'বা পথের পাঁচালী' রাবেয়া খাতুনের, সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে, গুপী গাইন বাঘা বাইন ইত্যাদি গল্প চলচিত্ররূপ নিয়েছে ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্যারী চাঁদ,মহাশ্বেতা দেবী/ কাজী নজরুল ইসলাম / আশাপূর্ণা দেবী / শরদেন্দু ইসলামের শীর্ষেন্দু / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়..... ।।।

[লেখক: ছড়াশিল্পী । সংগঠক ।]

বাংলাদেশের ছড়া: সুদূরপ্রসারী ও দিগন্তবিস্তারী

রা শে দ র উ ফ

১৯৭১ বাঙালির এক অবিস্মরণীয় ও জ্যোতির্ময়ী বছর । ওই বছরে বাঙালি অর্জন করেছিল তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'মহান স্বাধীনতা' । ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার জন্য বিশাল আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাঙালির জাতীয় মানসে যে চেতনার বীজ বপন করা হয়েছিল, সেই চেতনারই চূড়ান্ত রূপ পরিলক্ষিত হয় একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে । বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে যুগান্ত কারী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত সেই 'মুক্তিযুদ্ধ'ই আমাদের শ্রেষ্ঠ গৌরব ও অহঙ্কার । এই অহঙ্কারের স্বতন্ত্র প্রভাব পড়েছে আমাদের শিল্প-সাহিত্যের নানা শাখায়, নানা প্রশাখায়; কবিতায়, ছড়ায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, চলচ্চিত্রে । নিজেদের শক্তিগুণে এগিয়ে গেছেন আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকরা । তাঁদের লেখায়-রেখায় উঠে এসেছে স্বাধীন বাংলাদেশ, প্রতিফলিত হয়েছে এদেশের স্বাধীনতার ৪৫ বছরের বিচিত্র গতি ও মানুষের নানা অনুষঙ্গ । সাহিত্যের অপরাপর শাখার মতো ছড়াও এগিয়ে গেছে সমান্তরালে, হয়েছে সুদূরপ্রসারী ও দিগন্তবিস্তারী । সম্ভাবনার বাংলাদেশে ছড়ার অগ্রযাত্রা রীতিমতো গর্বের বিষয় ।

খ.

ছড়া শব্দটির উৎপত্তি, সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণ বহুল আলোচিত বিষয়। কারো কারো মতে 'ছটা' শব্দ থেকে শব্দটি উদ্ভূত। যার অর্থ হল শ্লোক পরম্পরা বা ছন্দোবদ্ধ পদপরম্পরা। সেক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনটি এরকম : ছটা > ছডা > ছড়া।

আবার কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা 'ছন্দ' থেকে 'ছড়া' শব্দটি এসেছে। 'ছন্দ' শব্দের অপভ্রংশ রূপ হল 'ছড়া'। আসলে বাংলা ছড়ার জন্মপরিচয় উন্মোচন করতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হয় হাজার বছরের অতীত লোকালয়ে। আবহমান বাংলার লোকালয়ই ছড়ার উৎসমুখ। লোকজীবন থেকে উৎসারিত স্বতঃপ্রবাহিত নির্ঝরিণীর মতোই তার গতিপ্রকৃতি। তার শরীরে চিরায়ত রূপ প্রবহমান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ছড়ার মধ্যে একটা চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয়মাত্র নাই এবং কোন্ তারিখে কোনটা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।" [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছেলেভুলানো ছড়া, লোকসাহিত্য]। এই চিরপুরাতন ও চিরনতুন ছড়া কখনো আনন্দ-উল্লাসে, কখনো উত্তেজনায়, কখনো ব্যঙ্গ-কৌতুকে মুখে মুখে তৈরি হত। গাওয়া হত সুরে সুরে আবেগে-উচ্ছ্বাসে। সুরের আমেজে-কখনো ছড়া হয়ে উঠেছে শ্লোক, কখনো কখনো গান। 'সর্বপ্রকার প্রকাশভঙ্গির সর্বজনস্বীকৃত চিরাচরিত ভঙ্গি' হিসেবে ছড়া হয়ে উঠেছে জনপ্রিয়।

ছড়ার উৎপত্তি নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ছড়া ছিল মৌখিক ও লৌকিক ঐতিহ্য। তা লেখা হত না, কেবল গাওয়া হত। লোকমুখে প্রচলিত বা লোকসাহিত্যের এসব ছড়াকে সংগ্রহ করে সর্বপ্রথম লৈখিক রূপ দেন বাংলা ছড়ার প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ যোগীন্দ্রনাথ সরকার। তিনি ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে এসব সংগৃহীত ছড়াকে 'খুকুমণির ছড়া' শীর্ষক একটি গ্রন্থে সংকলিত করেন। সেই গ্রন্থের ভূমিকায় ছড়াকে প্রথমবারের মতো সাহিত্যের বিষয় বলে উল্লেখ করেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তিনি ভূমিকায় আরও লিখেছেন, "... কিছুদিন হইতে অনন্যসাধারণ প্রতিভায় পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই জাতীয় কবিতা সংগ্রহের অভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। ... তিনি স্বয়ং সংগ্রহকার্যে নিযুক্ত ছিলেন; এবং তাঁহারই প্ররোচনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় কিছুদিন এই সংগ্রহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু কী কারণে জানি না, কাজটা অধিক দূর অগ্রসর না হইয়াই থামিয়া যায়...."। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর এই ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছড়ার প্রথম সংগ্রাহক। সৌগত চট্টোপাধ্যায়ও 'বাংলার ছড়া, ছড়ার বাংলা' গ্রন্থের সম্পাদকীয়তে সেই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেন, "তিনিই (রবীন্দ্রনাথ) আমাদের ছড়ার প্রথম সচেতন সংগ্রাহক, আলোচক ও পরবর্তীকালে ছড়া বিষয়ক আলোচনার মুখ্য গতি নিয়ামক।"

গ.

ছড়াসাহিত্যের ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ছড়া কাজ করেছে প্রধানত শিশুরঞ্জনী হিসেবে। নির্মল সাহিত্য-রস পরিবেশনের পাশাপাশি শিশুদের নৈতিক শিক্ষাদানের প্রতি সে সময় বিশেষ সচেতনতা ছিল। অবশ্য এ সময়ের ভেতরেই বাংলা ছড়া আধুনিক রূপে-গন্ধে পূর্ণতা লাভ করে ছড়াসাহিত্যের অন্যতম দিকপাল সুকুমার রায়ের হাতে। শব্দ চয়নে, ছন্দে, ব্যঞ্জনায় এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে তিনি বাংলা ছড়ায় আনেন নতুন গতি। সুকুমার রায়ের নিরবচ্ছিন্ন অপূর্ব কৌতূহলোদ্দীপক ব্যঙ্গ-নিপুণ সরস লেখনী-ছটা ছড়াকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আঙ্গিকে সাহিত্য-মাধ্যমের মর্যাদা এনে দিলেও ছড়া তখনো বেরোতে পারেনি তার শিশু অনুষঙ্গের গণ্ডি থেকে। 'সুদ খায় মহাজন ঘুষ খায় দারোগায়'– এ ধরনের কিছু কিছু পঙ্‌ক্তিতে ভিন্নধর্মী সুর তাঁর ছড়ায় লক্ষ করা যায়। কিন্তু রচনার সংখ্যার তুলনায় এসব পঙ্‌ক্তি এতই নগণ্য যে, সেগুলো আলাদাভাবে তুলে ধরা যায় না।

আদি ছড়ার যে বিষয় এবং শিশু মন-মানসিকতার পরিতুষ্টি সাধনের যে চিন্তা-চেতনা, তার পরিবর্তন ঘটতে থাকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। আস্তে আস্তে ছড়ায় ঢুকতে থাকে সমকালীন বিষয়-আশয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা, দাঙ্গা, ক্ষোভ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে ছড়ায়। মানুষের মুখে মুখে যে ছড়া গাওয়া হত, কালের পরিক্রমায় সেটি চলে এসেছে কলমের মুখে, উঠে এসেছে পোস্টারে, ছড়িয়ে পড়েছে দেয়ালে-দেয়ালে। সেই জন্যেই ড. আশরাফ সিদ্দিকীর এক প্রবন্ধে দেখি, 'ছড়া শুধু সমাজ সংসার নিয়ে বলে না, দেশ ও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও বলে।... ছড়াও কালের সাথে অনবরত তার রূপ বদলায়।' [আবহমান বাংলা / ড. আশরাফ সিদ্দিকী, বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ]

অবশ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই ছড়াকে মেঘের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে-রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছ ভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার শাস্ত্রের বাহির, মেঘ-বিজ্ঞানও শাস্ত্র-নিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে।' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: ছেলেভুলানো ছড়া]

ছড়ার প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে ছড়াকে বহুমুখী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন ছড়াশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায়।

তেলের শিশি ভাঙলো বলে
খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যারা বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো–
তার বেলা, তার বেলা?

এ ধরনের ছড়া লিখে অন্নদাশঙ্কর রায় ছড়ার মধ্যে যোগ করেন রাজনৈতিক সুর। যে ছড়া শিশুদের ঘুমপাড়ানিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হত, সে ছড়া পরিণত হয়েছে ঘুমজাগানিয়ায়। ছড়ার ভাষাও হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক মুক্তির হাতিয়ার, প্রতিবাদের মাধ্যম। ছড়াসাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যগুলো উঠে এসেছে লোকসাহিত্যবিজ্ঞানী শামসুজ্জামান খানের এক প্রবন্ধে। তিনি

বলেছেন, 'আমরা লক্ষ করে দেখেছি আমাদের শিশুসাহিত্যের মৌল স্বভাব বা প্রবণতাগুলো বিভিন্ন দশকে এসে এক একটা পর্যায় অতিক্রম করেছে। কথাটা এভাবেও বলা যেতে পারে যে এক একটা দশকে এসে আমাদের শিশুসাহিত্য এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। মধ্য-চল্লিশ থেকে মধ্য-পঞ্চাশ পর্যন্ত রচিত শিশুসাহিত্যের দু'টি দিক লক্ষ করা যায়: এক. পুরনো ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং দুই. কিছু বিচ্ছিন্ন প্রয়াস। [ভিন্ন অবলোকন, সাহিত্যের দিগ্বলয়]

ঘ.

সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে ছড়াও বিকশিত হয়েছে। ক্রমশ সৃষ্টি হয়েছে এর শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব। এখন বিভিন্ন ভাগে আমরা বিভক্ত করি ছড়াকে। যেমন: শিশুতোষ ছড়া, উদ্ভট ছড়া, ব্যঙ্গাত্মক ছড়া, রাজনৈতিক ছড়া ইত্যাদি।

বাংলাদেশের ছড়ায় শিশুতোষ ছড়ার আধিক্য বেশি। ১৯৪৭ থেকে এ পর্যন্ত যেসব ছড়া রচিত হয়েছে, তার অধিকাংশই শিশুমনস্তত্ত্ব নির্ভর। এসব শিশুতোষ ছড়ায় রাজনীতির ছোঁয়া নেই, সমসাময়িক টানাপড়েন নেই, আছে শুধু ছোটদের আনন্দদানের প্রচেষ্টা। বেশির ভাগ ছড়াতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে হাস্যরস, কৌতুক ও উপদেশ।

বাংলাদেশের ছড়ার প্রস্তুতিপর্বে যাঁরা ছিলেন অগ্রণী এবং যাঁদের হাতে বিকশিত হয়েছে ছড়ার ডাল-পালা, তাঁরা হলেন: জসীমউদ্‌দীন, ফররুখ আহমদ, বন্দে আলী মিয়া, খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, সুফিয়া কামাল, আহসান হাবীব, কাজী আবুল কাসেম, হোসনে আরা, সুলতানা রাহমান, হাবীবুর রহমান, সরদার জয়েনউদ্দীন, সানাউল হক, মযহারুল ইসলাম, রোকনুজ্জামান খান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান জান, মনোমোহন বর্মন, হালিমা খাতুন, কাজী লতিফা হক, আতোয়ার রহমান, শামসুর রাহমান, ফয়েজ আহমদ, আব্‌দার রশীদ প্রমুখ। এঁদের বেশিরভাগই আদি ছড়ার রূপ, রস, চিত্রকল্পই আঁকড়ে ধরেছেন। কারো কারো ছড়ায় কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষভাবে প্রভাব পড়েছে খেয়াল-খুশির রাজা সুকুমার রায়ের। সকলের ছড়ায় ছন্দে অভূতপূর্ব মাধুর্য লক্ষ করা গেলেও বিষয়- বৈচিত্র্যে উৎরে যাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবু আমাদের এই পথিকৃৎ ছড়াসাহিত্যিকদের ভূমিকা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। বাংলাদেশের ছড়ার প্রস্তুতি ও বিকাশপর্বে আহসান হাবীব, রোকনুজ্জামান খান, শামসুর রাহমান, ফয়েজ আহমদ, আব্‌দার রশীদ প্রমুখ ব্যতিক্রমী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন ছড়া-গবেষকদের কাছে। তবে অন্যদের অবদানও ছিল অসামান্য।

গত শতকের মধ্য-পঞ্চাশে যাঁরা লিখতে শুরু করেছেন এবং ষাট দশকে এসে যাঁদের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাঁরা হলেন– লুৎফর রহমান সরকার, আল মাহমুদ, এখ্‌লাসউদ্দিন আহমদ, সুকুমার বড়ুয়া, দিলওয়ার, মোহাম্মদ মোস্তফা, রফিকুল হক, মাহবুব তালুকদার প্রমুখ। এ তালিকায় আরও চারটি নাম যোগ করা প্রয়োজন। নাম চারটি: কাইয়ুম চৌধুরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক ও আসাদ চৌধুরী।

এঁদের পর পরই ছড়াসাহিত্যে যাঁদের আগমন ঘটে, তাঁরা হলেন : নিয়ামত হোসেন, হোসেন মীর মোশাররফ, ফজল এ খোদা, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, গোলাম সারওয়ার,

আ.ফ.ম সিরাজউদ্‌দউলা চৌধুরী, মেজবাহ খান, খান শফিকুল মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, ফাহমিদা আমিন, সিরাজুল ফরিদ, আবু কায়সার, মাহমুদউল্লাহ, আখতার হুসেন, রশীদ সিনহা, প্রণব চৌধুরী, সালমা চৌধুরী, আলতাফ আলী হাসু, আবু সালেহ, কাজী রাশিদা আনওয়ার, মসউদ উশ শহীদ, সানাউল হক খান, আলী ইমাম, মুক্তিহরণ সরকার, খালেক বিন জয়েনউদদীন, দীপংকর চক্রবর্তী, বখতেয়ার হোসেন, সফিকুন নবী প্রমুখ।

এঁরা এক-একজন ছড়াসাহিত্যের এক-একটি স্তম্ভ। এঁদের সশব্দ উপস্থিতিতে ওলট-পালট হয়ে গেছে ছড়ার নির্দিষ্ট ধারণা, ভেঙে গেছে নির্ধারিত কাঠামো। সমকালীন বিষয়কে উপজীব্য করে ছড়া বানানোর কৌশল তাঁদের অনেকেরই রপ্ত ছিল। তাঁদের কোনো কোনো ছড়া প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ, আবার কোনো কোনো ছড়া খোলাখুলি ও নিঃশঙ্ক। এঁরা ছড়ায় এনেছেন নতুন শক্তি।

বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যের ইতিহাসে যে দশকটি জ্বলজ্বল করে আছে, সেটি ১৯৭০-এর দশক। এক ঝাঁক চটপটে, বুদ্ধিমান, তীক্ষ্ণ ছড়াকারের আবির্ভাব ঘটে এসময়। এঁদের প্রায় সবাই ছিলেন রাজনীতি-সচেতন। ছড়ার বিষয়-বৈচিত্র্যের সাথে সাথে ছড়ার আঙ্গিক ও ছন্দ নিয়েও এঁরা বেশি মাতামাতি করেন। এ দলের সদস্যদের তালিকা দীর্ঘ। এঁরা ঝড়ো হাওয়ার মতো এসে তাঁদের রাজত্ব কায়েম করে নিয়েছেন। ছড়াকে করেছেন অধিক জনপ্রিয়। এঁরা হলেন, আবু জাফর সাবু, আলমগীর বাবুল, লাল চান, দেলওয়ার বিন রশিদ, তপংকর চক্রবর্তী, বিমল গুহ, শাহাবুদ্দীন নাগরী, লুৎফর রহমান রিটন, সুখময় চক্রবর্তী, তুষার কর, আইউব সৈয়দ, অজয় দাশগুপ্ত, মাহমুদ হক, শামসুল করিম কয়েস, শাহাদাৎ বুলবুল, শামসুল হক দিশারী, রোকেয়া খাতুন রুবী, আবু হাসান শাহরিয়ার, বিপুল বড়ুয়া, সৈয়দ খালেদুল আনোয়ার, সৈয়দ আল ফারুক, ফারুক নওয়াজ, নূর মোহাম্মদ রফিক, আনওয়ারুল কবীর বুলু, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ, হাসান হাফিজ, দীপক বড়ুয়া, সনজীব বড়ুয়া, মঈনুদ্দীন মঈনু, আহসান মালেক, সুজন বড়ুয়া, শামসুদ্দীন হারুন, নিতাই সেন, নাসির আহমেদ, জামাল উদ্দীন বাবুল, শামসুল হক হায়দরী, খালিদ আহসান, ইউসুফ মুহাম্মদ, মিনার মনসুর, ওমর কায়সার, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, উত্তম সেন, তৌহিদ আহমেদ, এয়াকুব সৈয়দ, আসলাম সানী, জ্যোতির্ময় মল্লিক, নাসের মাহমুদ, কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার, ফরিদা ফরহাদ, মর্জিনা আখতার, আহমদ মতিউর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম জাহান, রফিকুর রশীদ, আহমাদ উলাহ, রুহুল আমিন বাবুল, আবদুর রহমান, মাহবুবা চৌধুরী প্রমুখ।

এঁদের অনেকেই উন্নতমানের ছড়ার নির্মাতা হিসেবে নিজেদের পরিচিত করে তুলতে সক্ষম হলেও পরবর্তী সময়ে ছড়ার রাজ্য থেকে কেউ কেউ নির্বাসিত হয়েছেন স্বেচ্ছায়। কেউ কেউ সাহিত্যের অন্য মাধ্যমে তাঁদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন। তাঁরা সবাই সক্রিয় থাকলে বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্য আরো বেশি সমৃদ্ধ হত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে কিংবা আশির দশকের শুরুতে এবং আরও পরে যাঁরা ছড়া চর্চায় এলেন তাঁদের মধ্যে আমীরুল ইসলাম, ফারুক হোসেন, রহীম শাহ, আশরাফুল

আলম পিনটু, আলম তালুকদার, মোখতার আহমদ, আশরাফুল মান্নান, সালেম সুলেরী, আহমাদ মাযহার, খালেদ হোসাইন, বাপী শাহরিয়ার, আহমদ সাকী, উৎপল কান্তি বড়ুয়া, সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী, রব্বানী চৌধুরী, শফিক ইমতিয়াজ, টিপু কিবরিয়া, মাহবুবুল হাসান, জসীম মেহবুব, আনজীর লিটন, কেশব জিপসী, সজল দাশ, সনতোষ বড়ুয়া, সজল জলি বড়ুয়া, সরকার জসীম, সেজান মাহমুদ, আরজু আহমেদ, সৈয়দ নাজাত হোসেন, মোহাম্মদ মারুফুল, সৈয়দ আমির উদ্দিন, হুমায়ুন সাদেক চৌধুরী, এমরান চৌধুরী, অনিল চক্রবর্তী, আশীষ দত্ত কেশব, তুহীন রহমান, অরুণ শীল, সিকদার নাজমুল হক, মিহির মুসাকী, নুরুল ইসলাম খান, মাহমুদ মুসা, আবদুল হামিদ মাহবুব, সিতাংশু বিকাশ কর, মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন, দেবাশিষ ভট্টাচার্য, দীপালী ভট্টাচার্য, মিয়া মনসফ, পংকজ দেব অপু, শারিক শামসুল কিবরিয়া, আকতার হোসাইন, খালেদ সরফুদ্দিন, আলেক্স আলীম, শফী সুমন, বদরুল বোরহান, শফিকুর রাহী, জগলুল হায়দার, বিপুল বিশ্বাস, সাজ্জাদ বিপব, আশীষ কুমার, রোমেন রায়হান, ওবায়দুল গণি চন্দন, সারওয়ার-উল-ইসলাম, ওয়াসিফ-এ-খোদা, মাসুদ আনোয়ার, আলী হাবিব, রাজু আলীম, আবুল হোসেন আজাদ, মাসুদার রহমান, এম আর মঞ্জু, মাহফুজুর রহমান আখন্দ, রহমান হাবীব, আবুল কালাম বেলাল, কাজী কেয়া, ইকবাল বাবুল, আহমেদ মাওলা, আনোয়ারুল হক নূরী, স্বপন ধর, আহমেদ কায়সার, খলিফা আশরাফ, বকুল হায়দার, কামরুল হাসান বাদল, শিমুল মাহমুদ, জাকির আবু জাফর, রমজান আলী মামুন, শওকত হোসেন, ফারুক হাসান, জিন্নাহ চৌধুরী, সঞ্জিত বনিক, গোলাম নবী পান্না, ইলতুৎ আলীদ, তপন বাগচী, অনিরুদ্ধ আলম, রবীন আহসান, ধ্রুব এষ, মিহির কান্তি রাউত, অমিত বড়ুয়া, অপু বড়ুয়া, আবু হেনা দীপক, মিজানুর রহমান শামীম, সুমন বড়ুয়া, যাযাবর মিন্টু, শহীদুল্লাহ শাহরিয়ার, ইসমাইল জসীম, শিবুকান্তি দাশ, আরিফ বিলাহ মিঠু, দর্পণ বড়ুয়া, নাসিরুদ্দিন তুসী, গোফরান উদ্দীন টিটু, সরওয়ার কামাল পাশা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সংখ্যার দিক থেকে যেমন শক্তিশালী, লেখার মানগত দিক থেকেও ততটা ক্ষমতাবান। তাঁরা তৈরি করতে পেরেছেন নিজস্ব ভঙ্গি, আয়ত্ত করতে পেরেছেন ছড়ার রণকৌশল। তাঁদের অনেকে রাজনীতিকে ছড়ার বিষয় হিসেবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার এনেছেন এবং রাজনীতি ও সাহিত্যের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁদের উদ্যোগেই বাংলাদেশে ১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রথম জাতীয় ছড়া উৎসব। ছড়ার বই বের করে, সংকলন সম্পাদনা করে এবং নিয়মিত ছড়ার আসর-আড্ডা বসিয়ে ছড়াসাহিত্যের ক্রম অগ্রসরমান ধারাকে সুসংসহত করতে তাঁদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী।

গত শতকের আশির দশকের শেষে এবং ১৯৯০-এর দশকে ছড়া চর্চায় যোগ দেন এক ঝাঁক সহযাত্রী। তাঁদের মধ্যে আছেন নাসরিন সুলতানা খানম, রমজান মাহমুদ, বেণীমাধব সরকার, মোরশেদ কমল, আহসানুল হক, মোশতাক রায়হান, বিকিরণ বড়ুয়া, আবদুলাহ আল মাসুম, শুকলাল দাশ, সুপলাল বড়ুয়া, আতিক রহমান, আতিক হেলাল, শাহজাহান আবদালী, মানসুর মুজাম্মিল, রহমান তাওহীদ, সুসেন কান্তি দাশ, মেহবুব আলম, আলম মাহবুব, আকতার আহমেদ, ওবায়দুল সমীর, জুলফিকার শাহাদাৎ, আহসানুল কবির রিটন প্রমুখ। সময়ের ধারাবাহিকতায় ক্রমান্বয়ে আরো কিছু মুখ সংযোজিত হয়েছে। এঁরা হলেন :

অশোকেশ রায়, চঞ্চলা চঞ্চু, লোকমান আহম্মদ আপন, পাশা মোস্তফা কামাল, নজরুল ইসলাম শান্ত, নাজমুল হাসান, অনিন্দ্য বড়ুয়া, কামাল হোসাইন, মিতুল সাইফ, তৌহিদুল ইসলাম কনক, টিমুনী খান, চন্দন কৃষ্ণ পাল, আহমেদ সাব্বির, মাসুদ কামাল, এফ. শাহজাহান, মো. নবী হোসেন, আবদুল মতিন রিপন, সনজিত দে, শওকত আলী সুজন, কল্যাণ বড়ুয়া মুক্তা, গিয়াস উদ্দিন রূপম, আলম নজরুল, প্রতীক ওমর, এহসান হায়দার, ইমরান পরশ, ঈষিকা গুহ, মোমিন মেহেদী, মেহের আমজাদ, সব্যসাচী পাহাড়ী, সাঈদুল্লাহ আল সাহেদ, সৈয়দা সেলিমা আক্তার, মঈন মুরসালিন, অদ্বৈত মারুত, হাশিম মিলন, মইনুল হক চৌধুরী, কাজী বর্ণাঢ্য, টিএম পলাশ, ফারুক রহমান, আরিফ বখতিয়ার, মালেক মাহমুদ, সরদার আবুল হাসান, রেহমান সিদ্দিক, রইস মনরম, কাদের বাবু, ব্রত রায়, ফারজানা রহমান শিমু, আদিত্য রুপু, আনোয়ার মুস্তাফা, শাকিল ফারুক, খন্দকার সোহেল, তপু রায়হান, নীহার মোশাররফ, আনোয়ার কামাল, আখতারুল ইসলাম, জুবাইর জসীম, লিটন কুমার চৌধুরী, মিলন বনিক, নান্টু কুমার দাশ, সাইফুদ্দীন সাকিব, আহমেদ পলাশ, আল জাবেরী প্রমুখ।

তাঁরা পূর্বসূরিদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করছেন। এগোচ্ছেন যথেষ্ট শক্তি নিয়ে। আঙ্গিক-উপস্থাপনায় কেউ কেউ পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করছেন।

৬.

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের ছড়াসাহিত্যিকদের ইতিহাস-সচেতন করে তুলেছে। সেই সাথে তাঁদের রচনায় যুক্ত হয়েছে সমকালীন রাজনীতি প্রসঙ্গ। ছড়া এগিয়ে গেছে চিরকালীন রূপ নিয়ে। রাজনীতির ভেতর দিয়ে কখনো কখনো অগ্রসর হলেও তার ভেতরে প্রতিক্রিয়াশীলতা স্থান পায়নি একেবারেই। ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদের ভাষায়, 'বাংলার মাটি ও মানুষ এবং বাঙালি জীবনের সঙ্গে যাদের যোগ ছিল, পূর্ব বাংলার সফল ছড়াকার তারাই। তাই পূর্ববাংলার সাহিত্যের অন্যান্য ধারায় প্রতিক্রিয়াশীলতা থাকলেও ছড়ায় নেই। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ছড়াকাররা এই অনন্য গৌরব নিয়েই তাদের যাত্রা শুরু করতে পেরেছিল।' [সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ : বাংলাদেশের ছড়া, সুন্দরম, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০৪]

অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশের ছড়া এখন বর্তমান আসনে সমাসীন। বক্তব্যের সহজ উচ্চারণ, বৈচিত্র্যময় রূপায়ণ, সংস্কারমুক্ত ভাবনা– সর্বোপরি রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনা সংঘটনের প্রতি লেখকের অকুণ্ঠ মনোযোগ, –এইসব কিছুই ছড়াকে করেছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। নির্মাণকৌশল, বিষয়, আঙ্গিক, ছন্দ, অন্ত্যমিল ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে ছড়া অনেক দূর এগিয়েছে। এ অঙ্গনে প্রতিনিয়ত যেমন আসছে নতুন নতুন গ্রন্থ, নতুন নতুন সংকলন, তেমনি প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন নাম। এরা আমাদের ছড়াসাহিত্যের যুগ যুগ ধরে প্রবহমান ধারাটি এগিয়ে নিয়ে যাবেন সামনের পথে এবং ঊর্ধ্বে তুলে ধরবেন অগ্রগতির নিশান– এ প্রত্যাশা সবার। বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যে 'যে নতুন পলি

মাটি জমেছে, তা একটি সম্ভাবনাময় বিশাল ভূখণ্ডের ইঙ্গিত দেয়'। [আবু হাসান শাহরিয়ার : বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের অগ্রযাত্রা, শৈলী, ১ অক্টোবর ১৯৯৭]

চ.

"ছড়া হওয়া চাই স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। তার প্রধান শত্রু হচ্ছে কৃত্রিমতা ও চাতুরি। চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না– বলেছেন বিবেকানন্দ। চালাকির দ্বারা খাঁটি ছড়াও হয় না। খাঁটি ছড়া কলমের মুখে ফুটলেও তার ধরনটি হবে অশিক্ষিত মানুষের মুখে ফোটা ছড়ার মতো।" [অন্নদাশংকর রায়]।

ছড়া কার্টুনের মতো। অল্পকথায় অনেক কিছু বলে ফেলা। তার বলার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা থাকবে না, কোনো চাতুরি থাকবে না। ভাবখানা এমন– 'যেন কিছুই বুঝি না, মুখে আসল, বলে ফেললাম।'

'হুজুরের কাছে মজুরের কোনো দাম নেই
ভালো ও মন্দ সকলই সমান নাম নেই
এইসব নিয়ে ছড়া হতে পারে
লাখো পাঠকের পড়া হতে পারে
কিন্তু হুজুর নাখোশ হবেন তাই ছড়া লিখে কাম নেই
আমার হুজুর চামারের মতো বলবো না কারো সামনেই।'

এই ছড়াটিতে লেখক বলছেন– হুজুরকে নিয়ে ছড়া হতে পারে, কিন্তু হুজুর নাখোশ হবেন, তাই ছড়া লিখব না, তিনি যে চামারের মতো আমি কারো কাছে বলব না। অথচ বাস্তবতা এই, ছড়াও লেখা হয়ে গেছে, চামারও বলা হয়ে গেছে। ছড়ার এই যে সৌন্দর্য– এটা বর্ণনা করে প্রকাশ করা যাবে না।

সাধারণত ছড়া হয় ছোট এবং আঁটোসাঁটো। ছন্দ-মিলে-বিন্যাসে সহজ উজ্জ্বল। লঘু অথচ তরল নয়। চটুল, কিন্তু উগ্র নয়। কৌতুকের বক্রতায় ও বক্তব্যের সাবলীলতায় ছড়া হয় সুসম্পূর্ণ। সৌজন্যসম্মত ও শিল্পসম্মত। এগুলো রচনার পেছনে যতটুকু আবেগ কাজ করে না, তার চেয়ে বেশি করে কৌতুক। ছড়া পাঠকের চোখ-কান-কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করে এবং কল্পনার উৎসুকতাকে দেয় পূর্ণ বিকশিত বুদ্ধির আনন্দ।

"অমুক দেশের অমুক
পরের মাথায় কাঁঠাল রেখে
কোয়া খাবেন একে একে
মুচকি হেসে বলেন আবার
তোমার বোঝা কমুক
ভাগ্য দোষে আমার পেটে
জমছে বোঝা জমুক।"

এখানে শোষণের চিত্র ফুটে উঠেছে, সাথে সাথে একটা কৌতুক উপভোগ করার সুযোগ ঘটেছে পাঠকের।

" আবদুল হাই/ করে খাই খাই/ এক্ষুণি খেয়ে বলে/ কিছু খাই নাই ।"

এই ছড়াটিতে রয়েছে ভালো লাগার উপকরণ। কৌতুককর পরিবেশনা পাঠকের মনে আনন্দ-অনুভূতি সঞ্চার করে।

ছড়ায় জাদু আছে। এই জাদু তার শরীরে। তার সুর বা তালে মাতাল হওয়া যায়। নাচা যায় তার ছন্দে। একটা পঙ্‌ক্তির সাথে আরেকটি পঙ্‌ক্তির অন্ত্যমিলে পাওয়া যায় নিরেট আনন্দ। হুমায়ুন আজাদ ছোটদের জন্য একটা লেখায় বলেছেন: "ছড়া সবাইকে মোহিত করে। তোমরা হেমিলনের বাঁশিঅলার কথা শুনেছ। আজ সে-মায়াবী বাঁশিঅলা আর নেই। তাই তোমরা যাবে কার সাথে? যদি জিজ্ঞেস কর, তবে বলব, নিরুয়ই যাবে ছড়ার সাথে। তার বাঁশি আছে, তার জাদু আছে। তার সুর আছে, তার নূপুর আছে।"

ছন্দ যেমন ছড়াকে গতিময় করে, তেমনি অন্ত্যমিল সৃষ্টি করে ধ্বনি-মাধুর্য। যুতসই অন্ত্যমিল অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল লেখাকেও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পারে। অনেক ছড়া আছে, যার এক পঙ্‌ক্তির অর্থ বোঝা যায় তো, অন্য পঙ্‌ক্তির অর্থ বোঝা যায় না। কখনো কখনো মনে হতে পারে আবোল-তাবোল কথা। এই আবোল-তাবোল কথাও মধুর হয়ে উঠতে পারে সুরের কারণে, অন্ত্যমিল মধ্যমিল ও অনুপ্রাসের কারণে। যেমন :

"রাসবিহারী দাশের নাতি
হাসপাতালে বাস করে
মাস পুরোলেই দেশে গিয়ে
খাস জমিতে চাষ করে
পাশ করেনি পরীক্ষাতে
পয়সা কড়ি নাশ করে
হাতের কাছে কাউকে পেলে
চড় মেরে দেয় ঠাস করে।"

এই ছড়াটিতে দেখা যায়, কতগুলো খাপছাড়া কথা জোড়া লাগানো হয়েছে। কোনোটার সাথে কোনোটার সাযুজ্য নেই। পরীক্ষায় পাস না করার সাথে কাউকে ঠাস করে চড় মারার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তবু এ ছড়া পাঠককে আনন্দ দানে সক্ষম। এতে এমন উপকরণ আছে, তা মোহিত করে সবাইকে। এখানে আরও একটি ছড়ার উদাহরণ টানতে চাই:

যদু চান কলা খায়
মধু কান মলা খায়
হাতিয়ার খুশি রায়
লাথি আর ঘুষি খায়।
বেচারাম ঘেঁটে খায়
পেঁচারাম খেটে খায়।
আবু ঘাটে হাওয়া খায়
বাবু হাটে ধাওয়া খায়
জব্বার আলী খাঁয়

সব্বার গালি খায়।

এখানে দেখা যায়– এই ছড়ার পরিণতিতে কোনো চমক নেই। কৌতুককর সমাধান নেই। তবু এটি অভিনব ছড়া। একটা পঙ্‌ক্তির সাথে আরেকটা পঙ্‌ক্তির অন্ত্যমিলে আমরা অভিনবত্ব দেখলেও, সাধারণত একটা পঙ্‌ক্তির প্রত্যেক শব্দের সঙ্গে পরের পঙ্‌ক্তির প্রত্যেক শব্দের মিল খুঁজে পাই না। এই আলাদা বিশেষত্বের জন্য ছড়াটি পেয়েছে বিশেষ মর্যাদা।

তবে আজকাল ছড়া অনেক বদলে গেছে। অন্ত্যমিল-প্রধান অর্থহীন ছড়া খুব একটা লেখা হয় না এখন। হুমায়ুন আজাদ বলেন, "ছড়া রচনা করেন সে-কবিরা, তাঁরা আজ আর অর্থহীন কথার সুর ছড়াতে চান না। তাঁরা স্বপ্নের ফুল ফোটানোর সাথে সাথে বাস্তবের আগুনও জ্বালাতে চান"। তাই ছড়ালেখকরা গতি-সৌন্দর্যের সাথে আনেন অর্থসৌকর্যও।

'অর্থহীন কথা দিয়ে ছন্দ সাজালে কবিতা হয় না'– বলেছেন বুদ্ধদেব বসু। ছড়াও হয় না। এখন ছড়ার জন্য চাই নির্ভুল ছন্দ, যুতসই অন্ত্যমিল ও বক্তব্যের বলিষ্ঠতা। তাতে ছড়ালেখকের ভাষার লাবণ্য থাকবে, থাকবে কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি। মানুষের সৌন্দর্যবোধ ও মানুষের আনন্দ চেতনার চিরন্তনী ভাবকে জাগিয়ে তোলাই সাহিত্যের কাজ। আমরা এমন ছড়াই চাই, যাতে রূপ থাকে, শক্তি থাকে, গতি ও সৌন্দর্য থাকে। এ ধরনের উৎকৃষ্ট ছড়া প্রচুর রচনা করেছেন আমাদের লেখকেরা। কিন্তু আমরা আরও চাই।

ছ.

বাংলাদেশের ছড়ার আরেকটি সম্ভাবনার দিক হচ্ছে তার ঝলমলে প্রকাশনা। আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও মুদ্রণ-সৌকর্যের মেলবন্ধনে মনকাড়া বইয়ের বিচিত্র সমাবেশ দেখছি আমাদের দেশে। আধুনিক প্রযুক্তির প্রচুর ব্যবহার ঘটছে এসব প্রকাশনায়। দিন দিন বেড়ে চলেছে ছড়ার বইয়ের প্রকাশনা। ১৯৯৮ সালে প্রথম 'ছড়াসমস্ত' প্রকাশ করে ছড়াসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন লুৎফর রহমান রিটন। সেই ধারাবাহিকতায় 'ছড়াসমগ্র', 'বাছাই ছড়া', 'ছড়ারচনাবলী', 'নির্বাচিত ছড়া' 'কিশোরকবিতা সমগ্র', 'কিশোরসমগ্র', 'নির্বাচিত কিশোরকবিতা', 'শিশু-কিশোর কবিতা সমগ্র', 'শতরকমের ছড়া' প্রভৃতি নামে গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রকাশনার ইতিহাসে নতুনভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন শামসুর রাহমান, ফয়েজ আহমদ, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণ, সুকুমার বড়ুয়া, এখ্‌লাসউদ্দিন আহমদ, মাহমুদ উল্লাহ, আল মুজাহিদী, আবু সালেহ, আলী ইমাম, ফারুক নওয়াজ, আমীরুল ইসলাম, ফারুক হোসেন, সুজন বড়ুয়া, রহীম শাহ, দীপংকর চক্রবর্তী, তপংকর চক্রবর্তী, আলম তালুকদার, এনায়েত রসুল, আনজীর লিটন, হাসান হাফিজ, আশরাফুল মান্নান, শাফিকুর রাহী, অরুণ শীল, উৎপলকান্তি বড়ুয়া, মানজুর মুহাম্মদ, মিজানুর রহমান শামীম, মালেক মাহমুদ প্রমুখ। অবিরল পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আধুনিকতর ভাবনার মাধ্যমে ছড়ায় যাঁরা ইতোমধ্যে সপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁরা সকলেই উপর্যুক্ত লেখকদের সাথে সহসাই যুক্ত হবেন– সেই প্রত্যাশা আমাদের।

জ.

ছড়ার সৌন্দর্য তার বক্তব্যে, তার গঠনে। তার ভেতরে বিষয়গত সৌন্দর্য যেমন থাকে, তেমনি থাকে রূপগত সৌন্দর্য। আমাদের চারপাশে অজস্র ছড়া রচিত হয়। কিন্তু 'খাঁটি ছড়া খুব সহজলভ্য নয়। মুক্তা যিনি অন্বেষণ করেন, জলের গভীর তলদেশ থেকে জোগাড়-করা প্রত্যেকটি ঝিনুকেই তিনি মুক্তা প্রত্যাশা করেন, পান গুটিকতেক। খাঁটি জিনিস বরাবরই দুর্লভ। প্রতিটি ছড়াপ্রতিম রচনার মধ্যেই আমরা কাঙ্ক্ষিত প্রসাদ-গুণ প্রত্যাশা করতে পারি, তবে সর্বদা সে প্রত্যাশা পূরণ হবার নয়। কিন্তু যখন হয় তখন অসাধারণ আনন্দ সৃষ্টি হয় হৃদয়ে। আবিষ্কারের আনন্দ, এ আনন্দের তুলনা হয় না।' [খালেদ হোসাইন: বাংলাদেশ সাম্প্রতিক ছড়া: পর্যালোচনা, শৈলী, ১ অক্টোবর ১৯৯৭]

প্রচুর ছড়ার মধ্য থেকে আমরা যে সব ছড়া খুবই আগ্রহের সাথে উল্লেখ করি, সেগুলো এক অর্থে অভিনব– অনন্য। আধুনিক বাংলা ছড়ার দুই প্রবাদপুরুষ সুকুমার রায় ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের যে দুই স্বতন্ত্র ধারা আমাদের সাহিত্যে সবেগে প্রবহমান, তার সাথে আমাদের অধিকাংশ লেখকই যুক্ত। তবে কোনো কোনো লেখক তাঁদের রচনায় দুই রায়ের রচনারীতির সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন, বাংলাদেশের বিচিত্রগামী ছড়াকে আরো স্বপ্নময় করে তোলা। লোকছড়ার বিস্তীর্ণ ভূমিকে ধারণ করে আমাদের অল্প কিছুসংখ্যক লেখক তাঁদের ছড়ার ভিটেবাড়ি তৈরি করেছেন। তাঁদের পরিধি আরো বিস্তৃত করতে হবে। বাংলাদেশের ছড়ার যে অমিত সম্ভাবনা রয়েছে, তা পূর্ণতা পাবে লোকজ অনুষঙ্গে নব ভাবধারায়। লোকছড়ার আলোয় যদি আমাদের আধুনিক ছড়া আরো বেশি পরিমাণে উদ্ভাসিত হয়, তাহলে আমরা পাব নতুন ঠিকানা।

লৌকিক ছড়ার সাথে আধুনিক ছড়ার মেলবন্ধন ঘটাতে পারলেই আমাদের ছড়া পাবে ভিন্ন ধরনের গতিপথ। লৌকিক ছড়ায় চাকচিক্য নেই, কৃত্রিমতা নেই। বৈদগ্ধ্যহীন। কোনো শিল্পসচেতন বা সমাজসচেতন ব্যক্তি-প্রতিভার সৃষ্টি নয় এগুলো। কিন্তু 'আধুনিক ছড়া' সচেতন মানুষের সৃষ্টিকর্ম।

'লৌকিক ছড়ায় যে লৌকিক শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ ও রূপকথার আবেশ আছে', তা আমাদের আধুনিক ছড়ায় ছড়াতে পারলে সেটি যে নবরূপ লাভ করবে-তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' –লৌকিক ছড়ার হার্দিক স্বতঃস্ফূর্ত রসধারা' সুর তাল ছন্দযুক্ত হয়ে নতুনভাবে সমৃদ্ধি লাভ করবে। অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র রচনায় আগ্রহী লেখকদের পরিচর্যায় এই ধারা এগিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। এ প্রসঙ্গে এখ্‌লাসউদ্দিন আহমদের একটা বক্তব্য স্মরণ করতে চাই। তিনি লিখেছেন:

'পুরাতন ছড়া যেন একটা ভাঙা আয়নার জোড়া দেওয়া একরাশ টুকরো। একটাকে আরেকটার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উপায় নেই। কতকগুলি টুকরো বেমালুম হারিয়ে গেছে। কতকগুলি ভুল জায়গায় বসানো হয়েছে। সেইজন্য সেই আয়না দিয়ে আমরা অতীতের মুখ দেখতে পাচ্ছিনে। পাচ্ছি একরাশ ইমেজ।'

আসলে টুকরো টুকরো ছবির মধ্য দিয়ে অতীতের রূপটি আমাদের দেখতে হবে। বাংলা ছড়ার সুবিশাল ভাণ্ডারের প্রতিটি ছড়াকে আমরা ধরতে পারব না, কিন্তু চেষ্টা করলেই পারব প্রতিনিধিস্থানীয় ছড়াকে ধরতে।

বিশ্বের যে কোনো সমাজের মৌখিক লোকসংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাদের মধ্যে মানসিক অভিপ্রায়, আশা-আকাঙ্ক্ষা-সংগ্রাম ব্যর্থতা-প্রেম ও জীবিকা অনুসন্ধানে আরুর্য মিল রয়েছে। ভাষা, সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান নানা রকমের হলেও তারা চিন্তা-চেতনায় প্রায় একই ঘরানার মানুষ। তাই দিব্যজ্যোতি মজুমদার বলেছেন, 'লোকসংস্কৃতির যে বিষয়টি সকলকে বিস্মিত করে তা হল এর অভিপ্রায়ের আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বজনীনতা'। আবার অন্যত্র বলেছেন, 'লোকসংস্কৃতি একই সময়ে আঞ্চলিক ও বিশ্বজনীন'। আসলে লোকসংস্কৃতিতে যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তার খোলস ছাড়িয়ে ফেললে আমরা দেখতে পাব আন্তর্জাতিক অভিপ্রায়ের রূপ। তাই আধুনিক ছড়ায় আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বজনীনতার রঙ লাগাতে লোকজ ছড়ার ভাষারীতিকে অবলম্বন করা জরুরি।

অতএব বিষয় হিসেবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আসতে পারে ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে শুরু করে আন্দোলন-সংগ্রাম পর্যন্ত। মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি আসতে পারে শোষণহীন বাংলাদেশ গড়বার স্বপ্ন, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী মহলের স্বরূপ উদঘাটনের সক্রিয় অনভূতি, স্বৈরাচার-বিরোধিতা, অসম্প্রদায়িকতা, সমকালীন প্রসঙ্গ ইত্যাদি। এসব বিষয় আগেও কম আসেনি। তবে আমাদের লক্ষ্য লোকজ ঢঙে, হালকা চালে। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'ছড়াসমগ্র' গ্রন্থে ভূমিকায় লিখেছেন: 'জোর করে নয়। ছড়া যদি কৃত্রিম হয়, তবে তা ছড়াই নয়, তা হালকা চালের পদ্য। তাতে বাহাদুরি থাকতে পারে, কারিগরি থাকতে পারে, কিন্তু তা আবহমানকাল প্রচলিত খাঁটি দেশজ ছড়ার সঙ্গে মিশ খায় না। মিশ খাওয়ানোটাই আমার লক্ষ্য। যদি লক্ষ্যভেদ করতে পারি, তবেই আমার ছড়া মিশ খাবে, নয়তো নয়।'

প্রচলিত খাঁটি দেশজ ছড়ার সঙ্গে যাঁরা যত বেশি মিশ খাবেন, তাঁরা ততই সফল। ছড়ার চিরকালীন সুর ও ধ্বনিমাধুর্য যাঁরা আত্মস্থ করবেন অনায়াসে, রপ্ত করবেন কথ্য ভাষারীতি; তাঁরাই হবেন আমাদের আবহমান বাংলা ছড়ার সফল উত্তরাধিকার। তাঁদের হাতেই পূর্ণতা পাবে আমাদের ছড়াসাহিত্য। উন্মোচিত হবে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত।

[লেখক: শিশু সাহিত্যিক। সহযোগী সম্পাদক, দৈনিক আজাদী।]

বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্য: আনুপূর্বিক প্রেক্ষণ

ত প ন বা গ চী

মন্ত্র, ধাঁধা, হেঁয়ালি, শ্লোক ।লোকসাহিত্যে পাওয়া এসকল অমূল্য উপাদান তো ছড়ার ঢঙেই আমরা পেয়ে থাকি । এগুলোকে অর্থ ও বিষয়গত কারণে বিভিন্ন নামে ডাকা হলেও প্রকরণগত বিচারে একে ছড়া বলতে কোনও আপত্তি থাকার কথা নয় । এমনকি বাংলাসাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ, কারও বিচারে তা কবিতা, আবার কারো বিচারে তা কেবলই গান । এখন তাকে কেউ যদি ছড়া হিসেবে বিবেচনা করেন, যুক্তিতর্কে তাঁকে তো হারানো যাবে বলে মনে হয় না ।

ছড়াকে সাহিত্যের অন্যতম শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী । কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতার সংকলনে সুকুমার রায়ের ছড়াকে স্থান দিয়ে গোটা ছড়াসাহিত্যকেই কবিতার মর্যাদায় অভিষি করেছেন । কবি বুদ্ধদেব বসু তো ছড়াকার সুকুমার রায়কে 'সাবালকপাঠ্য লেখক' শিরোপা দিয়েই গেছেন । তাঁর ভাষায়, 'সুকুমার রায়কে আমি বরাবর শ্রদ্ধা করেছি শুধু হাস্যরসিক ব'লে নয়, শুধু শিশুসাহিত্যের প্রধান ব'লে নয়, বিশেষভাবে সাবালকপাঠ্য লেখক ব'লেও ।' কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু সেকালের লুইস ক্যারলের এবং এডওয়ার্ড লিয়রের মতো দুই বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ লেখকের চেয়েও 'মহত্তর' লেখক বলে সম্মান জানিয়েছেন 'ছড়াকার' সুকুমার রায়কে এবং কেবল 'সেটি তাঁর কবিত্বগুণে' ।[i]

বিদ্‌ঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা ।
গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা,
জটবাঁধা ঝুলকালো বটগাছ তলে,
ধকধক জোনাকির চকমকি জ্বলে ।...
পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা,
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা ।

সুকুমার রায়ের এই বিখ্যাত রচনাকে কেবল 'আবোল তাবোল' ছড়া বা পদ্য বলে চালিয়ে দেয়ার সুযোগ নেই । এই কবিতার শেষ দুই চরণে যে চিত্রকল্প অঙ্কিত হয়েছে অতি আধুনিক কবিতাতেও তাঁর তুলনা মেলা ভার । তাই বুদ্ধদেব বসু বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছেন, 'তাঁকে কবি ব'লে না-মানতে হ'লে 'কবি' কথাটায় অন্যায়ভাবে সীমানা টানতে হয় ।'[ii] কতবড় কথা! সুকুমার রায়কে কবি বলা না হলে 'কবি'র সংজ্ঞার্থই বদলে যাবে! বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রভাবসঞ্চারী সমালোচকের মন্তব্য না-মানলে তো সমালোচনার সংজ্ঞার্থ বদলে যেতে পারে ।

আমরা দেখেছি যে, কাব্যতত্ত্ব বিচার করেই অনেক ছড়াকারকে কবির শিরোপা দেয়া যায়। এভাবেই 'ছিপ খান তিন দাঁড়ে'র কবি ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও বাংলাসাহিত্যের দূরের পাল্লায় কবি হিসেবে বেঁচে থাকেন।

সাম্প্রতিক কালের সমালোচকরা ছড়াকে যেন সাহিত্যের মূলধারার বিষয় মনে করেন না। কেবলই শিশুসাহিত্যের এলাকা বলে তাচ্ছিল্য করার মানুষেরও দেখা পাওয়া যায়। অথচ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে অনেক কবিই শিশুসাহিত্যের দরবারে হাজির হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পূর্ণেন্দু পত্রী, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুনির্মল বসুর নাম তো আমরা সকলেই জানি। আমরা এ-ও জানি যে বাংলা শিশুসাহিত্যের সম্মানজনক অগ্রযাত্রার সূচনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫), যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯০৭), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) এবং সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) সুখলতা রাও প্রমুখের হাতে। সাহিত্যের যেমন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণকাহিনি, বিজ্ঞান রয়েছে, শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রের এরকম বিভাজন করা যায়। কেবল কবিতার ক্ষেত্রে এর নাম 'ছড়া'। ইদানিং 'কিশোর কবিতা' নামে উপবিভাগের প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে।

বাংলা ছড়ার ক্ষেত্রে অন্নদাশঙ্কর রায়ের অবদান তুঙ্গস্পর্শী। বঙ্গভঙ্গ নিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ছড়া এখনও বাংলাভাষী মানুষের মুখেমুখে উচ্চারিত হয়।

তেলের শিশি ভাঙলো বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যারা বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো।
তার বেলা? তার বেলা?

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তিনি বিদেশি হয়েও কালোত্তীর্ণ এক ছড়ার জন্ম দিয়েছেন তিনি। বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে তিনিই বাংলাদেশ সম্পর্কে বেশি রচনা সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশের দেয়ালে দেয়ালে উৎকীর্ণ হয় তাঁর অমর পঙ্‌ক্তিমালা।

যতদিন রবে গঙ্গা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

আমাদের দেশে যাঁরা শিশুসাহিত্যে অগ্রণী অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে ইব্রাহিম খাঁ, শেখ ফজলুল করীম, খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, আ.ন.ম.বজলুর রশীদ, জসীমউদ্‌দীন, হাবীবুর রহমান, বন্দে আলী মিয়া, মোহাম্মদ মোদাব্বের, কাজী কাদের নওয়াজ, মোহাম্মদ নাসির আলী, কাজী আবুল কাশেম, হোসেনে আরা, আহসান হাবীব, হালিমা খাতুন, আবদার রশীদ, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই, আবদুল্লাহ আল-মুতী, আতোয়ার রহমান, ফয়েজ আহমদ,

গোলাম রহমান, এখলাস উদ্দিন আহমদ, রফিকুল হক দাদুভাই প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

আমাদের শিশুসাহিত্যের মধ্যে ছড়াসাহিত্যের ধারাকে পুষ্ট করতে কেবল শিশুসাহিত্যিক নন, কবিরাও অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশের যে-সকল কবি ছড়াসাহিত্যে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, সুফিয়া কামাল অগ্রগণ্য। আহসান হাবীব বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার সার্থক স্রষ্টা। কিন্তু ছোটদের জন্য তিনি গদ্য-পদ্য সমানে লিখেছেন। তাঁর একটি অসাধারণ ছড়ার উদাহরণ দেখা যায়।

লালদীঘিটা ডাইনে রেখে
লাল অফিসের দরজা থেকে
যাচ্ছে হেঁকে ফেরিওয়ালা
ডিংগ ডিংগা ডিংগ ডেংগচি
ভেংগচি খাবে ভেংগচি।

ফেরিওয়ালার ঝোলায় হরেক রকমের খেলনা ও খাবার থাকে বলেই আমরা জানতাম। কবি সেখানে বিক্রয়যোগ্য 'ভেংগচি'র সন্ধান পেয়েছেন। সুফিয়া কামাল কবি শেষজীবনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রাজপথের সারথি হয়ে উঠেছিলেন। এতে কবিতারাজ্যে তাঁর ভূমিকা কমে এলেও জাতীয় জীবনে তাঁর অবদানকে শ্রদ্ধাভারে স্মরণ করতে হবে। এবং প্রথমজীবনে যে ছড়া-কবিতা তিনি লিখে গেছেন, বাংলাসাহিত্যে তাঁর উজ্জ্বলতা সহজে কমে যাওয়ার সুযোগ নেই। লোকছড়ার ছন্দে তাঁর একটি ঘুমপাড়ানি ছড়ায় আমরা দেখি যে নওয়াববাড়ির হাট থেকে খোকার জন্য ঘুম কিনে আনতে হচ্ছে। এই 'ঘুম কেনা'র যে ব্যঞ্জনা তার কারণে সাধারণ একটি ছড়াও হয়ে ওঠে কবিতার সমতুল। কবি সুফিয়া কামাল লিখেছেন–

গোল করো না গোল করে না
ছোটন ঘুমায় খাটে,
এই ঘুমটা কিন্‌তে হলো
নওয়াব বাড়ীর হাটে॥
সোনা নয়, রুপা নয়
দিলাম মোতির মালা
তাই তো খোকন ঘুমিয়ে আছে
ঘর করে উজালা॥

লোকছড়া বা ঘুমপাড়ানির ছড়ার কাল পেরিয়ে বাংলাদেশের ছড়া আধুনিক হয়ে ওঠে দেশবিভাগের পর থেকেই। পঞ্চাশের দশকের কবি আশরাফ সিদ্দিকী, সিকান্দার আবু জাফর, শামসুর রাহমান, সরদার জয়েন উদ্দিন, মযহারুল ইসলাম, আবুবকর সিদ্দিক, আলাউদ্দিন আল আজাদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আল মাহমুদ, দিলওয়ার, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান প্রমুখ। ছড়ার এই বিকাশপর্বে রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই সম্পাদিত 'কচি ও কাঁচা'

(প্রপ্র.১৯৬৪) এবং এখলাসউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত 'টাপুর টুপুর' (প্রপ্র. ১৯৬৬)-র ভূমিকা অবিস্মরণীয়। অবশ্য এর আগেই 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার 'কচিকাঁচার আসর' পৃষ্ঠাও দারুণ সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল 'দৈনিক সংবাদে'র 'খেলাঘর আসর'। দুটি শিশুকিশোর সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে 'ইত্তেফাক' এবং সংবাদ। পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও যোগ্য নেতৃত্বে পৃষ্ঠাদুটি হয়ে উঠেছিল শিশুসাহিত্যচর্চারও যোগ্য লালনভূমি। 'দৈনিক আজাদে'র মুকুলের মাহফিলও শিশুসাহিত্য বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

সম্পাদক ও সংগঠক হিসেবে রোকনুজ্জামান খান দাদাভাইয়ের অবদান অতুলনীয়। এরই ফাঁকে তিনি যেক'টি ছড়া লিখেছেন, তা আরও দীর্ঘকাল আমাদের মনে আনন্দ দেবে। তাঁর 'গাধার কান' নামের ছড়াটি স্কুলপাঠের গণ্ডি পেরিয়ে এখনও আমাদের মনে দোলা দিয়ে যায়।

একটা দড়ির দুদিক থেকে টানছে দু'দল ছেলে
তাই না দেখে বনের গাধা দাঁড়ায় হেলেদুলে।

তাঁর রচিত শিশুতোষ 'বাকবাকুম পায়রা' ছড়াটিও বাংলাভাষায় চিরকালের ছড়ার আবেদন নিয়ে বেঁচে আছে। একেবারেই লোকছড়ার ছন্দ ও আঙ্গিকে রচিত ছড়াটিতে শিশুর মনের উপযোগী ভাষা রয়েছে। এটি এখন পাঠ করা যোতে পারে।।

বাক্ বাকুম পায়রা
মাথায় দিয়ে টায়রা
বউ সাজবে কাল কি
চড়বে সোনার পালকি।

আমাদের ছড়াসাহিত্যে ফয়েজ আহমদের অবদান বিশাল। সাংবাদিকতা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তির ব্যস্ততা নিয়েও ছড়ার কলম বন্ধ করেননি। প্রতিবাদী ছড়ার পাশাপাশি শিশুতোষ ছড়া তিনি লিখেছেন অপূর্ব দক্ষতায়। কামরুল হাসানের চিত্রকর্মের ছড়ারূপ দিয়ে তিনি বাংলা ছড়াকে নতুন মর্যাদায় দাঁড় করালেন। তাঁর প্রতিবাদী ছড়ায় কেবল প্রতিবাদ নয়, উদ্দীপনার মন্ত্র থাকে।

এই হাত পেতে লাভ হয় কি?
এই হাতে প্রতিশোধ
এই হাতে প্রতিরোধ
এই হাতে মুঠো হয় ভয় কী?

কবি শামসুর রাহমানের ছড়াকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তিনি যখন ছড়া লিখেছেন তখন অন্য শামসুর রাহমান। কবির দায় পূরণের অঙ্গীকার থেকে তিনি ছড়া লিখতে যাননি। তাঁর ছড়াকারসত্তা স্বতন্ত্র ও মৌলিক। তাঁর অনেক ছড়াও ছোটদের-বড়দের ভালোলাগার বস্তু হয়ে আছে।।

এই শহরে এক যে ছিল আঁকিয়ে
আঁকত ছবি ঘাড়টা কিছু বাঁকিয়ে
মাঝে-মাঝে গোঁফটা শুধু পাকিয়ে

বৈঠকে সব বসত বটে জাঁকিয়ে ।
ছবি দেখে বলত সবাই, 'ফাঁকি এ' ।
বুক ফুলিয়ে চুলের ঝুঁটি ঝাঁকিয়ে
নিজের ছবি দেখত নিজেই তাকিয়ে ।

এখলাস উদ্দিন আহমদের হাতে বাংলাছড়া বহুরঙের অলঙ্কার পরেছে। তিনি যা কিছু লিখেছেন, সবই প্রায় ছোটদের জন্য। 'উদ্ভট' ছড়াও যেমন লিখেছেন, তেমনি প্রতিরোধের ও প্রতিবাদের ছড়াও লিখেছেন। সেই সময়ে রচিত তাঁর একটি প্রতিরোধের ছড়া এরকম।

রাজপুরীতে বাজলো সানাই
কান ফুসফুস ধানাই পানাই
আঁতুর ঘরে কেরে?
চুপ চুপ চুপ ঠারিও না চোখ
রাজার পোলা যে রে ।
পোলার নামে মন্দ কথা
হাট বাজারে যথা তথা
মুখ চাপা দেয় কয়টার?
দুষ্ট লোকে যে যাই বলুক
ভেজাল এটা নয়তো মোটেই
খবর দিছে রয়টার ।

এই সময়ের আতোয়ার রহমানের ছড়া এবং ছড়া বিষয়ক গবেষণা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং বহুমুখী শিশুসাহিত্যিক ছিলেন তিনি। কবি আবু হাসান শাহরিয়ারের পর্যবেক্ষণে 'আতোয়ার রহমানের ভাষা ঋজু, বর্ণনা নিটোল'।[iii] আতোয়ার রহমানের একটি বহুলপঠিত ছড়া এখানে পাঠ করা যেতে পারে।

ধান রুয়েছি মাঠে কাল
বাঁশ মোতি, চিকনচাল ।
জন ডেকে পুকুর কাটি,
আম কাঁঠালের ছায়ার হাঁটি ।
বুকে আমার খোকনধন,
আর কিবা চাই রাজরতন ।
ডালিম গাছে দিলাম পান
ইষ্টিকুটুম ডেকে আন ।

ষাটের দশকের শেষার্ধে আমাদের ছড়াসাহিত্য যেন নতুন প্রাণ পায়। এর জন্য রাজনৈতিক প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেই এই সময়ে সৃষ্টি হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এবং গ্রহণযোগ্য মানের ছড়া। এ সময়ের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ডক্টর হায়াৎ মামুদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন।

১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ সাল। মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র দেশ ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত পাঁচ বছর সময়সীমা বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য একটি কারণে। এই পর্ব সাহিত্যধারা হিসেবে ছড়া কি সংখ্যা প্রাচুর্যে কি ইঙ্গিতময় বক্তব্য প্রকাশে আমাদের শিশুতোষ সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নেয়। এসব ছড়ার কিছু ছিল আপাতদৃষ্টে বালভাষিত কিন্তু ভিতরে পোরা থাকত ইঙ্গিতময় রাজনৈতিক বক্তব্য; কিছু ছিল স্পষ্ট, ঋজু সমাজচেতন ও রাজনৈতিক।[iv]

এই সময়ে ছড়া লিখে খ্যাতি অর্জন করেন ফয়েজ আহমদ, আতোয়ার রহমান, আবুল হোসেন মিয়া, সুকুমার বড়ুয়া, আল কামাল আবদুল ওহাব, এখলাসউদ্দিন আহমদ, রফিকুল হক, আখতার হুসেন, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, লুৎফর রহমান সরকার, হাসান জান, হোসেন মীর মশাররফ, মোহাম্মদ মোস্তফা, আল মুজাহিদী, ওবায়দুল ইসলাম, সিরাজুল ফরিদ, আবু সালেহ, প্রণব চৌধুরী, রশীদ সিনহা, সফিকুন নবী প্রমুখ ছড়াকার। এই সময়ের কবিরাও কিন্তু পিছিয়ে ছিলেন না। কবিতার পাশাপাশি ছড়া লিখে এগিয়ে আসেন ষাটের দশকের কবি বেলাল চৌধুরী, বেলাল মোহাম্মদ, ফজল এ খোদা, আসাদ চৌধুরী, শেখ তোফাজ্জল হোসেন, অরুণাভ সরকার, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, শামসুল ইসলাম, মুহম্মদ নূরুল হুদা, হুমায়ুন আজাদ, মোফাজ্জল করিম, অসীম সাহা, আবু কায়সার, বিপ্লব দাশ, ইমরুল চৌধুরী, জাহিদুল হক, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, ময়ূখ চৌধুরী, ইউসুফ পাশা প্রমুখ। এই সময়ের আবুল হোসেন মিয়াকে যেন ভুলতে বসেছি। আমার হাতের কাছে চার-পাঁচটা সংকলনে তাঁর ছড়া না-দেখতে পেয়ে অবাক হয়েছি। অথচ তাঁর 'একটুখানি' ছড়াটি তো অনেকেরই মুখে মুখে টিকে আছে এখনো। কম লিখলেও আমাদের দেশের অগ্রগণ্য ছড়াকারদের তালিকায় তাঁর নাম না-রেখে উপায় নেই। তাঁর ছড়াটি এরকম–

একটুখানি স্নেহের কথা, একটু ভালোবাসা
গড়তে পারে এই দুনিয়ায় শান্তি সুখের বাসা।
একটুখানি অনাদর আর একটু অবহেলা
ঘুচিয়ে দিতে পারে মোদের সকল লীলাখেলা
একটুখানি ভুলের তরে অনেক বিপদ ঘটে,
ভুল করেছে যারা, সবাই ভুক্তভোগী বটে!
একটুখানি বিষের ছোঁয়া মরণ ডেকে আনে
এই দুনিয়ায় ভুক্তভোগী সকল মানুষ জানে।
একটুখানি ছোট শিশুর একটু মুখের হাসি
মায়ের মনে, সবার প্রাণে বাজায় সুখের বাঁশি।

আল কামাল আবদুল ওহাব আমাদের শিশুসাহিত্যের এক সব্যসাচীর নাম। একসময়ে ছোটদের জন্য প্রচুর লিখেছেন ছড়া, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ। বর্তমানে অবসরজীবনে তেমন লেখা আর পাই না। তবু তাঁর কিছু উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি আমাদের স্মরণে থেকে যায়।

ঘুঘু ডাকে গাছের ডালে
কুমড়ো ঝোলে ঘরের চালে
ওই ঘুঘুটা মারবো

কুমড়োগুলো পাড়বো।

এই ছড়াটিতে ঘুঘু মারার অনুষঙ্গ নিয়ে আপত্তি উঠেছিল। বাচ্চাদের কেন ওই মারামারি শেখানো হবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল শিশুমনস্তত্ত্ব একে 'মারা' নয় 'খেলা' হিসেবেই গ্রহণ করেছে। ছড়াটি তাই মারা পড়েনি। মারা পড়ার আশঙ্কাও আর নেই।

বাংলাদেশের ছড়ায় রাজা হিসেবে দীর্ঘদিন শাসন করে চলেছেন সুকুমার বড়ুয়া। 'কবি সুকুমার বড়ুয়া : ছোটদের বড়দের' নামে ভিন্ন এক নিবন্ধে তাঁর ছড়ার কবিত্ব নিয়ো আমার আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। আমার বিবেচনায় সুকুমার রায়ের পরে ওপারে অন্নদাশঙ্কর রায় আর এপারে সুকুমার বড়ুয়া। সুকুমার বড়ুয়া জাতছড়াকার, জাতকবি। ছড়াকার রাশেদ রউফ একটি উদ্যোগ নিয়ে আমাদের ধন্যবাদ পেয়েছেন। তাঁর ছড়া নিয়ে বিশদ গবেষণার সুযোগ রয়েছে। তাঁর 'অসময়ে মেহমান, ঘরে ঢুকে বসে যান' এরকম অসংখ্য ছড়া মানুষের মুখেমুখে। একটি অন্যরকম ছড়া এখানে উল্লেখ করছি।

সখ হয়েছে রাজার
করতে যাবেন বাজার
সঙ্গে যাবে লোক-লস্কর
পুরো আড়াই হাজার।
গুণতে পেয়ে বিক্রেতারা
খুশীতে হয় আত্মহারা,
করছে শুরু ঝাড়া-মোছা
কতই ঘষামাজার॥

সুকুমার বড়ুয়ার পাশাপাশি উচ্চার্য আরেকটি নাম হচ্ছে আখতার হুসেন। তিনি মূলত কবিতা-ই লেখেন। ছন্দ-অন্ত্যমিল থাকে বলে সবাই তাঁর রচনাকে ছড়া বলে ধারণা করেন। একসময়ে প্রচুর লিখেছেন। সম্প্রতি তিনি পূর্ণোদ্যমে লেখা শুরু করেছেন। তাঁর একটি কবিতা আমার মুখস্ত হয়ে গেছে। এখনই বলে দেয়া যায়।

মা তো আমার কল্পলোকের গল্প বলার বুড়ি
মা তো আমার মনের কথা জমিয়ে রাখার ঝুড়ি।
...
মা তো আমার রঙিন সুতোয় নকশী তোলা কাঁথা
মা তো আমার হাওয়ায় কাঁপা সবুজ কলার পাতা।
...
মা তো আমার অনেক দামী সোনার জাদু-কাঠি
মা তো আমার সবুজ শ্যামল ঘাসের ছাওয়া মাটি।

যোগ্য মর্যাদা না পেলেও ছড়াকার প্রণব চৌধুরী তাঁর স্বকীয়তার গুণে টিকে থাকবেন। 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড শুনিস্ না লোক বলে?/ সবচে' দামি, তবু কেমন পেছন পেছন চলে!' কিংবা 'লাট সায়েবের জুতো, খাবার বেলায় খায় কি জানিস?/ বিরাশি মণ সুতো!' ।এই সকল

ছড়ার ধার কমার নয়। রফিকুল হক দাদুভাই'র কিছু ছড়া বেশ চকচকে। তাঁর একটি দামি ছড়া এই রকম।

পাঁচ এক্‌কে পাঁচ, আর
ছয় এক্‌কে ছয়
ত্রিশ লক্ষ লাশের দামে
কিনে নিলাম জয়।

আবু সালেহ'র ছড়ার ভুবন খুব বিস্তৃত। সংখ্যায় ও বিষয়বৈচিত্র্যে তিনি অতুলনীয়। ষাট ও সত্তর দশকে রচিত তাঁর রাজনৈতিক ছড়া বেশ উপাদেয় এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এখনও তিনি সমান সক্রিয়। তাঁর সেই সময়ের বিখ্যাত ছড়াটি এখনো তাঁর পরিচয় বহন করে আছে।

ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না বলা যাবে না কথা
রক্ত দিয়ে পেলাম শালার আজব স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কবিতার পাশাপাশি ছড়ার জোয়ার লক্ষ করা যায়। পঞ্চাশ-ষাটের কবি ও ছড়াকার তো বটেই সত্তর দশকে আবির্ভূত কবি ও ছড়াকাররা এতে যোগ দেন। কবিদের মধ্যে ছড়া লিখতে আসেন আবু হাসান শাহরিয়ার, আসলাম সানী, আবিদ আজাদ, আবিদ আনোয়ার, তিতাশ চৌধুরী, নাসির আহমেদ, নিতাই সেন, বিমল গুহ, মহসিন হোসাইন, মিনার মনসুর, রবীন্দ্র গোপ, রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, সানাউল হক খান, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, সৈয়দ হায়দার, সোহরাব পাশা, হাসান হাফিজ প্রমুখ। মূলত ছড়া লিখে যাঁরা এই সময়ে নন্দিত হলেন আনওয়ারুল কবীর বুলু, আবু জাফর সাবু, আলতাফ আলী হাসু, আলী ইমাম, কাজী রাশিদা আনওয়ার, খালেক বিন জয়েনউদ্‌দীন, জ্যোতির্ময় মল্লিক, তপংকর চক্রবর্তী, তুষার কর, দিলওয়ার বিন রশীদ, দীপংকর চক্রবর্তী, নিয়ামত হোসেন, ফরিদুর রহমান বাবুল, ফরহাদ জামিল, ফারুক নওয়াজ, মসউদ উস শহীদ, মনোমোহন বর্মণ, মুক্‌তিহরণ সরকার, মাহবুব তালুকদার, রব্বানী চৌধুরী, রেজা রায়হান বুলবুল, রোকেয়া খাতুন রুবী, লুৎফর রহমান রিটন, শচীন্দ্রনাথ গাইন, শাহাবুদ্দীন নাগরী, শামসুদ্দিন হারুণ, শামসুল হক দিশারী, শফিক আলম মেহদী, অজয় দাশগুপ্ত, আইউব সৈয়দ, সালেম সুলেরী, সুজন বড়ুয়া, সুখময় চক্রবর্তী, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ অন্যতম।

ছড়ার ছন্দ স্বরবৃত্ত এই বৃত্তাবদ্ধ ধারণাকে ভেঙে দিয়ে মাত্রাবৃত্তে অনেক ছড়া লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন কবি আবু হাসান শাহরিয়ার। নিখুঁত অন্ত্যমিল ব্যবহারে পারঙ্গম তিনি। আসলাম সানী বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অসংখ্য ছড়া রচনা করেছেন। তাঁর একটি দেশপ্রেমের ছড়া।

আমার গাঁয়ের ছবির বুকে
বাংলাদেশের কবির বুকে
হারিয়ে যাওয়া ভায়ের কথা
সবাই মনে রাখবে।

সত্তর দশকে লেখালেখি শুরু করেন লুৎফর রহমান রিটন। তাঁর ছড়া নিয়ে সকল মহলেই উচ্চপ্রশংসা রয়েছে। বর্তমানে কানাডাপ্রবাসী হলেও ছড়ার ভুবনে তিনি সদাজাগ্রত। এখনো লিখে চলেছেন অজস্র ছড়া। রাজনৈতিক ছড়াই বেশি লিখছেন এখন। তাঁর ছড়া নিয়ে দুই বাংলার খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায় একবার বলেছেন– তাঁর ছড়া লেখার হাত বিশেষ প্রশংসাযোগ্য।[v]

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মতে 'লুৎফর রহমান রিটন.বাংলাভাষার শিশুসাহিত্যের উল্লখযোগ্য কবিদের একজন।'[vi] স্বাধীনতার ঘোষণা-বিতর্ক নিয়ে তাঁর একটি চমৎকার সমাধান আছে ছড়ায়।

স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে
বৃথাই করি তর্ক
মুজিব ছাড়া এই বিষয়ে
নেই কারো সম্পর্ক।
মেজর জিয়া ঘোষণা দেন
শেখ মুজিবের পক্ষে
ধারণ করা আছে সেটা
ইতিহাসের বক্ষে।
পাঠক এবং ঘোষক দুটি
ভিন্ন রকম শব্দ
ব্যঞ্জনা তার পাল্টে দিয়ে
করছে ওরা জব্দ।
ইতিহাসকে যায় না মোছা
এইটুকু যা রক্ষে
'মেজর জিয়া ঘোষণা দেন
শেখ মুজিবের পক্ষে'।

দীপংকর চক্রবর্তীর ছড়া একটু ভিন্ন মেজাজের। ঢাকার বাইরে থেকেও তিনি নিয়মিত ছড়াচর্চা অব্যাহত রাখতে পেরেছেন কেবল

অন্তর্গত শক্তির জোরে। কবিদের মধ্যে ছন্দ, অলঙ্কার ও
অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের অধিকারী কবি আবিদ আনোয়ার। একই সঙ্গে তিনি স্রষ্টা ও ভাষ্যকার। এই সময়ে তিনি বেশকিছু ভালো ছড়া লিখেছেন । তাঁর একটি মজার ছড়া–

লেখার বিষয় পাই না বলে তখন মাথা চুলকাই
কেওড়া জলে ভিজিয়ে আমি শেওড়াগাছের মূল খাই।
একটু তখন বুদ্ধি খোলে
এদিক-ওদিক শব্দ ঝোলে
ধরে ধরে পঙ্‌ক্তি বানাই ছন্দে দেখি ভুল নাই!

পদ্য লেখা কঠিন বড়ো
তোমরা যারা চর্চা করো
বুঝবে কেন অনেক কবির মাথায় কোনো চুল নাই ।

খালেক বিন জয়েনউদ্‌দীন লোকজ ছড়ার আঙ্গিকে অনেক ভালো ছড়া উপহার দিয়েছেন । শিশুতোষ ছড়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয় । কিন্তু বড়দের ছড়াও তিনি লিখেছেন দাপটের সঙ্গে । মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর একটি ছড়া–

একাত্তরের দিন এসেছে রুখতে হবে ওদের
বদলা নিতে স্বজনহারার, শপথ প্রতিরোধের ।

এই সময়ের আরেক শক্তিমান ছড়াকারের নাম ফারুক নওয়াজ । গদ্যপদ্যে তিনি সমান সক্রিয় । অত্যন্ত সাবলীল তাঁর ছড়া । স্যাটায়ারের ভাষা তাঁর করায়ত্ত ।

কপাল মন্দ বাজার বন্ধ
পেটেতে আগুন জ্বলিতেছে
মানুষ সমানে মানুষ খাইবে
জনসাধারণ বলিতেছে
হুজুর খাচ্ছে কোপ্তা, পোলাও
ভূঁড়িতে চর্বি জ্বলিতেছে ।

সুজন বড়ুয়া মূলত কবি । ছোটদের উপযোগী করে সহজ ভাষায় লেখেন ।এই যা ফারাক! তাঁর প্রতিটি কবিতাই পাঠযোগ্য ও উপভোগ্য ।।

সবাই যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতার নামে
ছড়িয়ে গেল বারুদ-আগুন শহর থেকে গ্রামে
ধোঁয়ায় ঢাকা আকাশ হলো কারো মাথার ছাত
রাত হয়েছে দিন কারো আর দিন হয়েছে রাত
ঘর হয়েছে বাহির কারো বাহির হল ঘর
সেই তো একাত্তর ।

অত্যন্ত শক্তিমান ছড়াকার ছিলেন কৃষিবিজ্ঞানী ড. ফরহাদ জামিল । ছয়টি ছড়াগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও একেবারেই অনালোচিত অকালপ্রয়াত এই ছড়াকারের বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হয়েছে । শিল্পবিচারেই তাঁর ছড়া এই আসরে উল্লেখের দাবি রাখে ।

চটপটে কাজ তার
গটগটে চলা
ছটফটে মন তার
ঝটপটে বলা ।
কটকটে চুল তার
ফটফটে জুতো
কটমটে চোখ তার
খটমটে ছুতো ।

চটচটে মুখ তার
খটখটে স্বর
পটপটে কথা তার
মটমটে ঘর।

লন্ডনপ্রবাসী ছড়াকার রব্বানী চৌধুরী দেশের বাইরে গিয়েও ছড়াসাহিত্যের নিরলস স্রষ্টা। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ এবং লন্ডন নিয়ে তাঁর ছড়ার ভুবন আবর্তিত। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা তাঁর একটি সাম্প্রতিক ছড়া এরকম–

আকাশ-বাতাস কাঁপায় শোনো শেখ মুজিবের নাম
স্বাধীনতার মহান বাণী– 'এবারের সংগ্রাম...'।
'ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ো'– একটি মহান স্বর
আমাদের এই স্বাধীনতার জনক মুজিবর।

আশির দশকের কবিদের মধ্যে গোলাম কিবরিয়া পিনু ছাড়া আর কেউ ছড়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে এগিয়ে আসেননি। তবে ছড়ার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল তারুণ্যের আগমন ঘটেছে এই সময়ে। আনজীর লিটন, আশরাফুল মান্নান, আশরাফুল আলম পিনটু, আমীরুল ইসলাম, আরজু আহমেদ, আলফ্রেড যোশেফ, আলম তালুকদার, আহমদ সাকী, আহমাদ উলাহ, আহমাদ মাযহার, আ.শ.ম.বাবর আলী, ইমতিয়ার শামীম, উৎপলকান্তি বড়ুয়া, উত্তম সেন, ওমপ্রকাশ ঘোষরায়, কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার, খালেদ হোসাইন, জাকির তালুকদার, জাহাঙ্গীর আলম জাহান, প্রবীর বিকাশ সরকার, প্রবীর সিকদার, ফারুক হোসেন, বাদল ঘোষ, বাপী শাহরিয়ার, বিপুল বড়ুয়া, মানসুর মুজাম্মিল, মাহবুবা চৌধুরী, রফিকুর রশীদ, রহীম শাহ, রিফাত নিগার শাপলা, রাশেদ রউফ, মোখতার আহমদ মুক্ত, শাফিকুর রাহী, শুচি সৈয়দ, সাঈদ বারী, সিকদার নাজমুল হক, সেজান মাহমুদ, স্বপন ধর, সৈয়দ নাজাত হোসেন, সৈয়দ আল ফারুক প্রমুখ।

আমীরুল ইসলাম ছড়ায়-গল্পে সমান সক্রিয়। হরেক রকম ছড়া লিখে তিনি খ্যাতিমান। জোর করে ছন্দ মেলানোর অপচেষ্টা করেন না। আড্ডার মেজাজেই ছড়া লেখেন। সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই হয়ে ওঠে অসাধারণ শিল্পকর্ম। তাঁর একটি স্মরণীয় ছড়া–

পিতাকে যাদের স্বীকার করতে দ্বিধা
কিছু কিছু অসুবিধা,
তাদের মধ্যে এখনও রয়েছে
লাল-রক্তের খিদা
আর দেরি নয়, এখনই তাদের
নরকে পাঠাও সিধা।

শহিদপরিবারের সন্তান প্রবীর সিকদার ফরিদপুরের তিন দুর্ধর্ষ রাজাকারের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে গিয়ে মারাত্মক আহত হন। একেবারে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন পা হারিয়ে, পঙ্গু হয়ে। সাংবাদিকতা পেশা তিনি ছাড়েননি, ছাড়েননি ছড়ার চর্চা। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর অসংখ্য ছড়ার একটি–

হঠাৎ করেই নয়তো স্বাধীন
ঝরলো তিরিশ লাখ
তবেই সাধের বাংলাদেশে
বাজলো বিজয়-ঢাক ।

এই সময়ের কিশোর-কবিতার উজ্জ্বল নাম রাশেদ রউফ । ছড়া সংগঠন, ছড়া উৎসব এবং পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি শিশুসাহিত্যের চর্চায় বহুমুখী অবদান রেখে চলেছেন । তাঁর একটি কবিতা আমরা পড়ে নিতে পারি–

কখনো হই রোগপথ্যি, কখনো ঠিক বাসকপাতা
কখনো হই বৃষ্টিঝরা বর্ষাদিনে সিক্তছাতা ।

নব্বই দশকের কবিদের মধ্যে বর্তমান লেখকের দুটি ছড়া বই বেরিয়েছে এবং আরও তিনটি ছড়াগ্রন্থ যন্ত্রস্থ রয়েছে । এছাড়া টোকন ঠাকুর, মিহির মুসাকী ও রহমান হেনরী কিছু ছড়া রচনা করেছেন । আর কাউকে ছড়া রচনায় উৎসাহী হতে দেখা যায় না । বরং ছড়াকে কেউ কেউ কবিদের জন্য ক্ষতিকারক মনে করেন । সকলেই জানে যে, এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় প্রচুর ছড়ার জন্ম হয়েছে । নব্বইয়ের অভ্যুত্থানের পরে এই নিবন্ধকারের কিছু ছড়া অনেকের প্রশংসা কুড়ায় । ফলে ঈর্ষান্বিত কবিবন্ধুরা একে কবির তালিকা থেকে ঝেড়ে ফেলে 'ছড়াকার' বলে তাচ্ছিল্য করার অপচেষ্টা চালায় । কিন্তু তিনি ছড়া লিখতে পারাকে গৌরবের ব্যাপার মনে করেন । নিজের একটি ছড়া ছিল এরকম ।

মাথার ওপর ঝুলছে আমার
লক্ষকোটি মামলা
কই গেলি রে মন্ত্রী-সেপাই
দালাল-দোসর আমলা?
ভাগ কি তোরা কম পেয়েছিস
এবার ঠ্যালা সামলা!

এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারদের সঙ্গে নবীনরাও সুর মেলায় । বিশেষত এরশাদের পতনের আগ-মুহূর্তে, অর্থাৎ নব্বই দশকের শুরুর মুহূর্তে একঝাঁক ছড়াকার অল্প সময়ের মধ্যেই পরিচিত হয়ে ওঠেন । অশোকেশ রায়, আইরীন নিয়াজী মান্না, আরিফ বিল্লাহ মিঠু, ওবায়দুল গনি চন্দন, জ্যোতির্ময় সেন, টিপু কিবরিয়া, ধ্রুব এষ, নাসের মাহমুদ, বাকীউল আলম, মঞ্জুলিকা জামালী, মিহিরকান্তি রাউত, মুস্তফা মহীউদ্দিন, রবীন আহসান, রোমেন রায়হান, সব্যসাচী পাহাড়ী, সারওয়ার-উল-ইসলাম প্রমুখ ছড়াকার পরিচিত হয়ে ওঠেন । এই তালিকার অন্তরে বর্তমান লেখকের নামও ভুক্ত হতে পারে । এই সময়ে গোটা শিশুসাহিত্য অঙ্গনেই একটি নতুন আলোড়নের সৃষ্টি হয় । এই সময়ের শিশুসাহিত্য সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন জনপ্রিয় ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন ।

সত্তরের দশকের দায়িত্ববান শিশুসাহিত্যিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের সহযাত্রী আশি এবং নব্বই-এর দশকের তরুণ শিশুসাহিত্যকর্মিরা ভেসে গেছেন স্বতঃস্ফূর্ততার প্রবল জোয়ারে । বলতে দ্বিধা নেই– এই জোয়ারে তারুণ্যের প্রাবল্য এতটাই জোরালো যে,

প্রবীণেরা আর পেরে ওঠেন না। অস্তগামী সূর্যের মতো তারা শুধু 'চোর চেয়ে দেখেন'। তরুণরা এগিয়ে যায় সম্মুখ সমরে। তাদের পেছনে থাকে দেশপ্রেমিক নিষ্ঠাবান প্রবীণদের আশীর্বাদ, আলোকিত উপমার উজ্জ্বল অধ্যায়।[vii]

আমাদের নারীদের মধ্যে ছড়াচর্চার প্রবণতা একটু কম দেখা যায়। তবু দু'চারজন যাঁরা লিখছেন, তাঁদের মধ্যে মঞ্জুলিকা জামালীও একজন। বর্তমানে তিনি লন্ডনপ্রবাসী। তাঁর একটি ছড়ার উল্লেখ করছি–

আমায় যদি দাও গো তুমি যেতে
চাঁদের আলো ধরবো মাগো
তোমার আঁচল পেতে।
সেই আলোতে ভরবে মোদের ঘর,
থাকবে না আর তখন আমার
একটু ভয়-ডর।

এরশাদের পতনের পরেও ছড়াচর্চার ধারা থেমে থাকেনি। তখন একঝাঁক নতুন ছড়াকারের আগমন ঘটে। ঈষিকা গুহ, নাসিরউদ্দিন তুসী, মুকুল শাহরিয়ার, রমজান মাহমুদ, শামীম হোসেন প্রমুখ এই সময়ের উল্লেখযোগ্য নাম। নতুন শতাব্দীতে এসে ভালো ছড়া রচনায় যেন ভাটা পড়ে! কিংবা ছড়া যেন পণ্ডিতদের কাছে অচ্ছ্যুৎ হয়ে পড়েছে। কিন্তু পত্রিকার ছোটদের পাতা ভরানোর জন্য ঠিকই ছড়া ছাপা হচ্ছে। কেবল সাপ্তাহিক পৃষ্ঠা নয়, দৈনিক 'যুগান্তর' চালু করে প্রতিদিন ছড়া ছাপানোর পৃষ্ঠা। ছড়াকার আশরাফুল আলম পিনটুর তত্ত্বাবধানে 'একদিন প্রতিদিন' পৃষ্ঠায় 'আজকের ছড়া' ছাপা হচ্ছে প্রতিদিন। এরই ধারাবাহিকতায় দৈনিক 'সমকাল' চালু করেছে 'সমকালীন ছড়া' নামে প্রতিদিন একটি করে ছড়া ছাপানোর সুযোগ। এই সকল ছড়ায় সাম্প্রতিক সমাজের গল্প থাকে, কিন্তু প্রকৃত ছড়াগুণের ঘাটতি দেখা যায় অনেক সময়। বিশিষ্ট ছড়াকার খালেক বিন জয়েনউদ্‌দীনের ভাষায়।

আমাদের সাহিত্যের ছড়ার ভাণ্ডারটি প্রায় পরিপূর্ণ। পত্রিকাসহ প্রকাশনাসংস্থা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিবছরই নতুন নতুন ছড়া-কবিতার বই প্রকাশিত হচ্ছে। তবে ছন্দ-মিল ও বিষয়-বৈভবে ভালো ছড়া চোখে পড়ছে কম।[viii]

এই ভালো ছড়া চোখে পড়ার জন্য একসময় 'কচিকাঁচার আসর' এবং 'খেলাঘর' -এর নিয়মিত সাহিত্য বাসরের ভূমিকা ছিল। এখনও 'বাসর' হয়, কিন্তু নতুন ছড়ার 'জন্ম' হয় না। নতুন যাঁরা লিখতে আসছেন, তাঁরা 'কবিতা' খুঁজছেন। ছড়া লিখতে গেলে অন্তত কিছু কারগরি জ্ঞান লাভ করতে হয়। ছন্দ-অন্ত্যমিল জানতে হয়। তাল মাত্রার সমতারক্ষার অনুশীলন করতে হয়। কিন্তু 'কবিতা' লেখার জন্য এতকিছু করতে হয় না। সম্পাদকের সঙ্গে খাতির থাকলে চার-পাঁচ লাইন কোনও রকমে জড় করতে পারলেই প্রকাশনা নিরুত। শুদ্ধ কবিতা লেখা যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন কবিতার না-হওয়ার উপাদান চিহ্নিত করা। কিন্তু ছড়া পড়লেই ধরা যায় এর শুদ্ধতা রক্ষা পেয়েছে কিনা। ছড়া চেনা সহজ বলেই ছড়াকার হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। ছন্দের একমাত্র হেরফের হলেই তা ছাপার অযোগ্য হয়ে

ওঠে। কবিতায় এই ঝুঁকি নেই। তাই ছন্দ না জেনে, অলঙ্কার না জেনে কবিতা লেখার চেষ্টা করা যায়, ছড়া লেখার চেষ্টা করা যায় না।

নতুন প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য নাম ছড়াসহিত্যে যোগ হচ্ছে না, স্বীকার করেও বলা যায় পূর্ববর্তী ছড়াকারগণ এখনও সক্রিয় রয়েছেন বলে ছড়ার দৈন্য সৃষ্টি হয়নি। শিশুসাহিত্যে ছড়ার পাশাপাশি কিশোরকবিতার চর্চাও রয়েছে এই সময়ের অবদান। অবশ্য আখতার হুসেন, সুজন বড়ুয়া, সিকদার নাজমুল হক– এঁদেরকে ছড়াকার না বলে 'কিশোরকবি', আরও স্পষ্ট করে 'কবি' বলাই সঙ্গত। এবিষয়ে কবি-ছড়াকার সুজন বড়ুয়ার ধারণা হচ্ছে।

আমাদের শিশুসাহিত্যে ছড়ার পাশাপাশি আরেকটি ছন্দোবদ্ধ রচনাধারা প্রবহমান, যা ছন্দোবদ্ধ হয়েও স্বতন্ত্র আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যের কারণে ছড়া নয়, কবিতার পর্যায়ভুক্ত। এই ধারাটি সম্প্রতি 'কিশোর কবিতা' অভিধায় অধিক পরিচিত। স্বপ্নভরাতুর শিশুকিশোর মনের আলুথালু অনুভূতির কোমল রঙিন ও কাব্যময় প্রকাশক্ষমতার জন্যই কিশোর কবিতা এখন আমাদের বিপুল জনপ্রিয় ও সম্ভাবনাময় একটি সাহিত্য শাখা।[ix]

এই সাহিত্যশাখায় যাঁরা সফল হয়েছেন, তাঁরা মূলত ছড়াকার হিসেবেই পরিচিত। বিশেষত সুকুমার বড়ুয়া, আখতার হুসেন, খালেক বিন জয়েনউদ্‌দীন, আবু হাসান শাহরিয়ার, আসলাম সানী, ফারুক নওয়াজ, লুৎফর রহমান রিটন, সুজন বড়ুয়া, আশরাফুল আলম পিনটু, আমীরুল ইসলাম, সিকদার নাজমুল হক, টিপু কিবরিয়া, আহমদ সাকী, রফিকুর রশীদ, রহীম শাহ, রাশেদ রউফ, ধ্রুব এষ, অশোকেশ রায় প্রমুখ ছড়াকার কিশোরকবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত। ইতিহাসের স্বার্থে, লজ্জার মাথা খেয়ে বলতে হচ্ছে, বর্তমান লেখকের দুটি গ্রন্থের মধ্যে একটি কিশোরকবিতার বইও রয়েছে। অগ্রন্থিত কিশোরকবিতার সংখ্যাও কম নয়।

আমাদের দেশের খ্যাতিমান কয়েকজন চিত্রশিল্পীও ছড়া রচনায় সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রথমেই নাম আসে কাজী আবুল কাসেমের নাম। এরপর কাইয়ুম চৌধুরী, রফিকুন নবী, উত্তম সেন, আইনুল হক মুন্না এবং ধ্রুব এষের ছড়ার গুরুত্বকে অস্বীকার করার উপায় থাকে না।

আমাদের বেশ কয়েকজন ছড়াকার প্রবাসজীবনে থেকেও নিয়মিতচর্চার মাধ্যমে ছড়াসাহিত্যের অঙ্গনে সক্রিয় রয়েছেন। এঁদের মধ্যে লুৎফর রহমান রিটনের প্রবাসজীবন সাম্প্রতিক ও রাজনৈতিক। তিনি মূলত বাংলাদেশে থাকতেই জনপ্রিয়তার তুঙ্গ স্পর্শ করেছিলেন। তিনি ছাড়া প্রবাসী ছড়াকারদের মধ্যে অজয় দাশগুপ্ত, দর্পণ কবীর, প্রবীর বিকাশ সরকার, রব্বানী চৌধুরী, মঞ্জুলিকা জামালী প্রমুখের নাম উজ্জ্বলতর। দেশে না থেকেও এঁরা আমাদের ছড়াঐতিহ্যের ধারাবাহক হিসেবে কাজ করে চলেছেন।

অজয় দাশগুপ্তের ছড়া পড়ার সুযোগ হয়েছে বিভিন্ন সংকলন থেকে। তাঁর ওপর আমার লেখার সুযোগ হয়নি। প্রবীর বিকাশ সরকারের ছড়া পাঠ করেছি বিভিন্ন সময়ে। তাঁর 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' নিয়ে আলোচনার সুযোগও আমার হয়েছে। কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের মাধ্যমে প্রাপ্ত বইটি নিয়ে পাক্ষিক 'অন্যদিন' পত্রিকায়

আলোচনা লিখেছিলাম। তাঁর সঙ্গে এখনো আমার দেখা হয়নি, কথা হয়নি, পত্রবিনিময়ও হয়নি। আলোচনাটি তিনি পড়েছেন কিনা, তা-ও জানা হয়নি।

ছড়াঐতিহ্যের ধারকে যাঁরা বহন করে চলছেন, তাঁদেরকে নিয়ে এধরনের আলোচনার সুযোগ রয়েছে। দেশীয় নিয়মিত মিডিয়ার আনুকূল্য থেকে বঞ্চনার ঘাটতি এতে হয়তো কিছুটা পূরণ হতে পারে। আজকে গ্লোবাল ভিলেজের যুগে কে কোন দেশে আছে সেটা একেবারেই গৌন, কে কী করছে সেটাই মুখ্য। যাঁরা দেশে আছে তাঁরা তো আমাদের সামনেই আছেন। যাঁরা সামনে নেই তাঁদের শক্তি-সাফল্যের কথা দেশের মানুষকে জানানোর উদ্যোগ হিসেবে আজকের আলোচনাকে গণ্য করা যেতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

i বুদ্ধদেব বসু, বাংলা শিশুসাহিত্য, 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ', নবার্ক, কলকাতা, ১৯৮৬

ii বুদ্ধদেব বসু, প্রাগুক্ত

iii আবু হাসান শাহরিয়ার, স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের অগ্রগতি, পাক্ষিক শৈলী, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

iv হায়াৎ মামুদ, বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ : শিশুসাহিত্য, 'বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ', ড. করুণাময় গোস্বামী (সম্পা.), সুধীজন পাঠাগার, নারায়ণগঞ্জ, ১৯৯৪

v অন্নদাশঙ্কর রায়, ভূমিকা, লুৎফর রহমান রিটনের 'ছড়াসমস্ত', অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৮

vi আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ভূমিকা, লুৎফর রহমান রিটনের নির্বাচিত কিশোর কবিতা', বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৮

vii লুৎফর রহমান রিটন, বিশ শতকের বাংলাদেশ: শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ, 'একুশের প্রবন্ধ ২০০০', বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০০

viii খালেক বিন জয়েনউদদীন, 'বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যে নতুন দিকনির্দেশনা'। তপন বাগচী সম্পাদিত 'শিশুসাহিত্যবর্ষ স্মারকগ্রন্থে'র জন্য সম্পাদকের অনুরোধে রচিত। গ্রন্থটি এখনো প্রকাশিত হয়নি।

ix সুজন বড়ুয়া, আমাদের শিশুসাহিত্যের ধারা-প্রবণতা, 'বই', জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা, ৩৮ বর্ষ : অষ্টম-নবম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ২০০৪

[লেখক: কবি, ছড়াশিল্পী, শিশু-কিশোর সাহিত্যিক, গবেষক। কর্মকর্তা, বাংলা একাডেমী।]

সুকুমার রায়ের ছড়ায় ব্যঙ্গাত্মক রাজদর্শন

বি লু ক বী র

চিরায়ত সাহিত্য তা-ই, যা নতুন নতুন প্রত্যাশায় বারবার পড়লে বারবারই আধুনিক লাগে। তাকে লোকসাহিত্যও বলা চলে। কেননা, ফোকলোর হচ্ছে অতীতের বর্তমান, ভবিষ্যতের অতীত এবং বর্তমানের বর্তমান তো অবশ্যই। তার মানে এ নয় যে, এ ধরনের সাহিত্যকর্মের রূপ পাল্টানোর একটা চারিত্র্যবহতা রয়েছে। তা হলে? তা হলে সত্য হল, এর মাধ্যমে প্রসূত ফলের অনন্যের বহুমুখিতা। আর এই ভর-শক্তি-গতি এবং সামাজিক সমন্বয় থাকে যে রচনায়, তা-ই প্রবহমান, তা-ই চিরন্তন। অবশ্যি 'চিরন্তন' কথাটির আভিধানিক ব্যুৎপত্তি আর সাহিত্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগের ব্যাখ্যা অনেকটাই আলাদা। 'চিরন্তন' যেন একটা অঙ্কের হিসাব, কিন্তু সাহিত্যিক বীক্ষণে বিষয়টি ঠিক গণিত নয়। সে হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে তার সামসময়িক থাকার অপার যোগ্যতা। কোনোরকম মাথা না ঘামিয়ে আলগোছেই এই কথাগুলো ভেতর থেকে উৎসারিত, যখন কিনা সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) বিষয়ে ভাবছি, তাঁর ছড়া নিয়ে একটা কিছু কাজ করার জন্য। এই যে আশ্চর্য একটা বোধিসত্যের জাগৃতি ঘটছে এর কারণ কী? কারণ হল উপরের কথাগুলো সুকুমার রায়ের ছড়ার ক্ষেত্রে খাটে। সব ছড়ার ক্ষেত্রে হয়তো খাটে না, কিন্তু প্রায় সবটুকুকেই এই চেতনার আওতায় রাখা চলে। ছড়ার বাইরে তার আর সব লেখালেখি, সেখানে প্রচুর ছড়ার প্রয়োগ-প্রভাব এবং আবহ জেঁকে আছে। যদিও সেসব লেখা এই লেখার প্রতিপাদ্য নয়। একটা প্রশ্নের মীমাংসা আগেভাগেই করে নেয়াটা ভালো যে, তাহলে কি তাঁর সব ছড়াকে এই চাকঘরে শুইয়ে যাকে বলে নানারকম ব্যবচ্ছেদ করা হবে? না, ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়। তাঁর ছড়ার পরিমাণকে খুব-বহু বলা যাবে না। কত? ছড়াগ্রন্থ বললে 'আবোল তাবোল' (১৯২৩), 'খাইখাই' (১৯৫০), 'অতীতের ছবি', 'অন্যান্য কবিতা' এই তো। এগুলোতে তাঁর মোট মিলিয়ে ১২৯ ছড়া/পদ্য আছে। এর মধ্যে 'আবোল তাবোল'-এ চারটে, 'খাইখাই'-এ তিনটে এবং 'অন্যান্য কবিতা'য় একটা মিলিয়ে মোট ৭টি ছড়াণু আছে শিরোনামহীন। এর বাইরে তাঁর যে 'শ্রীকাকেশ্বর কুচ্‌কুচে'

রম্যরূপকথা, সেখানে গদ্যের বাঁকে বাঁকে চরিত্রদের প্রয়োজনে ছয়-সাত জায়গায় ছড়ার প্রয়োগ আছে। 'পাগলা দাশু'তে ছড়ার খুদ আছে একটা। 'আশ্চর্য কবিতা'য় ছড়া এসেছে পাঁচ বার, 'দ্রিঘাংচু'তে একবার। 'ঝালাপালা' নাটিকায় আছে নয় বার। নাটিকা 'লক্ষণের শক্তিশেল' তো পুরোটা ছড়ানাট্য। নাটিকা 'চলচিত্ত-চঞ্চরি'তে আট-বার। 'ভাবুকসভা' ও 'লক্ষণের শক্তিশেল'-এর মতো পুরোটাই ছড়ানাট্য। 'শব্দকল্পদ্রুম'-এ বলা যায় পুরোটাই ছড়ায় ছড়ায় কথোপকথন। 'বাল্যরচনা ও অন্যান্য'তে রয়েছে চারটে ছড়া। এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে গান বা গানের অংশ হিসেবে প্রযোজ্য যে আন্ত্যমিলনাত্মক পদ্য, যেগুলোও মূলত এক এক মাত্রা-লয়ের ছড়াই বটে।

এর অর্থ খুব স্পষ্ট যে, সুকুমার রায় শিশুদের জন্য মোট যে সাহিত্য রচনা করেছেন, তাতে ছড়া বাদেও তাঁর সমুদয় যে গল্প, কবিতা, পদ্য, নাটিকা, সন্দর্ভ সব ক্ষেত্রে ছড়া বিশেষ এবং প্রায় অপরিহার্য একটা মাধ্যম। তাঁর সাহিত্যশরীরের যে গঠন, সেখানে ছড়াপেশির দোর্দণ্ড প্রতাপী উপস্থিতি কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। আমরা যদি তাঁর ছড়ার সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোকসম্পাত করতে প্রয়াস পাই, তাহলে গায়ে-পড়ে পথ হারাতে পথে নামার মতো নির্বুদ্ধিতা হবে। নিজের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে সাবধান থাকতে পারাটা চেষ্টার মধ্যে রাখা ভালো। তাই, আমরা কেবল তাঁর ছড়ায় যেসব রঙ্গাত্মক ব্যঙ্গ বা রসের চপেটাঘাত রয়েছে এবং যেখানে জ্ঞানী সমাজের জন্য ইতিবাচক কটাক্ষ থাকা সত্ত্বেও তির্যক বিরূপাক্ষ নয় ধরনের শুভ ইশারা রয়েছে, তা নিয়ে অসম্পন্ন আলোচনা করতে চাইব। তাঁর আগে যে কথাটা বলে নেয়া প্রাসঙ্গিক হবে, তাহল সুকুমার রায় তাঁর পুরো শিশুসাহিত্যে, অর্থাৎ যে সাহিত্য যুগপৎভাবে শিশুদের সাথে সাথে বড়দেরও, সেখানে অনেকগুলো ছবি এঁকেছেন, যার ফলে ছড়া বা সংশ্লিষ্ট লেখার রসাস্বাদন আরও অনেক বেশি সোজা এবং সকৌতুক আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে ষোলআনা সাফল্যে। মোট ১১২টি বিস্ময়কঠিন সহজ কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র তিনি এঁকেছেন যা দৃশ্যানন্দের নন্দনমূল্যের চাইতে চিত্র-সাহিত্যমূল্যে অনেক বেশি।

পুরনো বাঙালি পাঠকমাত্রই জানেন তাঁর সেই হাঁসজারু, বকচ্ছপ, গিরগিটিয়া, বিছাগল, জিরাফড়িং, মোরগরু, হাতিমি, শিংহরিণ বিষয়ে। এ প্রজন্মের বাঙালিরা পুরোপুরিই যদি সুকুমার রায়কে উপেক্ষা করেন, তা হলে সেটা আসলে হবে তাঁকে 'মিস করা'। আসলে মিস, আর উপেক্ষা কি একই কথা? বলতে চাইছি 'মিস করা' বলতে একালে যা বোঝায়, তার নামে সুকুমার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা আর কি! বিশেষ করে কুমড়ো নিয়ে রাজার পিসির ক্রিকেট খেলার ছবিটা, তার পরে সেই যে 'মুলোর ঝুঁটি ঝুলিয়ে নাকে/আর কি গাধা ঝিমিয়ে থাকে?'-র অমন মনোহারি ছবিটি সমান রসে সর্বকালের পাঠককে টানতে নিশ্চয়ই অব্যর্থ। ভালো করে দেখতে গেলে এই ছড়ায় সাহিত্যের চাইতে বিজ্ঞান এবং বিশেষ করে গতিসূত্রকে মাছভাতের মতো সহজ করে। যে কথা বলছিলাম, সুকুমার রায়ের বাচ্চাদের জন্য আঁকা ছবি, এখনও মনে প্রশ্ন জাগে— তার ছড়াগুলোই কি আঁকা আর ছবিগুলো কি লেখা নয়? আলবৎই তা-ই।

ছড়াগুলো আঁকা হোক বা না হোক, ছবিগুলো যে লেখা এই আপাত হেঁয়ালির অনেক প্রায়োগিক সত্যতা রয়েছে। এ নিয়ে ঢের বাহাস করা যাবে। ছোটদের সাহিত্যের বড়ত্বও এখানে অনুধাবিত হয় যে, তাদের সাহিত্য বড়দের সাহিত্যের মতো সীমাবদ্ধ জলের সমুদ্র নয়। বড়দের সাহিত্য একরৈখিকভাবে শুধুই বড়দের, তা কেবল ছোটদের নয়ই নয়, অনেকাংশে ক্ষতিকরও বটে। কিন্তু ছোটদের সাহিত্য কেবল বড়দের জন্যও নয়ই নয়, একাধারে তা সমানে আনন্দায়কও বটে।

আমরা সুকুমার রায়ের ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসকে পান করতে চেষ্টা করব। তার আগে তাঁর পরিবার-পরিস্থিতির আগপাছ, তাঁর বেড়ে ওঠা, তাঁর প্রতিভার উত্তরসূরিতা এবং পূর্বঐতিহ্য এসব একটুখানি আলোচনায় আসতেই তো পারে এবং সেই অনুষঙ্গে এমন কিছু কথা, যা কারু পছন্দ হবে, কারু-বা হবে না। যেমন প্রথমেই বলি, আমি একটা সময় জেনে এসেছি যে, 'সন্দেশ' মানে কেবলই ছানা আর চিনি দিয়ে তৈরি সুস্বাদু মিষ্টান্ন। তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে খবর বা সুখবর সেই বিষয়টি আমি জেনেছি এই মানুষটার মারফতে। বোধকরি অনেকের ক্ষেত্রেই এই ঘটনা পুরাঘটিত অব্যয়। যাই হোক, ওঁরা খাঁটি ময়মনসিংহের মানুষ। তাঁর বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) জন্মগ্রহণ করেছিলেন ময়মনসিংহের মসূয়া গ্রামে। তাঁরা বাবা পণ্ডিত কালীনাথ রায়চৌধুরী ওরফে শ্যামসুন্দর মুন্‌শি। কালীনাথ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। পাণ্ডিত্যে ঝানু মানুষের পুত্র বলে যোগ্য গুণী হবেনই ব্যাপারটি এমন নয়। কিন্তু তাঁর ছেলে উপেন্দ্রকিশোর রায় তেমনটিই হয়েছিলেন। তিনি স্মৃতিধর শিশুসাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী। তাঁকে বলাই হয় যে, বাংলা শিশুসাহিত্য রচনার পথিকৃৎ। 'সন্দেশ' পত্রিকা তাঁরই কীর্তি। তিনি ছোটদের রামায়ণ (১৮৯৪-১৮৯৮) ছোটদের মহাভারত (১৯০৯) এবং ছড়া লিখেছেন।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও তাঁর লেখালেখি রয়েছে, কবিতা, গান, স্মৃতিকথা, গবেষণা। তো তাঁর ছেলে দুই পুরুষ আগের সাংস্কৃতিক তেজে সংক্রমিত হবেন এটা বিস্ময়কর নয়। কিন্তু বিস্ময়কর হচ্ছে সেই তাঁর ছেলে সুকুমার রায়ের প্রতিভার স্ফূরণের আঁচ ও আলোর। যে গ্রামে বাবা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই একই গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার 'সন্দেশ'-এর হাল ধরেছিলেন তিনি এবং এককভাবে শিশুসাহিত্যিক খ্যাতি পেয়েছিলেন। কলকাতায় তাঁর পড়াশুনো। তখন তিনি নাটকে অভিনয় এবং হাসির নাটক লেখার দিকে ঝুঁকে পড়েন। এই অভিনয় এবং হাসির চিত্রনাট্যে তাঁর পুত্র সত্যজিৎ রায়কেও (১৯২১-১৯৯২) পরবর্তীতে আমরা ঝুঁকে পড়তে এবং পৃথিবী-মাপের সফল্য অর্জন করতে দেখব এবং আরও পরে সত্যজিতের যিনি ছেলে, সন্দীপ রায় তাঁকেও দেখব অভিনয় এবং চলচ্চিত্র তৈরির ক্ষেত্রে অস্কার পাওয়া বাবার যোগ্য শিষ্যসন্তান হতে। কতটা হাসিতামাশা এবং তার মধ্যে সিরিয়াসনেসকে ধরতে পেরেছিলেন তিনি? তার উত্তর মেলে এই সন্দেশঅলার ছেলে যখন 'ননসেন্স ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন। এই রকম গভীর মেধাপ্রসূত উদ্ভট নামে যে একটা সাহিত্যমাঙ্গলিক ক্লাব হতে পারে, তা বাঙালিসমাজে খুব একটা দেখা যায় না। সমাজের নানা

অসঙ্গতিকে তির্যক রঙ্গব্যঙ্গে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তিনি রসব্যঙ্গকে শানানো হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তাঁর রসবোধ এবং তীক্ষ্ণ মেধার জোরেই। ভাবতেই অবাক লাগে, তাঁর ননসেন্স ক্লাবের মুখপাত্র লিটলম্যাগের নাম ছিল 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'। মানুষটা যে কেবল এসব নিয়েই ছিলেন, ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। তিনি ক্যামিস্ট্রি এবং ফিজিক্স বিষয়ে বিএসসি. অনার্স করেছিলেন। ফটো তোলা এবং মুদ্রণবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবৃত্তি নিয়ে বিলেত গিয়েছিলেন ১৯১১ সালে। সেখানে তিনি গুরুপ্রসন্ন স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্র হিসেবে 'ম্যানচেস্টার স্কুল অব টেকনোলোজি'-তে লেখাপড়া করেন। ডিগ্রি 'লাভ করেন' না বলে 'অর্জন করেন' বলার একটা কারণ আছে, সেটা হল তিনি ইউরোপের ছেলেমেয়েদের সাথে টক্কর দিয়ে লেখাপড়া করেছিলেন সেই তো বেশ! কিন্তু তা নয়, তাঁকে প্রথম স্থান অধিকার করতে হয়েছিল। এই না হলে পণ্ডিতের নাতি আর শিশুসাহিত্যিক-চিত্রশিল্পী ছিলেন! এঁরও কিন্তু আবার ছেলে আছে এবং সেই ছেলের ছেলে! বটে একটা শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে রয়েল ফ্যামিলি। সুকুমার রায়ের ছেলে সত্যজিৎ রায়কে কে-না চেনেন! সত্য'র ডাক নাম মানিক, তিনি অবশ্যি জন্মেছিলেন কলকাতায় এবং মাত্র আড়াই বছর বয়েসে পিতৃহারা হয়েছিলেন। তাঁর জীবন আরও গৌরবের এজন্য যে পূর্বতন দুই এবং নিজ ও পুত্র মিলিয়ে চার পুরুষের পারিবারিক জীবনে মানিক বা সত্যজিৎ রায়ই সবচে কঠিন অনটনকে মোকাবেলা করেছেন। এ কারণে তাঁর বয়েস যখন ৬ বছর, তখন মায়ের সাথে তাঁকে মামাবাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়। মা সুপ্রভা দেবী সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করে, শিক্ষকতা করে জীবন ধারণ ও পুত্রের লেখাপড়ার খরচ যোগান। যা হোক, পরে এই ছেলে প্রচ্ছদশিল্পী হন, চিত্রশিল্পী হন, চাকুরে হন, স্থিরচিত্রী হন, সংগীতবিশেষজ্ঞ হন এবং সর্বোপরি চিত্রনাট্য-রচয়িতা ও ক্ষণজন্মা চিত্রপরিচালক হন। যিনি কিনা শেষপর্যন্ত চলচ্চিত্রের নোবেল 'অস্কার পুরস্কার' (১৯৯২) লাভ করেন, ভারতরত্ন হন (১৯৯২)।

ব্যঙ্গাত্মক রসরঙ্গ কিভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে সুকুমার রায়ের ছড়ায়? একেবারেই সহজ সরল শিশুসুলভ বোধগম্যে। তা শিশুদের জন্য হৃদয়গ্রাহী এজন্য যে বলার ভঙ্গিগুলো একদম সরাসরি। তা না হলে শিশু বুঝবে কী করে! না বুঝলে তা তার জন্য আনন্দদায়ক হবে কিভাবে! কিন্তু মজার ব্যাপার হল একই ছড়ায় উচ্চারিত শিল্পিত কটাক্ষ যা শিশুর জন্য প্রত্যক্ষ, তাই কিন্তু বড়দের জন্য পরোক্ষ বা যাকে বলে বিমূর্ত। এবং তখন সেটার সামাজিক-রাজনৈতিক সাহিত্যমূল্য হয়ে দাঁড়ায় সাহসী এবং গণস্বভাবী কল্যাণমুখী। তাঁর ছড়াস্থ ব্যঙ্গবিদ্রূপ তাই সরল কাতুকুতুর সাথে সাথে একাধারে চোখে আঙুল দিয়ে সমাজের অসঙ্গতি নির্দেশক। আর এজন্য সুকুমারের ছড়া প্রথমত ছোটদের সাহিত্য হলেও সেই শৈলীগুণে সেই রচনার অন্তর্প্রসারতা ব্যাপক-

বিস্তীর্ণ। সে কারণে তিনি বাংলাসাহিত্যের অনেক ছড়াকারকে যেমন ছাড়িয়ে আছেন, তেমনি প্রায় কেউই তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছেন না। বিশেষ করে ছোটদের-বড়দের-সকলের ধরনের ছড়া রচনার ক্ষেত্রে বাংলাসাহিত্যে তাঁর জুড়ি মেলা ভারই তো বলা যায়। অথচ

সুকুমার রায় যে সেই ছাত্রবেলা থেকেই সাহিত্য বা ছড়া করে হাত পাকিয়েছিলেন তা নয়। তাঁর তো স্কুল এবং কলেজজীবন কলকাতাতেই, তো সেই পুরো ছাত্রজীবনে মাত্র দুটি বাল্যরচনার অতিরিক্ত তাঁর কোনো লেখা কোথাও ছাপা হয়েছিল এমন জানা যায় না। এ দুটি রচনা বেরিয়েছিল 'মুকুল' পত্রিকায়, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (সম্ভবত সম্পাদকও) শিবনাথ শাস্ত্রী। সুকুমারের লেখালেখি এবং তাতে হাস্যরসের ব্যঙ্গসমৃদ্ধি লক্ষ করা যায় লেখাপড়া শেষে তাঁর সৃষ্ট 'ননসেন্স' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার মাধ্যমে। এইভাবে পথ বানিয়ে পথ চলা এবং সেই পথও অতিক্রম করা চাট্টিখানি কথা নিশ্চয় নয়।

রঙ্গব্যঙ্গ বা কৌতুক, ধেনো বাংলায় যাকে বলে তামাশা, সেই তামাশা যে কতটা তির্যকভাবে সমাজ-শাসন-বিশ্বাস-প্রথা-মিথকে একেবারে আলগা করে দিতে পারে তার অনেক উদাহরণ সহজেই পাওয়া যাবে সুকুমারে। এবং তামাশা করে বলা চলে পাঠকালে তা যেন তেমন গা-জ্বালা ধরায় না। কিন্তু গভীর অভিনিবেশ নিয়ে পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে গেলে, তা কিন্তু এক আশ্চর্য সাহসীর চপেটাঘাত, এমনকি তা কেবল সমাজ-প্রশাসন-সংসারের ওপর নয়, একেবারে ধর্মের চেতনা বরাবরও। তিনি যে রামায়ণের ছোটদের উপযোগী সহজ ছড়ারূপ দিয়েছেন, তাতে যে কেবল অমন একটি মহাকাব্যকে ধোলাই-ঝাড়াই হয়েছে তা-ই কিন্তু নয়। তার কুশীলবদেরকে অর্থাৎ রামায়ণের অনেক চরিত্রকে তিনি মহাকাব্যের ঠাট থেকে হিঁচড়ে একেবারে পথের ধুলোয় এনে ছেড়েছেন এবং সেটা রসরঙ্গের মাধ্যমে করা হয়েছে বলে গায়ে ফোসকা পড়ার আগেই পাঠক অলক্ষে তা গলাধঃকরণ করে মনে হয় সাংস্কৃতিক ঢেকুর পর্যন্ত তুলেছেন যে, 'আহ্ পড়লাম বা খেলাম বটে আসুদা করে'। রামায়ণে পুঁইশাক চচ্চড়ির প্রসঙ্গ, হনুমানকে একেবারে গুড়ের বাতাসা খাইয়ে ছাড়া, তাছাড়া প্রাণসংহারী দেবতা যমের মাইনে বকেয়া পড়া এসবই যখন ছোটদের না হয়ে বড়দের, তখন কিন্তু তা রীতিরকম রাজনৈতিক ইশারাসূচক এবং পৌরাণিক অসারতার শেকড় ধরে টান দেয়ার শামিল। তাছাড়া তিনি তাঁর শিশুসাহিত্যের জন্য সন্দেশ'-এ রাক্ষস, পিশাচ– এদের ছবি যেভাবে এঁকেছেন, তা বাচ্চাদের চোখ ভেবে আঁকলে নিছকই আনন্দের। কিন্তু বড়দের অনুসন্ধানী দৃষ্টির সামনেও পড়বে এটা মাথায় থাকা সত্ত্বেও ওঁর ছবি আঁকাটা চরম দুঃসাহস তো বটেই। যেমন 'দ্রিঘাংচু' একটা গল্প বটে। কিন্তু তাতে ছড়ার বা ছড়ার অবয়বে লেখা মন্ত্রের প্রয়োগ আছে। এই গল্পে রাজসভায় যে কাকের ডাক এবং তারপর স্বয়ং রাজামশাইকে প্রাসাদের ছাদে একটা কাকের সামনে দাঁড় করিয়ে তাকে দিয়ে একটা ছড়া আঙ্গিকের মন্ত্র পড়িয়ে ছাড়া হয়, এটা তো বলাই বাহুল্য রাজশাসন ও রাজার মাথার গোবর-উর্বরতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া। জ্ঞানী (?) রাজাকে দিয়ে কাকের সামনে যে ছড়াটি বলানো হয়েছে, তা হল:

হলুদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎ পটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি

নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা
নেই মামা তাই কানা মামা
চিনে বাদাম সর্দি কাশি
ব্লটিং পেপার মাঘের মাসি
মুশকিল আসান উড়ে মালি

ধর্মতলা কর্ম খালি। (দ্রিঘাংচু, বহুরূপী, সমগ্র শিশুসাহিত্য : সুকুমার রায়, সম্পাদক : সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু, আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা ৯, শ্রাবণ ১৩৯৫, পৃষ্ঠা ৪৭)

বুঝুন অবস্থাটা যে, রাজার জ্ঞানগম্যি আর আভিজাত্যের কী গরিবানা! শুধু রাজা তো নন, হেড অফিসের বড়বাবু, পশুরাজ সিংহ, কাজির বিচার এসবের বেআব্রু অবস্থা করে ছেড়েছেন তিনি। যেমন :

রোদে রঙো ইঁটের পাজা তার উপরে বসল রাজা—
ঠোঙা ভরা বাদাম ভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না
গায়ে আঁটা গরম জামা পুড়ে পিঠ হচ্ছে ঝামা—

রাজা বলে বৃষ্টি নামা— নইলে কিছু মিলছে না। (আবোল তাবোল, নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ভূমিকার ৩)।

রাজমশাইকে মুক্তকচ্ছ করা আর কাকে বলে! হেডঅফিসের বড়বাবু মানে কী? মানে তো প্রটোকলে মন্ত্রীর সমান, তেজের দিক দিয়ে অনেকক্ষেত্রে তার চাইতে বেশি। কিন্তু তার কুপোকাত কাত করতে সুকুমারের ঠ্যাটামিটা দেখুন, কী রসিক-নিষ্ঠুর এবং বুকের পাটা!

হেড অফিসের বড় বাবু লোকটি কত শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জানত?...
এ গোঁফ যদি আমার বলিস কর্‌ব তোদের জবাই'–
এইনা বলে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।
ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়–
কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।
অফিসের এই বাঁদরগুলো, মাথায় খালি গোবর
গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।
ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধরে খুব নাচি,
মুখ্যগুলোর মুণ্ডু ধরে কোদাল দিয়ে চাঁচি।
গোঁফকে বলে তোমার আমার-গোঁফ কি কারো কেনা?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা। (আবোল তাবোল)

নিশ্চয়ই এর আর কোনো ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। এক অর্থে সিংহ মানেই রাজা। বনের মানে প্রতীকী অর্থে মনুষ্যসমাজের। আর বন্যরাজা মানে মানুষের রাজা। তা সে

গণতান্ত্রিকই হোক বা অগণতান্ত্রিকই হোক। যে কারো হোক একবার রাজা হয়ে যেতে পারলে যে কত রকমের খায়েস, তার ইয়ত্তা নেই।

সিংহের শিং নেই, এই তার কষ্ট–
হরিণের সাথে মিলে শিং হল পষ্ট। (আবোল তাবোল)

আর যে বলেছি কাজির বিচার, মানে সেটাই তো মানবসমাজে ন্যায়বিচারের অন্যতম সেরা পরাকাষ্ঠা।

শিবঠাকুরের আপন দেশে
আইন কানুন সর্বনেশে!
কেউ যদি যায় পিছলে পড়ে,
প্যায়দা এসে পাক্‌ড়ে ধরে,
কাজির কাছে হয় বিচার-
একুশ টাকা দণ্ড তার ॥...
কারুর যদি দাঁতটি নড়ে,
চার্‌টি টাকা মাশুল ধরে,
কারুর যদি গোঁফ গজায়,
একশো টাকা ট্যাক্‌স চায়—
খুঁচিয়ে পিঠে গুঁজিয়ে ঘাড়,
সেলাম ঠোকায় একুশ বার ॥ (একুশে আইন, আবোল তাবোল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬)

মানে রাজার যা-ইচ্ছে-তাই আইন জারির নাম প্রজা-উৎপীড়ন এবং তাই নিয়ে একতরফা বিচারব্যবস্থা। কেউ পিছলে পড়তে পারবে না, কারু দাঁত নড়লে, গোঁফ গজালে, কেউ বিনেটিকেটে হাঁচি করলে এমনকি পদ্য লিখলে পর্যন্ত খাঁচায় পোরার দণ্ড। খাঁচা মানে মনে হয় জেলখানা। প্রতীকী আর কী! মানে বিচারব্যবস্থা, বিচারালয় এসব বিষয়ে কী বলা যাবে আর কি বলা যাবে না এ নিয়ে বাঙালির চিরকাল একটা ভ্যাবাচ্যাকা ধুন্দুমার বেগতি। মানে কোন্ কথায় যে আদালতের অবমাননা হবে, আর কোন্ কথায় যে অবমাননা হবে না, সেটাই আমরা তিন সাড়ে তিনশ বছরে ঠাওর করতে পারলাম না। এজন্যই মনে হয় বলে যে, 'বাঙালিকে হাইকোর্ট দেখানো'। অথচ আমাদের জাতীয় জীবনে চিরকাল আমরা দেখে আসছি মামলায় হেরে যাওয়া মক্কেলের উকিল যথেষ্ট মেজাজের সাথেই বলে থাকেন যে, 'আমরা ন্যায় বিচার পাইনি, আমরা উচ্চআদালতে আপিল করব'। কী আশ্চর্য! একেবারে রায়কেই ইনজাস্টিজ বলা হচ্ছে, অথচ তখন কিন্তু আদালতের মোটেই অবমাননা হচ্ছে না। তবু এভাবেই চলছে বিচার বিষয়ে কথা বলা-না বলা, রাজার ইচ্ছেমতো জননিবর্তন। সে আমলে প্রাশাসনিক তথা রাজপীড়নের তো শেষ ছিল না। সাধারণ মানুষকে তরকারি বিক্রি করতে হাটে আসলে 'তোলা' দিতে হত, নিজের বাড়িতে একটা গাছ লাগালে 'চৌথা', গুড় তৈরি করলে 'ইক্ষুগাছ কর', ঘাটে নৌকা লগিতে বাঁধলে 'খোঁটাগাড়ি', নৌকায় মাল ভর্তি ও খালাস করলে 'কয়ালি',

গরুগাড়িতে মালামাল বহন করলে 'ধূলট', মরা গো-মহিষাদি ভাগাড়ে ফেললে 'ভাগাড় জমা' মাছ ধরলে 'জেলেজমা', জমিদারের সাক্ষাৎপ্রার্থনা করলে 'সেলামি', কাচারিতে কোনো কাজে আসলে 'শাসনজমা', অন্য এলাকা হতে জমিদারি এলাকায় বসবাস করলে বা করতে চাইলে 'আগমনী জমা', জমিদার কর্তৃক কয়েদ আদেশপ্রাপ্ত'র 'কয়েদসালামি' এইসব দিতে হত। এমনকি যখন কোনো বিষয়কে জবরদস্তি দফার আওতায় আনা যে তো না, তখন 'বাজে আদায়' নামে একটা খাতে ফেলে খাজনার অর্থ আদায় করা হত! মানে রাজার ইচ্ছা আর কি। এ ছাড়াও কিছু কিছু শাস্তিও ছিল অদ্ভুত ধরনের। যেমন : বুকে বাঁশদলন, খাপড়া দিয়ে নাক-কান মর্দন, নাকে খত, পিঠমোড়া করে হাত বেঁধে বাঁশডলা, বিছুটি লাগানা, শেকল পরানো, কান ধরে দৌড়ানো, কাঁটা মর্দন, দুই হাটে ইঁট চাপিয়ে প্রসারিত হাতে টান রোদে সূর্যমুখী করে দাঁড়িয়ে রাখা, প্রবল শীতে জলে চুবিয়ে রাখা, গাছে বেঁধে টানা দেয়া, গরমকালে ধানের গোলায় বন্দি রাখা, গৃহবন্দি করে শুকনো মরিচপোড়ানি ধোঁয়া দেয়া, জুতাপেটা ইত্যাদি। (সূত্র : পাবনা-সিরাজগঞ্জ প্রজাবিদ্রোহ ; ১৮৭৩, আখতার উদ্দিন মানিক, উত্তরা প্রকাশনা, ৯/১৮ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা ২৮-২৯)।

রাজা মশাইকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ছড়া আরও আছে:

সভায় কেন চেঁচায় রাজা "হুক্কা হুয়া" বলে?
মন্ত্রী কেন কল্‌সী বাজায় ব'সে রাজার কোলে?
সিংহাসনে ঝোলায় কেন ভাঙা বোতল শিশি?
কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসী?
রাজার খুড়ো নাচেন কেন হুঁকোর মালা প'রে?
এমন কেন ঘট্‌ছে তা কেউ বলতে পার মোরে? (বোম্বাগড়ের রাজা, আবোল তাবোল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫)

আরও আছে এরকম রাজকাণ্ডের বয়ান
ঝাঁঝা রোদে আকাশ জুড়ে মাথাটার ঝাঁঝরা ফুঁড়ে,
মগজেতে নাচ্‌ছে ঘুরে রক্তগুলো ঝনর ঝন;
ঠাঠা পড়া দুপুর দিনে রাজা বলে "আর বাঁচিনে,
ছুটে আন্ বরফ কিনে— ক'চ্ছে কেমন গা ছনছন্।"
সবে বলে, "হায় কি হল রাজা বুঝি ভেবেই মলো!
ওগো রাজা মুখটি খোল— কওনা ইহার কারণ কি?
রাঙামুখ পানসে যেন তেলে ভাজা আম্‌সি হেন,
রাজা এত ঘাম্‌ছে কেন– শুনতে মোদের বারণ কি? (নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার, আবোল তাবোল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫)

রাজ্য, রাজা, মন্ত্রী, সান্ত্রি এবং তাদের কর্তব্যসংশ্লিষ্ট দেশ ও তার কারণে দেশবাসীর অবস্থা কী পরিমাণ নাভিশ্বাসে নিপতিত তার আরেকটা প্রকৃষ্ট ব্যঙ্গাত্মক 'আবোল তাবোল'-এর আরেকটি ছড়া, যার শিরোনাম 'গন্ধ বিচার' প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮)

সিংহাসনে বসল রাজা বাজ্‌ল কাঁসর ঘণ্টা,
ছট্‌ফটিয়ে উঠ্‌ল কেঁপে মন্ত্রীবুড়োর মনটা।
বল্‌লে রাজা "মন্ত্রী তোমার জামায় কেন গন্ধ?"
মন্ত্রী বলে "এসেন্স দিছি গন্ধ ত নয় মন্দ।"—
রাজা বলেন, "মন্দ ভাল দেখুক শুঁকে বদ্যি,"
বদ্যি বলে, "আমার নাকে বেজায় হল সর্দি।"...

এইভাবে রাজসভায় নানান সব কাণ্ড হল, যেখানে রাজা মন্ত্রী তন্ত্রী সকলের তথাকথিত সততা দেখা গেল। ঘটনা যা ঘটল তা তাজ্জব এবং স্বাভাবিকও। সুকুমার রায়ের ছড়া যে চিরায়ত তা এখানে খুব স্পষ্ট দাগে চিহ্নিত। এই ছড়ার প্রতিটি লাইন সে আমলের রাজ্যেও যেমন সত্য ছিল, এ আমলের রাজ্যেও তেমনই প্রতিদিনের সত্য। ঠিকই তো স্বয়ং রাজা যেখানে সরাসরি প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন যে, তার গায়ে গন্ধ কেন? তখন মন্ত্রী এসেন্স মাখুন, স্যানেল ও ফাইভ মাখুন বা যে খোশবুই মাখুন-না কেন, রাজার কাছে তা দুর্গন্ধ ঠেকেছে এইটেই বড় কথা। অতএব, রাজাকে জোর করে বোঝাতে যেয়ে তার বিরাগভাজন হবার মতো নিরেট বোকা তো মন্ত্রীমহোদয় হতেই পারেন না। অতএব ডাক বদ্যি, কিন্তু মন্ত্রী যেমন চান রাজা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তেমনই বদ্যিও চান উজির, রাজা দু'জনই তার প্রতি খুশি থাকুন। অতএব, তার সর্দি না হলেও হয়েছে। তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিকল। তা হলে? তাহলে ডাকা হল রামনারায়ণ পাত্রকে, তিনি রাজদরবারের মন্ত্রী, উপদেষ্টা কেউ একজন কেউকেটা হবেন। তিনিও তো অমনই ধামাধরা। অতএব, তার অজুহাত হল, তিনি এইমাত্র নস্যি নিয়েছেন, সুতরাং মন্ত্রীর গায়ের গন্ধ সুগন্ধ নাকি দুর্গন্ধ এই রসায়নবিদগিরি তো তিনি করতে পারবেন না। রাজার ইচ্ছে বলে কথা, যদি রিপোর্ট ভুল হয়? বলা তো যায় না! ডাকা হল কোতোয়ালকে, কিন্তু কোটালের কাজ তো নির্দেশ হলে খ্যাচ করে মানুষের দেহ থেকে মাথাটাকে নামিয়ে দেয়া। এসব সূক্ষ্ম ক্যামিস্টের কাজ তো তার নয়। কিন্তু ঐ যে, রাজার ইচ্ছে বলে কথা। কী করা যায়? তিনি কেবল সুগন্ধি সব মশলা দিয়ে পান খেয়েছেন। এবার ডাকা হল পালোয়ান ভীমসিংকে। তিনি যতই পালোয়ান হোন, বিপদ গুনলেন। এখানে তো গায়ের শক্তির ব্যাপার নয়, বুদ্ধির খেলা। গন্ধ যদি খারাপ বলা হয় রাজা খুশি হবেন, মন্ত্রী রাগ হবেন। আর গন্ধ যদি ভালো বলা হয়, মন্ত্রি খুশি হবেন, রাজা বিরাগ হবেন। অতএব, তার গতরাতে বোখার হয়েছিল তাই গা-টা এখন ঝিমঝিম করছে, ঘুমে ঢুলে পড়লেন তিনি। 'বোখার' শব্দটিকে নিয়ে বেশ বেকায়দায় পড়া গিয়েছিল। অসুখটাকে চিনতে পারছিলাম না, তবে সেটা যাই-তাই ব্যামো নিশ্চয়ই নয়। নইলে পালোয়ান ভীমসিং যাতে গতরাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, যার তোড় এখনও কাটেনি। বোখার-কে খুঁজতে খুঁজতে আমার জ্বর আসার

যোগাড়। এমন সময় উদ্ধার করা গেল, 'বোখার' মানেও জ্বর। এটা আরবি বা ফারসি শব্দ। তো রাতে এসেছিল জ্বর বা মামুলি গা-গরম। এখনকি মন্ত্রীর গায়ের গন্ধ-শনাক্ত করা সম্ভব যে সেটা ভালো না মন্দ! সমস্যার সমাধান আর হয় না। এরপর একে একে রাজামশায়ের শ্যালক বা আইনি ভাইকে ডাকা হল, ডাকা হল জল্লাদকে, নব্বই বছরের বুড়ো নাজিরকে। তারা যথারীতি এক-একজন এক-এক অজুহাত দাঁড় করালেন। শেষে হাজার টাকার বকশিশের শর্তে রাজি হলেন ঐ নবতিপর নাজির যার এক পা মর্ত্যে এক পা স্বর্গে বা নরকে। তিনি শুঁকলেন মন্ত্রীর গা এবং সমস্যার সমাধান হল। নখরামিতে সুকুমার রায়ও কম যান না। তিনি ছড়া শেষ করলেন, ছড়ায় প্রতিপাদ্য সমস্যার সমাধানও করলেন, কিন্তু পাঠক সেটা জানতে পারলেন না! মানে তার রিপোর্টটা কী ছিল সেটা জানার পাঠকতৃষ্ণাকে উস্কে দিয়েই তিনি ছড়াটিকে শেষ করলেন। পাঠকের তো বিষয়টি ওভাবে জানার তখন আর দরকার নেই! কারণ সুকুমার রায় যেটা চেয়েছিলেন, এই ছড়ার মাধ্যমে রাজা-মন্ত্রীর বেহুদা বালখিল্যকে এবং সে কারণে রাজদরবারের তামাশা ও রাজ্যের অপরিণামকে তুলে ধরা, সেটা তো ততোক্ষণে হয়েই গেছে। অতএব ঘেচাং করে ছড়াটি 'শেষ না হয়েও শেষ' হয়ে গেল। অনেক পাঠকই এই পর্যায়ে এসে রাগান্বিত খুশি হয়ে ব্যাটা উপেন্দ্রকিশোর রায়ের পোলাকে বা সত্যজিৎ রায়ের বাপকে বলবেন 'শালা'। একেই বলে চিরকালের সাহিত্য, চিরায়ত-প্রবহমান রচনাকর্ম।

আমাদের সমাজ জুড়ে ঢং-ধরা অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা অসত্যাচারী, যাঁরা সুযোগ, ক্ষমতা, মর্যাদার আসন সব হাতড়ে নেন। যাঁরা স্বঘোষিত জ্ঞানী এবং কেউকেটা, পদাধিকার-বলে বুদ্ধিজীবী।

অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা ফুলো সেই তাঁরা যে সমাজের জন্য, মানুষের জন্য, সত্য ও সুন্দরের জন্য অনিষ্টকর সেই বিষয়টি সিরিয়াসলি সুকুমার রায়ের ছড়ার রঙ্গব্যঙ্গ কটাক্ষ থেকে পার পেয়ে যাবে তা তো হতে পারে না। তাঁর তৃতীয় নয়ন এবং অধিইন্দ্রিয় এক্ষেত্রে যে ষোলআনা জাগ্রত এমন অনেক দৃষ্টান্ত তাঁর সাহিত্যে, বিশেষ করে শিশুসাহিত্যে, আর সুনির্দিষ্ট করে বললে ছড়ায় পাওয়া যাবে অনেক। যেমন:

হাঁড়ি নিয়ে দাড়িমুখো কে যেন কে বৃদ্ধ,
রোদে বসে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ।
মাথা নেড়ে গান করে গুন্ গুন্ সংগীত–
ভাব দেখে মনে হয় না জানি কি পণ্ডিত! (কাঠ-বুড়ো, আবোল তাবোল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯)।

মানে ঋষি-শ্রমণ গোছের ভাবধর পণ্ডিত সদৃশ লোকটার ভেতরের শূন্যতা বিষয়ে হাটে হাঁড়িভাঙা। এখানে, আরেকটা ছড়ার অংশ তুলে দেয়া গেল, লক্ষ করুন ভালোভাবে, এই লোকটা ডাক্তার হবেন, এবং শল্যচিকিৎসক!

একবার দেখে যাও ডাক্তারি কেরামৎ

কাটা ছেঁড়া ভাঙাচেরা চট্‌পট্‌ মেরামৎ।
কয়েছেন গুরু মোর "শোন শোন বৎস,
কাগজের রোগী কেটে আগে কর মক্‌স"। (সাবধান, আবোল তাবোল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪)

ভালোকে চিহ্নিত করতে যিনি সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন তার ভালো বাছাইয়ের জ্ঞানটা কত ধারালো দেখুন। তিনি বলছেন :

গিট্‌কির গান শুন্‌তে ভালো,
শিমুল তুলো ধুন্‌তে ভালো,... (ভালরে ভালো, আবোল তাবোল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২)

গিট্‌কিরি হচ্ছে সুরের বিশেষ সৌন্দর্য বা অলংকার। যখন কোনো গানের বাণী উচ্চারণে খুব দ্রুত স্বরকম্পন ও সুরের দ্রুততার মাধুর্য সৃষ্টিকারী সমন্বয় ঘটে তখন তাকে বলা হয় 'গিট্‌কিরি' তো সেটা হয়তো ভালো। আজকাল অনেক গান আছে তা যেন শোনার বিষয়ের চাইতে বেশি দেখার বিষয়। যিনি/যারা গাইবেন-বাজাবেন তিনি/তাঁরা, মঞ্চসজ্জা, বাতির চমক, ধোঁয়াবাজি এইসব তার ওপর যখন গান তখন গানের চেয়ে বাজনার আধিক্য, নর্তনকুর্দন, চিৎকার, মানে সুর-কম্পন-উচ্চারণদ্রুততা-বিকৃতি সব একাকার হয়ে যায়। এটাকে ঠিক গিট্‌কিরি বলা চলে কিনা? যাইহোক এই ব্যাখ্যার সাথে সুকুমারের বুঝি মিলবে। কারণ এই লাইনটির পরেই তিনি বলেছেন, শিমুল তুলো ধুনতে ভালো। বিষয়টি একেবারেই কটাক্ষ, এবং গিট্‌কিরি না হলেও টিট্‌কিরি। তুলো ধুনলেও ধুনখারায় বোলবিহীন একধরনের কানধাঁধানো শব্দতাণ্ডব ও সুরকম্পন হয় যে, তা অস্বীকার করা যাবে না। কেন বলছি এটি ভীষণ রকম ক্রিটিসিজ্‌ম, শিমুলতুলো ধুনলে তার সবটা উড়ে যাবেই। কারণ জমাটবাঁধা অন্যান্য তুলোকে সাতবার ধুনলে তা যেমন নরম, ফেনায়িত হবে, শিমুলতুলো গাছ থেকে সংগ্রহ করার পরে প্রাকৃতিকভাবেই তার চাইতে নরম-সুন্দর। সে তো ধুনুরির এক ঘা-ও সহ্য করতে পারবে না। নির্ঘাত শিমুলতুলো ধুনা মানে, কম্বলের সব লোম বেছে ফেলা আর কি। অতএব, সমাজে যিনি যে দায়িত্বে আছেন, তিনি সেই দায়িত্বের যথেষ্ট যোগ্য কিনা সেই প্রশ্নই সুকুমার রায় তাঁর 'ভালোরে ভালো'য় তুলে আনতে প্রয়াস পেয়েছেন। যা সব ঠিকঠিক ভালো, তা বলার সাথে সাথে তিনি বলেছেন, নকল, ময়লা, বাঁকা, এসবও ভালো। এই ছড়ায় সবচে মারাত্মক এবং 'চোখে আঙুল দাদা' মার্কা যে পঙ্‌ক্তি, সেটা হল, 'সস্তা ভালো দামীও ভালো/তুমিও ভালো আমিও ভালো,... এই যে তুমিও ভালো, আমিও ভালো এর চেয়ে বড় প্রশ্নে এই সমাজকে ঘা মারা আর হয় না। খুবই তো স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা যে, সমাজে সবই যখন ভালো এবং আমিও ভালো অবশ্যই, ভালো তুমিও! তো এতই যখন 'ভালো'র ছড়াছড়ি তখন সমাজের কোনো শুভ বা ইতিবাচক পরিবর্তন কেন হয় না? অর্থাৎ আমাদেরকে বাহ্যত যেমনটি দেখা যায়, ভেতরে আমরা আসলে তেমনটি নই। হচ্ছে না, সমাজে কালো টাকা সাদা, আইন এক এক জনের জন্য এক এক রকম, অসংগতি, কত কাদাছোঁড়াছুঁড়ি, কত অসত্যাচার, কিন্তু তার কোনো রাষ্ট্রিক বিহিত তো নেই বললেই চলে। সেই সত্য উঠে এসেছে এই 'ভালোরে ভালো' ছড়ায়। কিন্তু যখন সেটা নিতান্ত শিশুদের মতো করে পড়বেন, তখন

খুব সরল কৌতুকের মতো 'জলবৎ তরলং'। এর শেষ লাইনটা তো বাংলাসাহিত্যে খুব পরিচিত, 'কিন্তু সবার চাইতে ভালো– /পাওরুটি আর ঝোলা গুড়।' সহজ কথা, সত্য কথা এবং জীবন থেকে নেয়া সহজলভ্য উপাদানকে উদাহরণ করার জন্যই তো এই জনপ্রিয়তা, এই গ্রহণযোগ্যতা।

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা–
ছায়ার সাথে কুস্তি ক'রে গাত্রে হল ব্যাথা!
ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জান না বুঝি?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেক রকম পুঁজি...
কেউ জানে না এসব কথা কেউ বোঝে না কিছু,
কেউ ঘোরে না আমার মতো ছায়ার পিছু পিছু। (ছায়াবাজি, আবোল তাবোল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩)

ঠিকই তো আমাদের রাজনৈতিক শক্তিগুলো, সমাজের বিভিন্ন পক্ষগুলো, বিভাজিত মূল্যবোধ ও জিদগুলোর প্রায় সবই তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থহীন একগুঁয়েমিতে সময়, শক্তি, মেধা এবং কর্মক্ষমতাকে ব্যয় করে চলেছে। যার জন্য নতুন স্বপ্ন দেখা দূরে থাক, পুরাতন স্বপ্নপূরণের কাছাকাছিও আমরা যেতে পারছি না। অতএব, 'ছায়াবাজি' ছোটদের জন্য নিছক মজাদার হলেও বড়দের জন্য সিরিয়াস একটি ছড়া।

তাঁর 'কিম্ভুত' ছড়াটা বাচ্চাদের জন্য খুব রসালো এবং পুলকছড়ানি মজাদার। কিন্তু সেটা যখন বাচ্চাদের বাবা-কাকাদের, তখন তার ভেতর-বক্তব্য মারাত্মক সোশীয়-পলিটিক্যাল এবং সংসদীয়ভাবে প্রতিবাদী। সমাজে বহুক্ষেত্রে এরকমটাই তো দৃষ্টিগোচর হয়, যিনি সুখে আছেন তিনি সব সুখ একাই হাতিয়ে নিতে চান, যিনি অনেক ক্ষমতাধর, তিনি একাই সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী হতে সচেষ্ট। যিনি আনন্দে আছেন, তিনি সেই আনন্দের প্রাপ্য ভাগ বা নিদেনপক্ষে ছিটেফোঁটাও কাউকে দিতে চান না। কিন্তু তার যে একটা বিপদ আছে, অপরিণামদর্শিতা আছে, সেই সাবধানী উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায় তাঁর এই ছড়াটিতে–

এটা চাই সেটা চাই কত তার বায়না–
কী যে চায় তাও ছাই বোঝা কিছু যায় না।...
একলা সে সব হ'লে মেটে তার প্যাখ্না!
যারে পায় তারে বলে, "মোর দশা দেখ্ না!"
কেঁদেকেটে শেষটায়– আষাঢ়ের বাইশে
হ'ল বিনা চেষ্টায় চেয়েছে যা তাই সে। (কিম্ভুত, আবোল তাবোল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪)

সে কোকিলের মতো সুকণ্ঠী হতে চায়, পাখির মতো ডানা চায়, হাতির মতো দাঁত এবং শুঁড় চায়, ক্যাঙারুর মতো ঠ্যাং চায়, তারপরে সিংহের মতো কেশর, গোসাপের মতো খাঁজকাটা লেজ সব চাই তার। মানে সে সকল ক্ষমতার উৎস হতে চায় এবং তার জন্য মরিয়া। শেষপর্যন্ত আষাঢ়ের বাইশ তারিখে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। তখন সে

স্বাভাবিকভাবেই একই অঙ্গে বহু রূপের অসমন্বয়ে এক কিম্ভুতকিমাকার বিসদৃশ জানোয়ার বা প্রাণী! প্রথমত সে সব পাওয়ায় আনন্দিত বটে। কিন্তু সমস্যা হয়ে গেল বাস্তব-ক্ষমতাচর্চায়। মানে এক বৈশিষ্ট্যকে উপভোগ করতে চাইলে তা আরেক বৈশিষ্ট্যের জন্য অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। সে তো একাধারে কোকিল, শিল্পী-পাখি, হাতি, ক্যাঙারু, সিংহ, গোসাপ, মানে সবকিছু। তখন দেখা গেল তার ক্যাঙারু অঙ্গ তিড়িং করে লাফ দিলে হাতি-অঙ্গের জন্য সেটা বিশেষ অসুবিধাজনক, আবার হাতি অঙ্গ যখন কলাগাছ খায় ক্যাঙারু তখন ঘেন্না-অরুচিতে বাঁচে না, ঐরাবতী বিশাল হস্তিদন্তের মুণ্ডকে তো মেনে নিতেই পারে না তার কোকিল কণ্ঠ যখন গান গায়! মানে মহাবিপদ! আরও আছে সমস্যা, পাখি-অঙ্গ উড়লে হাতির দেহভার সে সইবে কেন? মানে সকল ক্ষমতার একটা জগাখিচুড়ি, ফলত একটা লেজে-গোবরে অবস্থা। আমাদের সমাজে এমন অনেক ক্ষমতাধরের উদাহরণ আছে, নিজেই সব, দলের প্রধান, দেশের প্রধান, হাজারটা কমিটির প্রধান, অনেকগুলো মন্ত্রণালয়ের প্রধান— তার ওপরে আরও কত শখের সভাপতিত্ব-প্রাধান্য। তখন তো তিনি ক্ষমতাকেই কেবল কুক্ষিগত করেছেন, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এবং তখন তো ঐ যে 'কিম্ভুত' প্রাণীটা তার অবয়ব, চারিত্র্য, আকৃতি, হাবভাব সব বিলিয়ে তাকে কোনো নামও দেয়া যাচ্ছে না, প্রটোকলও দেয়া যাচ্ছে না। মানে পাখিও না, পশুও না, পাখিও আবার বাচ্চাও দেয়, ক্যাঙারুও আবার শুঁড়ও আছে হাতির মতো! তখন তাকে মানুষে বলে :

কেউ যদি তেড়ে মেড়ে বলে তার সাম্‌নেই
"কোথাকার তুই কেরে, নাম নেই ধাম নেই?
জবাব কি দেবে ছাই, আছে কিছু বলবার?
কাঁচুমাচু ব'সে তাই, মনে শুধু তোলপাড়– (প্রাগুক্ত)

এই যখন বাস্তব অবস্থা, তখন সব ক্ষমতা ভোগকারী বা সবকিছু হতে পারায় সফল প্রাণীটির খেদোক্তি শুনুন :

"নই ঘোড়া, নই হাতি, নই সাপ বিচ্ছু
মৌমাছি প্রজাপতি নই আমি কিচ্ছু।
মাছ ব্যাং গাছপাতা জলমাটি ঢেউ নই,
নই জুতা নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই (প্রাগুক্ত)

শেষপর্যন্ত তার শিক্ষা বা লজ্জা হল বটে। কিন্তু সমাজের তো ততোদিনে বারোটা বাজা সারা।

'চিনলে জড়ি না চিনলে বনের খড়ি' এমন ছড়া তো তাঁর আরও আছে। যেখানে বাচ্চাদের জন্য মজা আর বড়দের জন্য সমাজের অসংগতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ। যেমন 'আবোল তাবোল'-এর এই ছড়াটি, যার কোনো শিরোনাম নেই, যা তাঁর ছড়াসমগ্রতেও নেই, কিন্তু 'সমগ্র শিশুসাহিত্য : সুকুমার রায়'-এ আছে ৯ পৃষ্ঠায়।

মাসি গো মাসি পাচ্ছে হাসি

নিম গাছেতে হচ্ছে শিম–
হাতীর মাথায় ব্যাঙের ছাতা
কাগের বাসায় বগের ডিম ॥...

মানে লক্ষ্মী ছেলের মতো 'মাথি দানো' করে মাসির কাছে ইঁচড়ে কাঁচার সারল্যে বলা বটে, কিন্তু ডেঁপোর কী একশেষ দেখুন : সমাজের অসংগতিকে ধরা আর কাকে বলে! নিম গাছে শিম্ আর হাতির মাথায় ব্যাঙের ছাতা মানে কী? (মূলে ব্যাঙের ছাতা তো বর্ষায়-রোদে ব্যাঙদের কাজে আসে না, ও তো আসলে মাসরুম) মানে যেখানে যা হবার কথা নয় সেখানে তা-ই হচ্ছে, যেখানে যার থাকার না সেখানে সে-ই থাকছে, যা ঘটার নয় তাই ঘটছে, যা হবার নয়, হচ্ছে। অর্থাৎ সমাজের একেবারে কান্তাছাড়া অবস্থা। মানে খাড়া কটাক্ষ আর কি! ধন্যি বাপের ছেলে, ধন্যি ছেলের বাপ বটে সুকুমার রায়।

সবে হল খাওয়া শুরু, শোন শোন আরও খায়–
সুদ খায় মহাজনে, ঘুষ খায় দারোগায়।
বাবু যান হাওয়া খেতে চড়ে জুড়িগাড়িতে,
খাসা দেখ 'খাপ খায়' চাপ্‌কানে দাড়িতে।
তেলে জলে 'মিশ খায়' শুনেছ তা কেও কি?
যুদ্ধে যে গুলি খায় গুলিখোর সেও কি? (খাইখাই, আবোল তাবোল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১)।

রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে খাঁটি সমাজচিত্র। সাহিত্যে, বিশেষ করে সুকুমার রায়ের ছড়াসাহিত্যে রঙ্গব্যঙ্গ একাধারে অস্ত্র এবং কৌশল। নইলে এত সহজে কি নিজেরই বসবাসের সমাজে দাঁড়িয়ে মহাজন 'সাহেব' আর দারোগা 'বাবু'র বুকে অমন উপযুক্ত ছোরা সেঁধিয়ে দেয়া যায়? মহাজনের দাদনের কারবার যে কতভাবে বাঙালির পারিবারিক সমাজজীবনকে বিষিয়ে তুলেছে আর দারোগাবাবু বা আইনের ধারকেরা যে কতভাবে সাধারণ নাগরিকের হেনস্থার কারণ, তার মতো প্রবহমান জীবনসত্য তো আর হয় না। সেই ব্রিটিশ আমলে তিনি এই ছড়া এঁকেছেন, এই ছবি লিখেছেন। মানে হল এ তার সমকালের আগেরও চিত্র, তাঁর কালে তো এইটেই, তাঁর নাতির আমলের সমান-সত্য। অতএব, তাঁর ছড়া তো চিরায়ত সাহিত্য হবেই হবে। হাওয়া খেতে যান জুড়িগাড়িতে চেপে, তার মধ্যেও সমাজছবির বৈমূর্ত্য রয়েছে। এত টানাটানির যে সমাজ, তাতে শখের বাতাস খাওয়াটা কী করে আসে, যাদের আসে তাদের কিভাবে আসে? প্রশ্ন না? নিশ্চয়ই প্রশ্ন!

আর ঐ 'এক যে ছিল সাহেব তাহার/গুণের মধ্যে নাকের বাহার' সেই সাহেব ব্যাটা বড় ধড়িবাজ এবং তার গাধাকে অর্থাৎ সেবককে ছলনায় ভুলিয়ে, তার জ্ঞানের অল্পতাকে পুঁজি করে বিনা পারিশ্রমিকে খাটিয়ে নিতে চান সে তো খুব সহজেই অনুমান করা যায়।

এই না বলে ভীষণ ক্ষেপে
গাধার পিঠে বস্‌ল চেপে
মুলোর ঝুঁটি ঝুলিয়ে নাকে।

আর কি গাধা ঝিমিয়ে থাকে?
মুলোর গন্ধে টগবগিয়ে
দৌড়ে চলে লম্ব দিয়ে—
যতই ছোটে 'ধরব' ব'লে
ততই মুলো এগিয়ে চলে! (অসম্ভব নয়! আবোল তাবোল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২)

এখানে সাহেব বলতে ইংরেজ সাহেব, সময় অবশ্যই ব্রিটিশ আমল। আর তো কিছু অনুষঙ্গ লাগে না। ছোটদের জন্য হাসির ছড়া হলেও বড়দের জন্য বিষয়টি মোটেই তা নয়। এই ছড়ার জন্য যে ছবিটি এঁকেছিলেন সুকুমার রায়, তাতেও দেখা যায়, গাধার পিঠে হ্যাট মাথায় স্যুটেড ব্যুটেড এক ইংরেজ। তার নাকটার ডগা এতটাই লম্বা যে, সেটা পৌঁছে গেছে গাধার মুখের সামনে। সাহেব সেই নাকের ডগায় ঝুলিয়েছেন একগাছি মুলো। গাধা হা করে ছুটছে। বলাই বাহুল্য সে-ও ছুটছে, মুলোও ছুটছে। এটা মনে হয় নিউটনের (১৬৪২-১৭২৭) প্রথম সূত্র যে, বস্তুর ওপর বলের লব্ধি শূন্য হলে থামা বস্তু থেমেই থাকবে অথবা চলমান বস্তু সমগতিতে চলতেই থাকবে। অতএব, গাধা আর মুলোকে ধরতে পারবে কেন। ফাঁকি দেয়ার বুদ্ধিতে, ঠকানোর বুদ্ধিতে সাহেবের সাথে সরলমতি গাধা বেচারি কেন পারবে? পাঠক নিশ্চয়ই জানেন ইংরেজদের রূপকথার সাহিত্যে লম্বা নাকের একটা মাজেজা আছে, তারা হল মিথ্যুক ডিজনি ওয়াল্ট-এর বিখ্যাত চরিত্র পেনোকিও যখন একটা মিথ্যে কথা বলেছিল, তখন তার নাক লম্বা হয়ে গিয়েছিল। সেই সে থেকে ইংরেজ-দুনিয়ায় অতিরিক্ত নাক-লম্বাকে 'মিথ্যেবাদী' ভাবার কুসংস্কার রয়েছে। বলাই বাহুল্য এই বিষয়টি আলবৎ জানা ঠিল সুকুমারের। উল্লেখ্য যে, এখন ইংরেজসমাজে নাকলম্বাকে নানা সোশীয়-পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। (যেমন আমেরিকায় একটি নারীঘটিত ব্যাপারে তখনকার চলতি দায়িত্বের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন আদালতে দাঁড়িয়ে অসত্যাচার করেছিলেন বলে তাঁকে নিয়ে একটা কার্টুনচিত্র বেরিয়েছিল, যাতে দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট সাহেবের নাক ভীষণ লম্বা)।

কাজের দায়িত্বে যাঁরা বসে আছেন চেয়ার দখল করে, তাঁরা যে কাজ করতে অকাজ বা ন-কাজই বেশি করেন, তা তাদের মুখ দিয়েই সুকুমার রায় আপোসে বলিয়ে নেন। রসিকতার এই এক আশ্চর্য সুবিধা।

দশটা কাজে লাগি কিন্তু আটটা করি মাটি,
ষোল আনা কথার কিন্তু সিকি মাত্র খাঁটি।
লম্ফঝম্ফ বহুৎ কিন্তু কাজের নেইকো ছিরি–
ফোঁস করে যাই তেড়ে– আবার ল্যাজ গুটিয়ে ফিরি।
পাঁচটা জিনিস গড়তে গেলে, দশটা ভেঙে চূর–
বল্ দেখি ভাই কেমন আমি সাবাস বাহাদুর! (কাজের লোক, খাই খাই, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪)

বোঝাই যাচ্ছে, ব্যাখ্যা করার তো দরকার দেখিনে। কাজের নামে এমনই অকাজ যে তা না করাই ভালো। কেননা তার সামাজিক প্রভাব বিয়োগান্তক। লাভ করতে যেয়ে মূল হারানো। আরেকটা যে সমাজচিত্র আছে, আমাদের সমাজের ক্ষমতাধর ধড়িবাজ কেউকেটা যারা, তারা প্রায় পুরোটা অসত্যকে ভিত্তি করে টিকে আছে বলে ওপরে ওপরে যতই তেজি চোটপাট থাক না কেন, ভেতরে তারা দুর্বল এবং ভীতু। ফলে তেজি লোকটাও বেকায়দায় পড়লে বা অবস্থা শক্ত বুঝলে ফণা নামিয়ে লেজ গুটিয়ে ফেলেন। এবং সাধারণ এসব অন্তরের কাদর্য্য লেখক নিজে বলেন বা অন্য কাউকে দিয়ে বলান। কিন্তু এই 'কাজের লোক' ছড়াটিতে সুকুমার রায়ের কৌশলটা বেশ মজার এবং সাহসী। তিনি যার দোষ তাকে দিয়েই বলাচ্ছেন। মানে নিজের স্বীকারোক্তি, অন্য আর কাকে ধরবেন! বিশেষ করে ছড়াকারের আর কী দোষ! অর্থাৎ মানুষটাকে রসিক আর তীক্ষ্ণধী বলতে হবে। মানে তাকে দিয়েই তাকে জাত করা। তাঁর কোনো একটা ছড়ায় এরকমটা আছে রাজা অথবা হুজুরের জন্য অন্যরা শিরিষ কাগজের বিছানা পরিপাট করে দিচ্ছে। বুঝুন রসিকতা এবং সাহসের কী বলিহারি!

ইঁদুর দেখে মাম্‌দো কুকুর বল্‌লে তেড়ে হেঁকে–
"বলব কি আর, বড়ই খুশি হলেম তোরে দেখে।
আজকে আমার কাজ কিছু নেই সময় আছে মেলা,
আয় না খেলি দুইজনাতে মোকদ্দমা খেলা।
তুই হবি চোর, তোর নামেতে করব নালিশ রুজু"–
"জজ কে হবে?" বল্‌লে ইঁদুর, বিষম ভয়ে জুজু,
"কোথায় উকিল প্যায়দা পুলিশ বিচার কিসে হবে?"
মাম্‌দো বলে, "তাও জানিস্‌নে? শোন্‌ বলে দেই তবে।
আমিই হবো উকিল হাকিম, আমিই হব জুরি,
কান ধরে তোর বলব, 'ব্যাটা ফের করেছিস চুরি?'
সটান দেব ফাঁসির হুকুম অম্‌নি একেবারে–
বুঝবি তখন চোর বাছাধন বিচার বলে কারে।" (বিচার, অন্যান্য কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩)

মজা মানে কী সিরিয়াস ব্যাপার ইঁদুর-কুকুরের জবানিতে রূপকভাবে না বলিয়ে ছড়াকার নিজে বল্‌লে নির্ঘাত আদালত অবমাননার দায়। বুদ্ধি আছে বলতে হবে 'ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানি না'র! কুকুর-ইঁদুরে কথোপকথন, তারা মকদ্দমা-মকদ্দমা মানে কোর্ট-কাচারি খেলবে। ইঁদুর হবে চোর যার নামে মামলা রুজু। কিন্তু ইঁদুরের প্রশ্ন হল বিচারকটা কে হবেন! যথাযথ উকিল, পেয়াদা, পুলিশ তো লাগবে। কারণ চার্জশিট, সাক্ষী, শুনানি, জেরা, আর্গুমেন্ট এসবের ব্যাপার আছে না? নইলে 'কিসে', মানে কিভাবে, কিসের ওপর ভিত্তি করে ট্রাইব্যুন্যালটা চলবে? খুবই মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন। বিচার পাবার এবং বিচার করার

স্বাধীনতার প্রশ্ন। তো? তো একাই উকিল, হাকিম এবং জুরি হবে এবং চুরির দায়ে রায় দেবে 'ফাঁসি'!

মানে আমরা সবাই সেয়ানা এবং নিজে ভালো হই বা না- হই ভালোর অবস্থানটাকে দখলে রাখতে এতটুকু পিছপা নই। দেখুন সিদ্ধান্ত যেহেতু দিচ্ছে কুকুর, তার স্বচ্ছ বুদ্ধি, সাহস, অবস্থান সবই যখন ইঁদুরের চাইতে অনুকূলে তখন তিনি, ইঁদুরকে বানাবেন চোর এবং তাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর রায় দেবার জন্য তিনি মানে কুকুর সাহেব একাই হবেন উকিল, হাকিম এবং জুরি! বিচারব্যবস্থা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের দশাটা তাহলে কি সহজেই বোধগম্য নয়? এবং চিত্রটা সত্যার্থে কি পশুপ্রাণীদের জগতে, নাকি মানুষের সমাজে? অবশ্য মানুষও এক ধরনের প্রাণী। এই আর কি তারা নিজেকে বুদ্ধিমান, সৎ এবং সেরা বলে দাবি করে, অন্যরা সেই দাবিটা করে না। অথচ ব্যাপারটা কিন্তু এমন হতে পারত যে, কুকুর নিজে চোর হয়ে ইঁদুরকে উকিল, হাকিম এবং জুরি বানাতে পারত! ওদিকে পেয়াদা-পুলিশের প্রশ্নটি কিন্তু অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। মানে সোজা হিসাব– ক্ষমতা ও গায়ের জোর যখন ইঁদুরের তুলনায় কুকুরের বিসদৃশভাবে আকাশ পরিমাণ বেশি, তখন তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, স্বায়ত্তশাসিত (?) বিচার বিভাগ, গভর্নমেন্ট প্রসিকিউটর, এইসব পদ গ্রহণের লোভটা কেন সামলাবেন।

বোঝা নিশ্চয়ই গেল যে ছড়াকার কী সাহসী বুকের পাটায় সমাজের কোন বিষয়কে একেবারে সরাসরি দেখিয়ে দিয়েছেন। এবং কুকুর ইঁদুরকে শেষপর্যন্ত এ-ও শাসাচ্ছে যে, 'বুঝবি তখন চোর বাছাধন বিচার কাকে বলে।' তো সে চোর যে চোরই হোন না কেন, ফাঁসির যখন রায়, তখন তিনি বাঙালির 'মুলো চোর' না হয়েই যান না।

রাজা, অর্থাৎ প্রশাসনব্যবস্থা যেন সুকুমারের এক নম্বর নিশানা। কতভাবে যে তিনি রাজরাজবার এবং তার পরিষদ ও আমলাদের গোষ্ঠীর নিকুচি করেছেন তা বলার নয়।

রাজার হাতি মেজাজ ভারি হাজার রকম চাল;
হঠাৎ রেগে মটাৎ ক'রে ভাঙ্‌ল গাছের ডাল।
গাছের মাথায় চড়াই পাখি অবাক হ'য়ে কয়–
"বাস্‌রে বাস! হাতির গায়ে এমন জোরও হয়"!
মুখ বাড়িয়ে ব্যাং বলে, "ভাই, তাইত তোরে বলি–
আমরা, অর্থাৎ চার-পেয়েরা এম্নিভাবেই চলি"॥ (বড়াই, অন্যান্য কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬)

রাজার হাতি বলে কথা, গরিবের হাতি হলেই যেখানে মোটা-তাগড়া-উঁচু-লম্বা, সেখানে রাজার হাতির তেজ তো অমন হবেই। তার তো খানা-খান্দান-নির্ভয়ের অভাব নেই, অতএব বীরেশ্বর বীর সে। চাপ্সে ব্যাং একটু বাহাদুরি আর ভূয়ো আভিজাত্য খাটিয়ে নিল আর কি। ঠিকই তো, তারও চার পা, হাতিরও চার পা, তাহলে নৃবংশে তারা তো একই জাতি-গোষ্ঠী। চামচা আর সুযোগ-সন্ধানীর যে অভাব নেই আমাদের সমাজে, সেই সত্যকেই তো বলা।

এখানে হাতিটাকে 'রাজার হাতি' না করলেও হত। কিন্তু ঐ কথাটা জুড়ে দিয়ে একটি প্রাকৃতিক ঘটনাকে রাজনৈতিক করে তোলা। এবং ব্যাঙকে প্রতীক হিসেবে আনাটা ছড়ার নির্মিতিতে মুন্‌শিয়ানা বটে। নইলে হাতি রাজারই হোক আর প্রজারই হোক রেগে গিয়ে বা শান্ত মেজাজেই একটা গাছের শাখা মটাৎ করা ভাঙা তার জন্য তো কোনো ব্যাপার নয়।

পুরাতন কালে
ছিল দুই রাজা,
নামধাম নাহি জানা
একজন তার
খোঁড়া অতিশয়,
অপর ভূপতি কানা।...
প্রতাপের কিছু
নাহি ছিল ত্রুটি
মেজাজ রাজারই মতো,
শুনেছি কেবল
বুদ্ধিটা নাকি
নাহি ছিল সরু তত।
ভাই ভাই মত
ছিল দুই রাজা,
না ছিল ঝগড়াঝাঁটি,
হেনকালে আসি
তিন হাত জমি
সকল করিল মাটি।
তিন হাত জমি
হেন ছিল তাহা
কেহ নাহি জানে কার,
কহে খোঁড়া রায়
"এক চক্ষু যার
এ জমি হইবে তার।"
শুনি কানা রাজা
ক্রোধ করি কয়,
আরও অভাগার পুত্র,
এ জমি তোমারই
দেখ না এখনি

খুলিয়া কাগজ পত্র ।”
নক্সা রেখেছ
একশো বছর
বাক্সে বাঁধিয়া আঁটি,
কীট কূটমতি
কাটিয়া কাটিয়া
করিয়াছে তারে মাটি;
কাজেই তর্ক
না মিটিল হায়
বিরোধ বাধিল ভারি,
হইল যুদ্ধ হদ্দ মতন
চৌদ্দ বছর ধরি ।
মরিল সৈন্য,
ভাঙিল অস্ত্র
রক্ত চলিল বহি,
তিন হাত জমি
তেমনি রহিল
কারও হার জিত নাহি ।...
তার চেয়ে জমি
দান করে ফেল
আপদ শান্তি হবে ।”
কানা রাজা কহে,
“খাসা কথা ভাই
 কারে দিই কহ তবে ।”
কহেন খঞ্জ,
“আমার রাজ্যে
আছে তিন মহাবীর–
একটি পেটুক,
অপর অলস,
তৃতীয় কুস্তিগীর ।
তোমার মুলুকে
কে আছে এমন
এদের হারাতে পারে?–

সবার সমুখে
তিন হাত জমি
বকশিশ্ দিব তারে ।”
তারপর ক্রমে
রাজার হুকুমে
গোলমাল গেল থেমে,
দুই দিক হতে
দুই পালোয়ান
আসরে আসল নেমে!
লম্ফে ঝম্ফে
যুঝিল মল্ল
গজ-কচ্ছপ হেন,
রুষিয়া মুষ্টি
হানিল দোঁহায়
বজ্র পড়িল যেন! (কানা-খোঁড়া সংবাদ, অন্যান্য কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬, ২৭) ।

রাজা দু'জন কানা আর খোঁড়া হওয়ায় কোনো অসুবিধা ছিল না । শাসনব্যবস্থার ধরনের কারণে যে কোনো ব্যবস্থাতেই কিন্তু এমন অনেক বড় বড় পদাধিকারীকে দেখা যায়, যিনি কানা নন, খোঁড়া নন, ররং পুরো তাগড়া-তুগড়ো সুস্থ হবার পরও অথর্ব, ঠুঁটো জগন্নাথ । সেই জন্য দেখা যাচ্ছে এখানে মাত্র তিন হাত জমি নিয়ে দুই রাজার প্রচণ্ড মেধাক্ষয়, রেষারেষি এবং টানা ১৪ বছর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ । মানে 'বিনাযুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী'র মতো অবস্থা । এই সূচাগ্র মেদিনীর শ্লোক-পঙ্‌ক্তিটি হয় মহাভারতের না হয় রামায়ণের হবে, মনে নেই । যাই হোক এত তো যুদ্ধবিগ্রহ, তাতে কারোরই হার বা জিত হল না, অতএব তিন হাত জমির মালিকানা পেলেন না কেউ! রাজাদের মেজাজমর্জি, মূলত ও জমি তো আর তাদের নয়, তিন হাত হোক আর তিন বিঘে হোক, ও জমির মালিক তো আসলে জনগণ । তো কী করা? তখন খোঁড়া রাজা কানা রাজাকে উপদেশ দিলেন, তারচেয়ে এক কাজ করো, আপদটুকু কাউকে দান করে দাও, ল্যাঠা চুকে যাক । রবিঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) একটা পঙ্‌ক্তি আছে, 'যে জমি লইয়া এত হানাহানি/সে কাহার আজি তাও না জানি/কোথা রাজা আর কোথা রাজধানী চিহ্ন নেইকো তার ।' এটা কি দুই বিঘা কবিতার লাইন? মনে পড়ছে না, তবে এ যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজাকটাক্ষ তাতে কোনো বেখেয়াল বা সন্দেহ নেই ।

পরে তো দুই রাজার একই ধরনের লোকদের মধ্যে কে পাবে-র নামে আসলে ইন্টারভিউ হল সে-ও পেটুক, কুস্তিগির আর আলসের ভীষণ যুদ্ধই বলতে হবে । কুস্তিগিরে-কুস্তিগিরে প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধ, পেটুকে-পেটুকে খাওয়ার প্রতিযোগিতা আর অলসে-অলসে আলসেমির পাল্লা ।

কিন্তু কেউই স্পষ্টভাবে হার-জিতের অবস্থানে আসতে পারেন না, 'কেহ নাহি হারে-জেতে সমানে সমান'। তখন বিরক্ত হয়ে কানা রাজা আক্ষেপ করেন–

কানা রাজা বলে
"এ কি হল জ্বালা,
আক্কেল নাই কারো,
কেহ কি বোঝে না
সোজা কথা এই,–
হয় জেতো নয় হারো।" (কানা খোঁড়া সংবাদ, প্রাগুক্ত)

যাইহোক শেষপর্যন্ত 'কুঁড়ে-কুল-চূড়ামণি' কানা রাজার আলসে নাগরিক পেলেন সেই তিন হাত জমি! শুধু জমিই নয়, তার সাথে তার কুঁড়েমির বিস্ময়কর ক্ষমতার জন্য আরও অনেক টাকাকড়ি। পুরো ঘটনা অনেক মজার, দুই কুস্তিগিরের মল্লযুদ্ধ, দুই পেটুকে বেশি খাবার প্রতিযোগিতা (দু'জনেই সমান সমান সাড়ে তিন মণ করে, চল্লিশ সেরে এক মণ, খেয়েছিলেন, খাবার পরে তাদের ওজন করে সেটা সাব্যস্ত হয়েছিল)। যা হোক ঘটনাগুলো অনেক মজার, সেজন্য ১৫৬ লাইনের ২৩৪ টুকরো পঙক্তির ছড়া দ্রষ্টব্য, খুব মজা আছে সেখানে এবং সেরা বিচারে সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রহসনও আছে প্রচুর। রয়েছে ছোটদের জন্য মজা আর বড়দের জন্য ইশারা। মানে ক্ষুদেদের কাতুকুতু, বৃহৎদের চপেটাঘাত। সুকুমার রায় যে তাঁর ছড়া গদ্য'য় কেবল রাজা-রাজনীতি, জমিদার, পণ্ডিত ও ক্ষমতাধরদের হেস্তনেস্ত করেছেন তা-ই নয়, তিনি পৌরাণিক দেব-দৈত্য-দানব-মানব-রাক্ষসদের গোমরও কম ফাঁক করেননি। বিশেষ করে তাঁর নাটিকাগুলোয় প্রযুক্ত ছড়া-পদ্যে এ বিষয়গুলো লক্ষ করা যাবে। তিনি কবি-ভাবুক-দার্শনিক বাবুদেরকেও কমে ছাড়েননি। তবে এসব ক্ষেত্রে কারুকে পার্সোনালাইজ্‌ড করা তাঁর ছড়াসাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ নয়। তিনি বরং সমাজকে আঁকতেই এদেরকে হালকা বা ভারির ওপর খুব মানানসই কুশীলব হিসেবে গ্রহণ বা নির্বাচন করেছেন। এই দিকটাকে এই লেখার বিষয় হিসেবে নেয়া হয়নি। তবু দু-চারটে সাক্ষ্যছড়ার অংশ এখানে উপস্থাপন করা যায়। বিশেষ করে বাঙালিসমাজে লেখাপড়া জানা শিক্ষিত লোকেরা নানা বিষয়ে যতটা প্রশ্নবিদ্ধ, লেখাপড়া না-জানা শিক্ষিত লোকেরা যে তারচাইতে অনেক কম প্রশ্নবিদ্ধ বা তুলনায় প্রায় প্রশ্নবিদ্ধ নয়ই, সেই সত্যকেই সুকুমার রায় তুলে আনতে চেষ্টা করেছেন।

সম্পাদক বেয়াকুব কোথা যে দিয়েছে ডুব
এদিকেও হায় হায় ক্লাবটি যে যায় যায়
তাই বলি সোমবারে মদ্‌গৃহে গড়পারে
দিলে সবে পদধূলি ক্লাবটিকে ঠেলে তুলি।
রকমারি পুঁথি যত নিজ নিজ রুচি মত।
আনিবেন সাথে সবে কিছু কিছু পাঠ হবে

— করজোড়ে বারবার নিবেদিছে সুকুমার ।

সুকুমার রায়ের যে 'ননসেন্স ক্লাব' ছিল, একবার তার অনুপস্থিতিতে সদস্যদের কাছে নোটিশ আকারে পোস্টকার্ডে ছাপা হয়ে ছড়া গিয়ে পৌঁছুল । কী ঠ্যাটামি! প্রথমে সম্পাদককে একহাত নেয়া হয়েছে, শেষে আবার বিনীত নিবেদক তিনিই অর্থাৎ সুকুমার । এদেরই পত্রিকা ছিল 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' । তো প্রশ্নও বটে, ধারণাও করা হয় যে, যেহেতু সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে এই নোটিশ ছড়ার ছাপানো পোস্টকার্ড গিয়েছিল সবার কাছে, এবং তা সুকুমারের জবানিতে হওয়া সত্ত্বেও কি সুকুমারেরই লেখা, নাকি অন্য কোনো 'ননসেন্স'-এর? লেখার ধাঁচ বলে এটা ননসেন্স প্রতিষ্ঠাতা সুকুমারের কম্ম । এই ধরনের আরও ছড়া আছে, লেখাপড়া বা লেখাপড়া-জানা বাবুদের ধুতির কোচ ঢিলা কিংবা পুরোটা আলগা করে দিতে সমাজের স্বার্থে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেননি তিনি ।

লোকে কয় কাঁঠাল সে পাকে নাকি কিলিয়ে?
বুদ্ধি পাকিয়ে তোলে লেখাপড়া গিলিয়ে! (পাকাপাকি, খাই খাই, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১) ।

এম্নি আমার জেদ, যখন অঙ্ক নিয়ে বসি,
একুশবারে না হয় যদি, বাইশ বারে কষি । (কাজের লোক, খাই খাই, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪) ।

ঘুচবে জ্বালা পুঁথির পালা ভাবছি সারাক্ষণ—
পোড়া স্কুলের পড়ার পরে আর কি বসে মন?
দশটা থেকেই নষ্ট খেলা, ঘণ্টা হতেই শুরু
প্রাণটা করে 'পালাই পালাই' মনটা উড়ু উড়ু– (ছুটি, অন্যান্য কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১)

তিন বুড়ো পণ্ডিত টাকচূড়ো নগরে
চড়ে এক গাম্‌লায় পাড়ি দেয় সাগরে ।
গাম্‌লাতে ছেঁদা ছিল আগে কেউ দেখনি,
গানখানি তাই মোর থেমে গেল এখনি ॥ (ছড়া, ছিটেফোঁটা, অন্যান্য কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩)

মানে বাঙালির জীবনে যে সিস্টেমে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া, তা যে কখনোই আনন্দদায়ক নয় সেই কথাটা বলতে চাওয়া । এই একই সুর করুণ প্রতিবাদী স্বরলিপিতে ক্রন্দিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জবানেও । তিনি তো বলা যায় লেখাপড়ার জন্য প্রতিষ্ঠানমুখো হনইনি । সে দিক দিয়ে অবশ্যি সুকুমার অনেক 'গুড বয়' । যদিও তিনি দইয়ের চাঁদিতে ছেনি মারতে একেবারে ওস্তাদ । তাঁর মতে পাকার অযোগ্য বা পাকতে চায় না যে কাঁঠাল, তাকে কিলিয়ে পাকানো আর বুদ্ধিকে পাকানোর জন্য বিদ্যে গেলানো একই অপরিণামদর্শিতা । আবার যখন কোনো শিক্ষার্থীকে একটা অঙ্ক কষতে ২১ বার ব্যর্থ হয়ে বাইশ বারের বার উত্তর মেলে, তখন 'একবার না পারিলে দেখ শতবার'-এর জন্য ঐ শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ । কিন্তু সত্য বলতে কি অঙ্কটি শিক্ষার তুলনায় কত বেশি বোঝা কথা কি সেইটেই নয়? সেজন্য তাঁর 'ছুটি' ছড়ায়

স্কুলের পড়ালেখা যে কী বিরক্তিকর তার মূল্যায়ন মেলে। স্কুলশুরু মানে ১০টা হতেই খেলা নষ্ট। স্কুলকে বলা হচ্ছে 'পোড়া স্কুল' আর প্রাণটা তখন 'পালাই পালাই'। কটাক্ষটা কিন্তু এইসব বিদ্যাপীঠের যাঁরা সিদ্ধান্তগ্রাহক সেইসব জ্ঞানী-পণ্ডিতের ওপরেও যাচ্ছে প্রায় সরাসরিই। আর তিন বুড়ো পণ্ডিত মানে কী, পণ্ডিত তো বটেই, 'বুড়ো' মানে ঢের অভিজ্ঞ। তো তাঁরা একটা গাম্‌লায় চড়ে বসলেন সাগরপাড়ি দেবেন বলে। মানে ব্যঙ্গ করে মূল্যায়ন। একে গামলায় চড়ে সাগরজয় সম্ভবই নয়, তাতে এক গামলায় তিনজন, তার ওপরে আবার সেই গামলার তলি ফুটো! আর ফুটো যে আছে, তা যথাসময়ে ওনারা কেন টের পাবেন, ওঁরা পণ্ডিত যে! কী রকম সোনার ছুরি বিঁধিয়ে যে দেন, লোকটা সুকুমার, বলার নয়। বটে ট্যাটন-রসকে।

'ছুটি' নামে সুকুমার সেনের আর একটা ছড়া আছে সেটিও ঐ, 'অন্যান্য কবিতা'তেই। এখানে কী বিরূপাক্ষিক রসিকতা এবং সমাজবীক্ষণ দেখুন—

মনের খুশি রয়না মনে হেসেই লুটোপুটি।
ঘুচলো এবার পড়ার তাড়া অঙ্ক কাটাকুটি
দেখ্‌ব না আর পণ্ডিতের ঐ রক্ত আঁখি দুটি।
আর যাব না স্কুলের পানে নিত্য গুটি গুটি (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬)

মানে পণ্ডিত যে শিক্ষার্থীকে চোখ রাঙাতেন, তিনি যে ছাত্রের পিঠে তেলেপাকা জোড়া বেত ভাঙতেন সে-ও যে পড়াশুনোর জন্য ত্রাসের উদ্রেককারী একটা বিষয় সেটাও এখানে বলা হল। এবং অঙ্কের 'কাটাকুটি' বলতে কাটাকাটি নিয়মের ঐকিক বা সরল অঙ্ক নয়, এখানে বরং সেই অঙ্কের কথা বলা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীর তুলনায় সুকঠিন, বারবার কষতে হয় এজন্য যে, বারবারই ভুল হয়। অর্থাৎ বহুবার তার কাটাকুটি। আরও একটা-দুটো উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে।

একদা নিশীথে এক সম্পাদক গোবেচারা।
পোঁটলা পুঁটুলি বাঁধি হইলেন দেশছাড়া ॥
অনাহারী সম্পাদকী হাড়ভাঙা খাটুনি সে।
জানে তাহা ভুক্তভোগী অপরে বুঝিবে কিসে?...
(অর্থাৎ লেখকদল লাঠ্যৌষধি শাসনেতে।
বসায়েছে তার পুনঃ সম্পাদকী আসনেতে ॥)
ঘুচে গেছে বেচারীর ক্ষণিক সে শান্তি, সুখ।
লেখকের তাড়া খেয়ে সদা তার শুষ্কমুখ ॥ (সম্পাদকের দশা, অন্যান্য কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬)।

সম্পাদকও নিশ্চয়ই একধরনের পণ্ডিত, আর লেখকেরা তো অবশ্যই-অবশ্যই (এ ক্ষেত্রে কারো দ্বিমত থাকতেই পারে) অভিজ্ঞতার জোরে। কিন্তু তা নিয়েও বিস্তর বিতর্কের সুযোগ আছে। 'বিতর্ক' কিন্তু 'তর্ক' নয়। বেশি ব্যাখ্যার দরকার নেই। সম্পাদকের হাল এবং তাঁর

প্রতি লেখকদের আচরণ। ব্যস। কথা তো এই, এবং কেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নয়, একেবারে সোজা-সাপটা। অতএব, ধন্য বাবা সুকুমার, বাপের ছেলে, ছেলেরও বাপ! সত্যি, এমনটি সহজে হয় না, বাঙালি এ নিয়ে নিশ্চয়ই গৌরব করতে পারে।

লোকটি কেমন পেঁজোমির পা-ঝাড়া এবং যাকে বলে ধেনো মশকরা দেখুন, ঠাট্টার ছলে প্রহসন কাকে বলে। সংসদীয় কৌশলে ফাজলামি বলেই ছ্যাবলামি নয়, একেই বলে সাহিত্য বা লেখালেখির শিষ্টাচার।

মন্দ নয়, সে পাত্র ভাল
রঙ যদিও বেজায় কালো,
তার উপরে মুখের গঠন
অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতন।
বিদ্যে বুদ্ধি? বলছি মশাই
ধন্যি ছেলের অধ্যবসায়!
উনিশটি বার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল হয়ে থাম্‌ল শেষে
বিষয় আশয়? গরীব বেজায়
কষ্টে সৃষ্টে দিন চলে যায়।
মানুষতো নয় ভাইগুলো তার
একটা পাগল একটা গোঁয়ার;
আরেকটি সে তৈরি ছেলে,
জাল করে নোট গেছেন জেলে।...
কিন্তু তারা উচ্চ ঘর
কংসরাজের বংশধর। (সৎ পাত্র, আবোল তাবোল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২)।
বাপরে কি ডানপিটে ছেলে!
শিলনোড়া খেতে চায় দুধভাত পেলে!
একটার দাঁত নেই, জিভ দিয়ে ঘ'ষে,
একমনে মোমবাতি দেশলাই চোষে! (ডানপিটে, আবোল তাবোল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭)
রুচি নাই আমিষেতে, রুচি নাই পায়েসে
সাবানের সুপ আর মোমবাতি খায় সে।
আর কিছু খেলে তার কাশি ওঠে খক্‌খক্,
সারা গায়ে ঘিন্‌ঘিন্, ঠ্যাং কাঁপে ঠক্‌ঠক।
একদিন খেয়েছিল ন্যাকড়ার ফালি সে।
তিন মাস আধমরা শুয়েছিল বালিশে। (ট্যাঁশ গরু, আবোল তাবোল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯)।
গাধাটার বুদ্ধি দেখ! চাঁট মেরে সে নিজের গালে,

কে মেরেছে দেখবে বলে চড়তে গেছে ঘরের চালে। (ছিটেফোঁটা, অন্যান্য কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩)।

এগুলোর আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এর মধ্যেও মানবিক এবং সামাজিক বিষয়-আশয় রয়েছে। তবে সমাজচিন্তাসহ রস-টসটসা এই ব্যাপারগুলো মাথার মধ্যে খেলতে যে একটা জবর রকম মাথা লাগে, বলতে চাইছি যে সেই রকম মাথা সুকুমার রায়ের ঘাড়ে ছিল। তার জন্য বাঙালি হিসেবে শ্লাঘায় বাঁচি না। একেবারে বাতাসের গলায় ফাঁসি এঁটে দেয়ার মতো সাহিত্যবিজ্ঞানী বটে মানুষটা। তাঁর ছড়ায় সামাজিক-মানবিক দিকের শুমার নেই। নারী-অধিকার, মা-মহিমা এসব নানান বক্তব্য রয়েছে মূল বিষয় কিংবা অনুষঙ্গ হয়ে। তাছাড়া তাঁর অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা, উপমা, উদাহরণ শব্দছাঁদে রয়েছে অপরিমেয় উচ্চমান কাব্যরুচি। তাঁর অসংখ্য সাধারণ অন্ত্যমিলের পাশাপাশি মুন্‌শিয়ানাসমৃদ্ধ যে অন্য রকম মিলের শিল্পকারু রয়েছে, তাঁর দিকে খেয়াল করলে অনুমান করতে পেরে অবাক হতে হয় যে, কী বিপুলবিস্ময়ী শব্দভাণ্ডারি হলে তবেই না বাক্যরুচি অনুসারে অমন সহজেই সহজ শব্দ বাছাই করাটা সম্ভব। ছন্দের ভাঙচুর তিনি যে খুব একটা করেছেন তা বোধহয় নয়। কিন্তু তার ছান্দসিক শব্দবুননের যে ফুলতোলা শাড়ি, তাতে উচ্চারক জিহ্বা এবং শ্রবণকারী কানের স্বরপছন্দের এমন তাল-লয়ের সমন্বয় যে, ছড়াশিল্পী হিসেবে তাঁকে প্রণতি না জানিয়ে পারা যায় না।

তাঁর ছড়াকে 'ছড়া' করে তুলতে, কঠিনকে সহজ করে তুলতে, ভারিকে হালকা বোধগম্য করে তুলতে সহজীকরণে তাঁর ছড়াক্ষমতাকে নিপুণ মমতায় প্রয়োগ যে করতে হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। তবু তা-সব কখনোই তাঁর বলার-লেখার অভ্যাসবৈশিষ্ট্য থেকে স্খলিত নয়। যেন সবসময় হালকা চালে ভারি কথা।

গভীর ব্যঞ্জনাকে আলতো করে ধরা এবং রীতিমতো সিংহকে জালে আটকে ফেলা। মানে যত একচিলতেই হোক আর চাঁইসদৃশ একপাটাই হোক, সোনা চিনতে তো কষ্টিপাথরের ভুল হয় না। সুকুমার কি সেরকমই একটা পাথর নন?

১১.০৬.২০১৫

তথ্যনির্দেশ

১। সমগ্র শিশুসাহিত্য, সুকুমার সেন, সম্পাদক সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু, প্রকাশক: দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, দশম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৯৫

২। ছড়াসমগ্র, সুকুমার রায়, প্রকাশক: সাহিত্যমালা, ৩৪/২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, একুশে বইমেলা ২০০৭

৩। কৃতজ্ঞতা স্বীকার সোহেল মল্লিক।

[লেখক: ছড়াশিল্পী ও শিশু-কিশোর সাহিত্যিক। একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।]

লুৎফর রহমান রিটনের ছড়ায় বার্তামূল

বি ল্লু ক বী র

শিরোনামের 'বার্তামূল' শব্দটি একটা প্রশ্নের উদ্রেক করাতে পারে। না-ও পারে। ধরে নিচ্ছি কারো কারো কাছে একটি প্রশ্ন জাগবে যে, মূলত 'বার্তামূল'শব্দটি কী? তা এরকম একটা সমূহ সম্ভাব্য প্রশ্নকে অমীমাংসিত রেখে সংশ্লিষ্ট আলোচনাকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা, কিছুটা মনোবিপত্তি সৃষ্টি করতে পারে। একটা যুক্তি দাঁড় করানো যেতে পারে যে, সেই দায় পুরোটা লেখকের নয়। পাঠক তো সহজেই একটু অভিধান দেখে নিতে পারেন। পারেন, সে কথা যে একেবারেই ভাবিনি, তা নয়। কিন্তু 'বার্তামূল'কে তো ডিকশনারিতে ঠিক পাওয়া যাবে না। অতএব, এই পথে গেলে সম্মানিত পাঠকের কিছুটা বিরক্তভাজন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই ঝুঁকির সম্ভাবনা থেকে কিছুটা আত্মরক্ষার প্রয়াসেই ধান না-ই ভানতে শিবের গীতের উপস্থাপন। কারণ হল এই শব্দটি অনেকটাই স্বকৃত বা চিন্তার বোধে স্থিরীকৃত দুটো শব্দের একীকরণ। ইংরেজিতে যাকে বলে ম্যাসেজ, তাকেই আমি 'বার্তামূল' অভিধায় শব্দায়িত করতে চেয়েছি। এটা কোনো পাণ্ডিত্য জাহির নয়, বা আজকাল যে, যে-সে-ই দু-চারটে শব্দ বানাতে প্রয়াস পাচ্ছেন, তেমন কোনো প্রভাবিত শব্দচর্চাও নয়। এই কথাগুলো বলে নিলে আলোচনাটা করা এবং পড়া দুটোই সুবিধাজনক হবে বলে বিশ্বাস করার অনেক সাহিত্যবাস্তবতা রয়েছে। উক্ত ম্যাসেজের একটা অনুভবানুকূল বাংলা খোঁজাখুঁজি যে করিনি তা নয়। কিন্তু মনের মতো কিছু পাইনি। পাইনি যে, সেটা আমার মনোবৈকল্য হতে পারে, আবার নিজের দোষ স্বীকার করছি, শব্দবিষয়ে খুঁতখুঁতানিও নিশ্চয়ই হতে পারে। তবে আমার কাছে মনে হয় 'ম্যাসেজ' আর 'নিউজ' যেমন একই নয়, ঠিক তেমনিই বলতে চাওয়া বিশেষ কথাটি আর 'বার্তা' একই কথা নয়। ম্যাসেজ কি তাহলে মঙ্গলবার্তা? 'মঙ্গলবার্তা' আর 'সুখবর' কি খুব ফারাকে অবস্থিত? ভেবেছি কম নয়। ম্যাসেজের একাডেমিক বাংলা মনে হয় 'সংবার্তা'। মঙ্গলবার্তা, উপদেশন, বার্তাভাস, এসবের কোন্‌টা আমাদের কাঙ্ক্ষিত শব্দের মাহাত্ম্যের কাছাকাছি? আমার তো একটাও পছন্দ হয়নি। তবে 'সংবার্তা'কে বিবেচনায় রেখেই তিনটে জোড়াতালি দেয়া শব্দ বানাতে প্রয়াস পেয়েছি। মঙ্গলবার্তা, বোধিবার্তা আর বার্তামূল। মঙ্গলবার্তা টেকেনি, কারণ ম্যাসেজ মৌলিক অর্থে সন্দেশ বা সুখবর। তা সেটা ভালো যেমন হতে পারে, তেমন খারাপও হতে পারে। বোধিবার্তা অনেকখানি মন কাড়ে, যা

চেতনা থেকে উৎসারিত। মানে মন তাকে মঙ্গলবার্তার তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য বলে সমর্থন করে। কিন্তু সে-ও আসলে 'ভালো'র মতোই, বোধিশক্তিতে যা প্রাপ্ত, তা তো অমঙ্গলজনক কিছু হতে পারে না। অর্থাৎ সে-ও আসলে 'মঙ্গলবার্তা'ই বটে। শেষমেশ 'বার্তামূল'কেই আমার ভাবনা-অনুভবের কাছাকাছি ম্যাসেজের যথার্থ প্রতিশব্দ মনে হয়েছে। মানে কোথাও বেশি কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলা হলেও তার মধ্যে একটা আসল কথা বা নির্দেশনাকে যে আঁচ করা যায়, সেইটেই আসলে ম্যাসেজ। অর্থাৎ মূলকথা বা বার্তামূল। যা সবসময় মানবিক অনুধ্যানের বহিঃপ্রকাশ না-ও হতে পারে। বরং সেটা বলতে চাওয়া কথা, তা ভালো, খারাপ বা ভালো-মন্দের মাঝামাঝিও হতে পারে। তবে ম্যাসেজ স্বভাবত মানবিকতা এবং মঙ্গলের দিকে মনোনির্দেশ করে। এ অনেকটা অ্যাবরিভিয়েশনের বাংলা যথাশব্দ 'মুণ্ডমাল বাক্য'র মতো। মুণ্ডমাল বা হ্রসকৃত শব্দ বা যাকে বলে Abbreviation, বাক্য এইজন্য বললাম যে, তা সংক্ষিপ্ত শব্দসদৃশ হলেও আসলে তো শব্দটি কমপক্ষে দুইটি শব্দেরই সমাহার।

কোনো আলোচনার আগা-মাথা বাদ রেখে আচমকা 'ম্যাসেজ' নিয়ে এই সাতকাহনের দরকারটা কী, এই প্রশ্ন এতক্ষণে নিশ্চয়ই জাগরিত হয়েছে। হতেই পারে। স্বাভাবিক। কোথায় ছড়ার আলোচনা, আর কোথায় এই নিরস প্যানানি! প্যানানি হলেও এ ঠিক 'প্যানপ্যানানি' নয়। প্যানপ্যানানি অনেকের মতে মশাও করে! এত রেখে মশা উড়োপোকাটির কথা মনে পড়ার একটা কারণ আছে। তার উদ্দেশ্য হল হুল ফোটানো এবং রক্তপান। এ হচ্ছে ভূমিকার আঁইটাঁই। মানে হচ্ছে, রীতিমতো প্রতিশব্দ নিয়ে একটা কাটাছেঁড়ার পূর্বাভাস। মাঠে নামার আগে অনেকটা ওয়ার্ম-আপের মতো। সেই কাটাছেঁড়া বা ওয়ার্ম-আপের মূল প্রতিপাদ্য হল লুৎফর রহমান রিটনের ছড়া। একক্ষণে অরিন্দম...। পাঠকের নিশ্চয়ই ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। দুঃখিত।

ছড়া নিয়ে একটা-দুটো গদ্য লিখে এর আগে আমার যে অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে এমন প্রশ্নের তীর ঘায়েল করার জন্য আমার দিকে তেড়ে আসতেই পারে। কারণ এত ছড়াকারের মধ্য থেকে লুৎফর রহমান রিটন কেন! উত্তরটা আগেই দিয়ে রাখি, রিটন নয়ই-বা কেন? অন্য কাউকে নিয়ে লিখতে বসলেও কি সেই একই প্রশ্নের সুযোগ থাকত না? মানে আমার উত্তরটাও একটা জিজ্ঞাসা হয়ে গেল। কী আর করা, এক বৈঠকেতো আর সবাইকে নিয়ে লেখা যাবে না। আর সবাইকে নিয়ে আমি লিখবই-বা কেন! তবে হ্যাঁ, ভালো দৃষ্টিকোণ থেকেও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হতেই পারে যে, অন্য কেউ বা কেউ কেউও নয় কেন? সেই প্রশ্ন আমারও। আমার সব প্রশ্নের জবাব তো আমারই কাছে থাকার কথা নয়। তবে ইচ্ছে আছে ছড়াকে গদ্যের বিষয় বা উপজীব্য করে নিজেকে খননশ্রমিকে নিয়োজিত করা, যতটা পারা যায়। কিন্তু সেই ইচ্ছাটা আমাদের সবাইকে করতে হবে। কেননা ছড়া এবং ছড়াকার বাংলাসাহিত্যে যেমনি প্রাচীন, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু বাস্তবতা হল, এতদসত্ত্বেও আমাদের গদ্যসীমানায় আলোচ্য ছড়া খুব বেশিরকম উপক্ষিত বা আলোকসম্পাতের বাইরে। এই সত্য ছড়া তথা বাংলাসাহিত্যের সবচে মূলশাখার জন্য ক্ষতিকর। ছড়া নিয়ে আমাদের

গদ্যসাহিত্য যত সমৃদ্ধ হতে পারত সেটা হয়নি, হবার ভালো ক্ষেত্রনির্মিতিরও যে খুব একটা লক্ষণ দেখা যায় বাস্তবতাটি তেমনও নয়। আলোচ্য শাখায় গদ্যের কেন এই বন্ধ্যাত্ব, ছড়ার কেন এই পোড়াভাগ্যি সেটি প্রাসঙ্গিক হলেও অন্য অধ্যায়। অতএব, সেই বিস্তর ভূমি কর্ষণের জন্য আলাদা হালচাষের কৃষক যে লাগবে তা আপাতসান্ত্বনা হলেও অসত্য নয়।

দুই.

লুৎফর রহমান রিটন বা তাঁর ছড়া, গদ্যের বিষয় হিসেবে যোগ্য ঢের আগেই। বর্তমান বাংলাসাহিত্যে যাঁরা ছড়া লিখছেন, তাঁদের আরও কেউ কেউ এই সম্মানে অভিষিক্ত হবার নিশ্চয়ই যোগ্য। কিন্তু তিনি বা তাঁরা, তাঁর বা তাঁদের ছড়া যে কেন সেভাবে গবেষকদের গদ্যের উপাদান হয়ে ওঠেনি তা ভাবনার বিষয়। আবার এমনও হতে পারে, সেই কর্তব্যকাজটিকে সচেতনভাবেই লেখালেখির বাইরে রাখা হয়েছে। কেন? এরই অনেকগুলোর মধ্যে একটি কারণ হতে পারে যে, কে যায় ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে! খামাখা কারো কিংবা অনেকের বিরাগভাজন হবার বোকামি কেন করা! অনেক গদ্যকার মনে করেন, ওমুককে নিয়ে লিখে তাঁর সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়ার দরকারটা কী! আবার উল্টোদিকেও সমস্যা আছে, যাঁকে নিয়ে লিখব, তিনি যেহেতু একজন ছড়াকার বা কবি বা অন্য কোনো সাহিত্যদিকের কুশীলব, সেহেতু তিনি খুব স্পর্শকাতর। তার মধ্যে নারীর সৌন্দর্য-স্বীকৃতি-প্রত্যাশা এবং শিশুর অভিমান বিদ্যমান। লেখক অনেকটা রাজনৈতিক দলের মতো, তিনি সমর্থক পছন্দ করেন, সমালোচক নয়। আর তাঁর যাঁরা ভক্তপাঠক আছেন, তাঁরাও ছড়াবিষয়ক গদ্যকারের বিপদের কারণ হতে পারেন। কেননা তাঁদের প্রিয় ছড়াকার বা কবিকে নিয়ে যে গদ্য, তাতে যে কেবল ঐ লেখকের ধন্য-ধন্য রবই উঠবে তা তো নয়। তাঁর বিষয়ে মূল্যায়ন করলে কিছু কিছু কথা তো আসবেই যা উক্ত পাঠকের চিন্তার বা পছন্দের অনুকূলে যাবে না। মানে, কিছু বিরূপ মূল্যায়ন-মন্তব্য তো আসবেই আসবে। তখন বেচারা গদ্যকার সংশ্লিষ্ট ছড়াকারের বিরাগভাজন তো হবেনই, তাঁর ভক্তপাঠকরাও রে-রে করে তাঁর দিকে তেড়ে আসতে পারেন যে : ব্যাটা গবেষক, তুই বেশি বুঝিস। তো এই ঝামেলায় তিনি কেন পড়বেন! আবার তিনি যে ছড়াকারকে যা নয় তাই বড় অথবা যা নয় তাই ছোট করে তুলবেন, সেটাও নীতিগতভাবে পারেন না। অতএব, ছড়াসাহিত্যের বিষয়ে আমাদের গদ্যের সমৃদ্ধি আর ঘটল না, অন্তত এখন পর্যন্ত ঘটল না। এইসব ভয় এবং সম্ভাব্য 'কে কী বলে'র দ্বিধাকে বিবেচনায় রেখেই এই লিখতে বসা। এতে বোধহয় প্রমাণ হয় যে, ছড়াকার হিসেবে, ছড়ার জন্য সময় দেয়া ও মেধাক্ষয়ের জন্য ইতোমধ্যে বর্তমান বাংলাসাহিত্যে অন্য কয়েকজনের মতো লুৎফর রহমান রিটনেরও একটা ভিত্তি ও অবস্থান গড়ে উঠেছে। তাঁর প্রতি আমার দুর্বলতা এবং সমর্থন রয়েছে এবং সেটা একটু বেশিই। নইলে তাঁর আগে লেখার বিষয় হিসেবে অন্যকোনো ছড়াকারকে নির্বাচন করতে পারতাম।

এখন এই প্রশ্নটা করা দরকার যে, যে বিবেচনাতেই হোক বাংলাসাহিত্যের জীবিত কয়েকজন ছড়াকারের মধ্য থেকে লুৎফর রহমান রিটনকে যে এখানে উপজীব্য করা হয়েছে তা ভালো কথা, কিন্তু কেন তাঁর ছড়ার বার্তামূল বা ম্যাসেজকে প্রধান সম্পাদ্য করা হয়েছে? হয়েছে এজন্য যে, পুরো অধ্যয়ন না করেও রিটনকে মোটামুটিভাবে পাঠ করেছেন, এমনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, অধ্যয়ন আর পাঠ একই শ্রমচর্চা নয়। অধ্যায়ন হচ্ছে গভীর অনুসন্ধিৎসু অনুধ্যান নিয়ে খননকৌশলে পাঠ। আর পাঠ কেবলই পড়ে যাওয়া। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমি কি লুৎফর রহমান রিটনকে যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছি? জবাব দেব না, বোকামি হবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রিটনের ছড়ার বহুরৈখিক চারিত্র্য রয়েছে, বহুমুখিতা রয়েছে। রয়েছে নানান দিকনির্দেশনার বৈভিন্ন্য। তাঁর ছড়াকে প্রথমে মোটাদাগে দুইভাগে ভাগ করা চলে। শিশুতোষ এবং বুড়োতোষ। বুড়োতোষের মধ্যে আবার বুড়োব্যাজারেরও অনেক সোসিও-পলিটিক্যাল উপাদান বিদ্যামান রয়েছে। বলা-ভঙ্গি এবং বিষয়-শ্রেণিকরণের দিক দিয়ে বিভাজনমালা গাঁথতে গেলে দেখা যাবে, তাঁর ছড়ায় বাংলার চিরায়ত লোকাচার, লোকবিশ্বাস, মিথ, রূপকথা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতীয়তাবোধ, প্রকৃতি, প্রতিবাদ, বিলাপ, শিশুপ্রেম, দেশাত্মবোধ, মাতৃবন্দনা, আপত্যস্নেহ, আহ্বান, ধর্মচেতনা, স্যেকুলার-মাহাত্ম্য, প্রাণী-ভালোবাসা, মানবতা, কৃষি, দ্রোহ ইত্যাদি নানান বিষয়বস্তু। এখন এতসব বিষয় নিয়ে তাঁর ছড়ার সামস্তিক তত্ত্বতল্লাশি করতে যাওয়াটা প্রচেষ্টা হিসেবে হয়তো ভালো। কিন্তু তেমন একটি সর্বমুখী কাজ সীমিত পরিসরে করতে গেলে তা অসম্পন্ন হতে বাধ্য। সবদিক থেকে তাঁর ছড়ার পূর্ণতাকে অন্তর্বীক্ষণে আনতে গেলে তার জন্য যে সঠিক পরিমাণ গদ্যক্ষমতা থাকাটা দরকার, সত্যি বলতে সে ক্ষেত্রে নিজের ঘাটতি সহজেই অনুমান করতে পারি। এরও অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : যে ধরনের কাজ অনেকগুলো হলে পর, সেগুলোকে বরাতরচনা হিসেবে নিয়ে একটি সম্পন্ন রচনার জন্য নিজেকে নির্মাণ করা যায়, রিটনকে নিয়ে সেই মাপের অনেকগুলো কাজ এখনও হয়নি। সেই রকম একটি বোধ থেকে এই লেখা ঐ রকম কোনো বড় মাপের রিটন-অভিসন্দর্ভের সামান্য সহায়কি উৎসমন্থনের প্রয়াস মাত্র। এটি রিটন বিষয়ে কেবল অসম্পন্ন রচনাই নয়, বরং কিছু বিরক্তিকর, সাথে সাথে তা কারো কারো জন্য বিরাগেরও কারণ হতে পারে। এবং, এবং বিষয়টি খুব ভালো করে জানা সত্ত্বেও কোত্থেকে যেন আমিই আমাকে সাহস যোগাতে পেরেছি কাজটিতে হাত দেয়ার জন্য। এখানে যে সকল মূল্যায়ন-মতামত প্রতিফলিত, এর সাথে সবাইকে, কাউকে বা অনেককে যে একমত হতেই হবে এমন দাবি আমার নয়। মতের অমিল খণ্ডাবার ক্ষেত্রেও আমার কোনো জবরদস্তি নেই। এ একান্তই আমার মতামত, আমার দায়। হতে পারে অংশত হাতি দেখেই কানার বয়ান করার মোহ। কিন্তু তবুও একটা মোহ বা মুগ্ধতাতো বটে!

যে কথা বলেছিলাম, তাহলে বিষয়ের ব্যাপক চারিত্র্যবৈচিত্র্যিক ধরনগুলোকে যখন এই লেখার আওতায় আনা সম্ভব নয়, তখন কী করা? এটি মনে হয় ভাবনাচিন্তামূলক অপ্রচলিত ধরনের লেখার জন্য মনস্থির করার জরুরি একটা ব্যাপার । এই রকম একটা দ্বিধা-দোটানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভেবে দেখলাম তার অধিকাংশ ছড়ায় একটা উদ্বুদ্ধকারক বক্তব্য রয়েছে। যার ভেতরে মঙ্গলনির্দেশনা বিদ্যমান। যাকে আমি বলেছি 'বার্তামূল'। একে অন্তর্বাতা, মঙ্গলবার্তা, বোধিবার্তা বললেও কোনোনা-কোনোভাবে মানিয়ে যায়। একাডেমিকভাবে যাকে বলে 'সংবার্তা'। বুঝতে সবচেয়ে সুবিধাজনক হয় 'ম্যাসেজ' বললে। তবে 'মূলবার্তা'ও কম যথাযাথ নয়। হ্যাঁ, লক্ষ করলাম যে, রিটনের প্রায় সব ছড়ায় একটা ঐ রকম ম্যাসেজ রয়েছে। যা অবশ্যই কোনো ছড়ার বা ছড়াসমগ্রের কল্যাণকর চর্চানুশীলন এবং প্রধান উদ্দেশ্যও বটে। যার মধ্যেই আসলে ছড়াকারকে, ছড়াকারের দৃষ্টির সম্মুখশক্তিকে এবং পেছনে তাকানোর সাহস ও অনুসন্ধিৎসাকে পরিলক্ষ করা যায়। এবং এই পরিলক্ষ করলে, তাতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যায়। এক হচ্ছে, ছড়াকারকে চেনা বা তুলে ধরা, আর দুই হচ্ছে , ছড়াকে অনুধাবণ করা এবং তার মাধ্যমে প্রাপ্ত হীরে এবং কয়লাকে আহরণ করা। এই প্রাপ্তিতে কয়লাও কম মূল্যবান নয় যে, তা আঁচ এবং আলো দুটোই দেয়। এবং হীরে যে মূল্যবান, তা-ও আসলে কয়লারই তো দেয়। অতএব, রিটনের ছড়ার অসাধারণ কিছু কিছু পঙ্‌ক্তি– তার মর্তবা অনেক। কিন্তু তাকে মর্তবাসমৃদ্ধ করে তুলতে তাঁর অসংখ্য সাধারণ যে পঙ্‌ক্তি, তার ম্যাসেজও নেহায়েৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। যে কোনো আলোকে মহিমান্বিত করে তুলতে তার চারপাশের অন্ধকারের ভূমিকা যে অনেক বেশি, এমনকি প্রধান, তা তো আর অস্বীকার করা যায় না।

লুৎফর রহমান রিটনের ছড়াকে গভীর বীক্ষণে আনলে সবসময়ই যে আশানুরূপ সম্পদ আহরণ করা যায় তা সর্বৈবভাবে ঠিক নয়। সে ক্ষেত্রে সাহিত্যমন্থনের বিচারে তিন ধরনের সমস্যাপরম্পরা বিদ্যমান থাকতে পারে। সে জন্য সাহিত্য-গবেষণায়, বিশেষ করে কাব্যসাহিত্য গবেষণায় চিরদৃঢ়ভাবে শেষ কথাটি বলে দেয়া চলে না। তিন ধরনের যে সম্ভাব্য-সমস্যার কথা বলছিলাম, তা হল যখন কোনো ছড়ায় আশানুরূপ কোনো ভাবোপাচার মিলছে না, যা হৃদয়কে, সাহিত্যবোধকে পুষ্টি দিতে পারে, তখন বুঝতে হবে যে, পাঠক বা গবেষক সেখানে দাঁত বসাতে পারছেন না, অথবা কবি পাঠকের যোগ্য করে তা বোঝাতে অক্ষম হয়েছেন, অথবা আসলেই সেই পঙ্‌ক্তিতে গভীর কোনো বক্তব্যদ্যোতনা নেই। তো পাঠকের যোগ্য করে তুলে ধরার যে সার্থকতা বা ব্যর্থতা রিটনের তা সত্য। তাঁর ছড়া ব্যবচ্ছেদে পাঠক-গবেষকের সর্বদা দাঁত বসানিতেও কিছু কিছু অক্ষমতা থাকতে পারে। কিন্তু এই দুটির বাইরে আর যে একটি নেতিবাচক গুণ রিটনের কোথাও কোথাও আছে– তা নিয়ে কথা বলার সুযোগ রয়েছে। তবে 'ননসেন্স রাইম' যে ছড়ার একটি সৌন্দর্য, সে কথা আমি অবশ্যই ভুলে যাচ্ছি না। খোলাখুলিভাবে বললে, এই রচনা পাঠের পর পাছে তা পাঠকের কাছে, বা রিটনভক্তদের কাছে, কিংবা স্বয়ং লুৎফর রহমান রিটনের কাছে উপেক্ষার বোঝায় পরিণত হয়,

সেই আশঙ্কায় পূর্বাভাস হিসেবে এইটুকু বলা-বক্তব্য এখানে গ্রন্থিত হওয়া দরকার বলে মনে করি। এখন যার জন্য যেটুকু ভালো লাগার সেটুকু গ্রহণ এবং যেটুকু ভালো না-লাগার, সেটুকু বর্জন করলেই ল্যাঠা চুকে যায়। আমার প্রতি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হবার কষ্টটুকু আর করা লাগে না।

তিন.

আমাদের সাহিত্যে জীবনী, সমালোচনা, বিশ্লেষণ, পরিচিতি এসব লেখার ক্ষেত্রে একটা আটপৌরে ধরন বা বন্ধ্যা উর্বরতা আছে। স্বভাবত এইভাবে লেখা হয় যে, ওমুক, এত সালে, ওমুক জায়গায়, অত তারিখে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর পিতার নাম, মাতার নাম, লেখাপড়া, কর্মজীবন বিদেশভ্রমণ, পুরস্কার, স্ত্রী ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি। মানে ধনাত্মক আনুকূল্যের মোহে একটু যেন বাড়িয়ে বলা, অন্তত যেন কম না হয় একটুও। এই রকম দরকারি-অদরকারি সাতকাহন। তো আমি লুৎফর রহমান রিটনের ছড়াকে চাক্ষুষ করতে করতে তাঁকে মূল্যায়ন করতে সেই গতানুগতিকতার দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার প্রয়াস পাব। তা কারো কাছে ন্যাকামি বা বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। চাই কি আমাকে তুচ্ছতায় প্রতিপন্ন হতেও হতে পারে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য-বিষয়ে যে নিজের কাছে আমি পরিষ্কার, সেইটেই আমার গোঁ বা এক-রোখ। এবং এটা ঠিকঠাক অনুভবের মধ্যে আছে বলেই যতটুকু সাহস দরকার তার যোগান নিজের ভেতর থেকে পেয়েছি। আর যতখানি ভীতু বা সাবধান হওয়াটা প্রয়োজন, তার সংকুলানও পেয়েছি নিজেরই ভেতর থেকে। অতএব, 'পাছে লোকে কিছু বলে'র বাঁধন ছিঁড়েছি ঢের আগে।

প্রথমে মনে রাখা কর্তব্য যে, এই লেখার আওতায় রিটনের ২০টি গ্রন্থকে নেয়া হয়েছে। যা একান্ত ছোটদের বা কিশোরদের ছড়াগ্রন্থনা। সাধারণত এভাবে কেউ দেখেন না যে, তিনি ঐ সমগ্রভুক্ত গ্রন্থগুলো কাদেরকে উৎসর্গ করেছেন। মনে হচ্ছে তো যে, তার অত দরকারটাই-বা কী? কিন্তু ভালো করে দেখতে গেলে উৎসর্গের ব্যক্তিবিষয় এবং পৃষ্ঠাগুলো তো সংশ্লিষ্ট বইয়েরই অংশ। এবং আমার বিবেচনায় তার মধ্যদিয়ে লেখকের মেজাজ, রুচি, মূল্যবোধ, আনুগত্য, প্রত্যাশা, দৃষ্টিভঙ্গি, ঘরানা ইত্যাদির একটা সুস্পষ্ট আঁচ পাওয়া যায়, এবং তার মূল্য অনেক বেশি। কেননা এর মাধ্যমেই লেখক এবং লেখকের বলা-বক্তব্য পাঠকের মধ্যে সংক্রমিত হতে শুরু করে। বাঙালি লেখকের অন্তরান্তস্তলের একটি চিরায়ত প্রবণতা আছে। তিনি স্বভাবত তাঁর প্রথম বই উৎসর্গ করেন তাঁর বাবা-মা-সন্তানকে। তারপরে পরিজন বা অন্যান্যকে। লুৎফর রহমান রিটন সেই মূলধারার বাইরে নন। দ্বিতীয় পর্বে যাঁদেরকে বই উৎসর্গ করা হয় তাঁর প্রিয়-শ্রদ্ধেয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জীবিত। রিটনের ক্ষেত্রেও বাঙালি লেখকৈতিহ্য পুরোমাত্রায় লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে এবং বাইরে বই বা বইয়ের কোনো অংশ যাঁকে বা যাঁদেরকে উৎসর্গ করা হয়, তিনি বা তাঁরা কোন্ ঘরানা এবং মূল্যবোধের মানুষ, সেটা দিয়ে আলবৎই একজন লেখকের জাতীয় চেতনা এবং ব্যক্তিক

মূল্যবোধকে সহজেই অনুধাবন অর্থে চাক্ষুষ করা যায়। যা সাধারণ পাঠককে সহযোগিতা করে যে, লেখক তাঁর কতটুকুন পছন্দীয় হবেন, কতটুকুন আনুকূল্য পাবেন। সর্বোপরি তাঁর লেখার মান-সৌন্দর্য-মনোহারিত্ব-প্রতিপাদ্য এসব তো এক্ষেত্রে বিবেচ্য হিসেবে রয়েছেই। এইসব একাগ্র ধীচেতনার সমৃদ্ধি দিতে পেরেছেন বলেই রিটন ছড়াকে বা নিজেকে বিশাল পাঠকসমাজের কাছে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। ছড়া যদি লেখা-পড়া-কাটার মাধ্যমে ছড়াবার বিষয়ও হয়, তাহলে সেক্ষেত্রেও কি রিটন যথেষ্টই সফল হননি? এবং তা একান্তই তাঁর ছড়ার চেতনার একাগ্রতার জন্য?

এই লেখায় তাঁর যে 'ছড়াসমস্ত'কে নেয়া হয়েছে, সেটা তাঁর শিশু-কিশোরদের জন্য বাছাই করা ছড়াবইয়ের গ্রন্থনা। তবে বড়দের জন্য হওয়া সত্ত্বেও ছোটদেরও কিংবা ছোটদের-বড়দের সকলের ধরনের কিছু রাজনৈতিক ছড়া রিটন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিচক্ষণতার সাথে এই বইয়ে ভুক্তির জন্য মনোনীত করেছেন। এর বাইরে গ্রন্থভুক্ত অনেক ছড়া রয়েছে, যেগুলোকে লুৎফর রহমান রিটন কেবল শিশু-কিশোরদের উপযোগী বিবেচনা করলেও তা যুগপৎভাবে বড়দেরও। বড়দের সব ছড়া নিশ্চয়ই ছোটদেরও নয়, কিন্তু ছোটদের সব ছড়া তো অবশ্যই বড়দেরও। কেননা ছোটদের মধ্যে বড়রা থাকে সুপ্ত অবস্থায়, কিন্তু বড়দের মধ্যে ছোটরা থাকে প্রস্ফুটিত, ডেঁপো এবং স্মৃতিবিধুরতার সাক্ষী হয়ে। তাছাড়া বাংলা ছড়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ছোটদের হওয়া সত্ত্বেও বড়দের মতো করেও তার একটা গুরুতর ব্যাখ্যা করা চলে। গড়পরতা মন্তব্য না হলেও এই প্রবণতা বাংলা ছড়ায় বহুমাত্রায় যে বিরাজমান, তা বোধহয় অস্বীকার করা যাবে না।

যে কথা হচ্ছিল যে, তার প্রথম খণ্ডস্বরুপ এই 'ছড়া সমস্ত'-য় নেয়া হয়েছে মোট ২০টি গ্রন্থ। 'এলো হল ধুত্তুরি', 'ঢাকা আমার ঢাকা', 'উপস্থিত সুধীবর্গ', 'হিজিবিজি', 'তোমার জন্য', 'ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ', 'রাজাকারের ছড়া', 'শেয়ালের পাঠশালা', হামটি ডামটি, নাই মামা কানা মামা, বাঘের বাচ্চা, ভূতের জাদু, একযে ছিল টুই, শেখ মুজিবের ছড়া, হবুচন্দ্র রাজার দেশ, পান্তাবুড়ি, হ্যান করেংগা ত্যান করেংগা, হ্যালো হুলো, সূর্যমামা ভীষণ রাগী চাঁদমামা খুব ভালো, ঘোড়ার ডিম। তাঁর বইয়ের নামগুলোর দিকে তাকালেও আবহমান বাংলার চিরায়ত লোকমূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। এখন আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি যে প্রিয়-পরিজন বাদে জাতীয় ক্ষেত্রে কাকে বা কাদেরকে তাঁর বইগুলো উৎসর্গ করা হয়েছে, তাহলে আকছারই দেখা যাবে সেখানেও তাঁর সাহিত্যবোধ, দেশবোধ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্ফূরণ ঘটেছে পুরোমাত্রায়। যেমন : এখলাস উদ্দিন আহমদ, আমীরুল ইসলাম, আসমান সানী, আহমাদ মাযহার, এহসানুল হক, মহসীন করিম, মিলু কাশেম, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই, রফিকুল হক দাদুভাই, আসাদ চৌধুরী, হুমায়ূন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, শেখ হাসিনা, রোমেন রায়হান, সারওয়ার উল ইসলাম, ওবায়দুল গণি চন্দন, আনজীর লিটন, ইমতিয়াজ রসুল জ্যোতি, হাশেম খান, সৈয়দ এনায়েত হোসেন, সালেহ আহমদ, এবং আফলাতুনকে। এখানে নিশ্চয়ই খুব সহজেই লক্ষ

করা যায়, এঁদের মধ্যে সবাই সাংস্কৃতিক মানুষ, আলোকিত মানুষ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারক-বাহক। কেউ ছড়াকার, কেউ কবি কেউ ছোটদের পাতা/পত্রিকার সম্পাদক, কেউ কথাসাহিত্যিক, কেউ গবেষক, কেউ সংগঠক, কেউ শিশুসাহিত্যিক, কেউ চিত্রশিল্পী এবং কেউ-বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব-লেখক। এর বাইরে অন্যরকম একটা দুটো উৎসর্গ রয়েছে এই সমগ্রে যার পরিসর আরও বিস্তীর্ণ, আরও বিষয়বৈচিত্র্যিক, বিভায় উদ্ভাসিত। যেমন : 'ঢাকা আমার ঢাকা' বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন তাদেরকে, যাদের কাছে ঢাকা তাঁরই মতো প্রিয়। 'উপস্থিত সুধী বর্গের উৎসর্গ' পৃষ্ঠায় রিটন লিখেছেন 'অবসান হোক আজ সুমধুর ভাষণের/অবসান হোক আজ সামরিক শাসনের'। এরপরে বলতে হয় 'রাজাকারের ছড়া'র কথা, এই বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে তাদেরকে, যাদের পা উদ্যত রাজাকারদের পদাঘাত করতে। আর একদম আলাদা গুরুত্ব দিয়ে বলতে হয় যে বইটির কথা, সেটা হল 'ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ'। এই বই লুৎফর রহমান রিটনের ছড়া দিয়ে সাজানো। কিন্তু তা উৎসর্গ করেছেন ছড়াকার নন, বরং তার সম্পাদক-পঞ্চায়েত। বইটি সম্পাদনা করেছেন পাঁচজন, আহমদ শরীফ, ফয়েজ আহমদ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কাজী নূর-উজ্জামান এবং শাহরিয়ার কবির। তাঁরা উৎসর্গ পাতায় লিখেছেন : 'ছোট্ট বন্ধুরা, এই বই তোমাদের জন্য, যারা এ পৃথিবীতে এসেছ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অনেক পরে। আঠারো বছর আগে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল আমরা তাকে বলি মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের আয়োজন চলছিল আরও আগে থেকে। আমরা হলাম চিরকাল লড়াই করে বেঁচে থাকা এক মহান জাতি। আমাদের কখনও লড়তে হয়েছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে, কখনও লড়তে হয়েছে অত্যাচারী শাসক ও শোষকদের রিরুদ্ধে। এ লড়াই এখনো শেষ হয়নি। যতদিন পর্যন্ত এ দেশ থেকে সব রকমের অন্যায়-অবিচার, শোষণ-পীড়ন দূর না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ লড়াই চলবে। সামনে সে লড়াই– তোমাদেরই লড়তে হবে। নিজেদের তৈরি করতে হবে তার জন্যে। জানতে হবে আমাদের অতীতের লড়াইগুলোর গৌরবময় ইতিহাস। তোমাদের জন্যে ছন্দে ছবিতে সাজানো এই বই ইতিহাস জানতে সাহায্য করবে।' লক্ষ করতে কোনোই বেগ পেতে হয় না যে, যাদের এই বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে তাদেরকে সত্য ও সুন্দরের দিকে, মহান মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যর দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ উৎসর্গপৃষ্ঠার গুরুত্ব যে অনেক সময় স্বাভাবিকত্বের চাইতে অনেক বেশি অসাধারণত্বে ঝলসে ওঠে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রিটনের এই বইটি, 'ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ'। তাছাড়া বৃক্ষটির নামেও তো ফলের পরিচয় পাওয়া যায় শতভাগ।

এরও বাইরে আরও উৎসর্গের বিষয় রয়েছে বইটির ভেতরে। এর কয়েকটি কবিতা কয়েকজন কবি, ছড়াকার, গদ্যকার এবং নেতাকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই তালিকায় লুৎফর রহমান রিটন যাঁদেরকে রেখেছেন তাঁরা হলেন : মওলানা ভাসানী, আহসান হাবীব, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং সৈয়দ শামসুল হক। এখানে এখন একটুখানি বলার আছে। কেননা এর আগে তথ্যায়নের মাধ্যমে দাবি করেছি যে, রিটন বই এবং কবিতাগুলো যাঁদেরকে উৎসর্গ

করেছেন, তাঁরা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারক-বাহক, তাঁরা সব্বাই মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের মানুষ। তবে একটুখানি সংশোধনীর মতো না দিলে আমার এই বক্তব্যে খানিকটা ঘুণ থেকে যাবে। তিনি তাঁর 'ধুত্তুরি'র দোয়াত কলম কালি' ছড়াটি তিনজন কবি শ্রদ্ধাস্পদেষুকে উৎসর্গ করেছেন। এরমধ্যে একজন হলেন কবি আহসান হাবিব। কবি হিসেবে আহসান হাবিব রিটনের তো বটেই, অনেকেরই 'শ্রদ্ধেয় বা প্রিয়'। কিন্তু ঐ যে আমি বলেছি বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক-বাহক এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের লোক। সেই ক্ষেত্রে আহসান হাবিবকে নিয়ে কিছু কথা আছে। সেটুকুন না বললে জ্ঞাত পাঠকরা মনে করবেন যে আমি তথ্য ছাপাই করেছি বা প্রকৃত বাস্তবতা জানি না। বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন-ধারণের ক্ষেত্রে কবি আহসান হাবিব যে প্রশ্নবিদ্ধ সে কথা অনেকেই জানেন, অনেকেই জানেন না। যেটা এখানে বলা দরকার সেটা হল কবি আহসান হাবিব পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানের নীতি ও আদর্শের সমর্থক। ১৯৬৭-র ২২ জুন পাকিস্তান সরকার বেতার ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্র-সংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে বিবৃতি প্রদান করেন।' (দ্রষ্টব্য: বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান, সম্পাদনা: সেলিনা হোসেন, নুরুল ইসলাম, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, প্রকাশক : পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প], বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃষ্ঠা : ৮২-৮৩)। এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য মন্তব্য করছি না। শুধু আমার পূর্ববক্তব্যর সাথে এই উৎসর্গটি যে মেলে না, এবং সেটি যে আমার খেয়ালের বাইরে নয়, পাঠকের কাছে কেবল সেই জবাবদিহিতা। রিটন আহসান হাবিবের কাব্য প্রতিভার প্রতি মুগ্ধ থাকতেই পারেন, তাঁর কোনো ছড়া বা ছড়াগ্রন্থ তাঁকে উৎসর্গ করতেই পারেন। এটি একান্তই তাঁর ব্যাপার। বলি না-বলব না করে আমিও তো অনেকখানি বলে যে ফেললাম, তার কী জবাবদিহি এই তো? সে জিজ্ঞাসার উত্তর খুব সোজা : আহসান হাবিবকে আমি পছন্দ করি কিনা সেটা এখানে বিচার্য নয়। আমার এতটুকু কথা এখানে বলার অধিকার হল আমি লুৎফর রহমান রিটনকে পছন্দ করি এবং সর্বোপরি আমি তাঁর ছড়ামুগ্ধ পাঠক। সে প্রেক্ষিতে আমার যথেষ্ট সাহিত্যিক অধিকার রয়েছে সংসদীয় ভাষায় প্রিয় ছড়াকারকে মূল্যায়ন করার। নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি আমার মুগ্ধতা, জিজ্ঞাসা, বিস্ময় এবং কষ্টবোধ থাকতে পারে।

সে কারণেই বলা চলে, ছড়ার আঙ্গিক এবং বিষয়বৈভিন্ন্য যাই হোক, প্রতিবাদী, কটাক্ষক, রসিক, বিদ্রোহ তা-সব কাদেরকে উৎসর্গ করা হয়েছে, সেদিকে তাকালে তাঁর বক্তব্যের সম্পূরক গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইশারা আবিষ্কার করা যায়। আর এসব মিলিয়ে ছড়াগ্রন্থের টোটাল বক্তব্য একীভূত বলে মনে হয়। এইসব ভাবার বিষয়ে বা সাহিত্যিক উপাদানে রিটনের মানসকে যেমন পেশ করা যায়, তেমনই সেই মানসসৌরভ ছোটদের মানসকেও তাড়িত করে, প্রাণিত করে, জাগ্রত করে– অতএব, এ'কথায় মনে হয় আর বিতর্কের সুযোগ রইল না যে,

তাঁর বইগুলোর উৎসর্গপৃষ্ঠার নামবক্তব্যও সাহিত্য এবং বাতিঘর-দিশা হিসেবে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

চার.

লুৎফর রহমান রিটনের ছড়ার প্রকৃতি ও প্রবণতা হল দেশ, জাতি, নিসর্গ ও মানবতা। তার মধ্যে আবার বিশেষ আলোয় উজ্জ্বল হল বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। তারই মধ্যে অলংঘনীয় উপাদান হয়ে মিশে আছে লোকবাস্তবতা, বর্তমান, অনাগত দিনের স্বপ্নকল্প, রূপকথা এবং রাজনৈতিক ইতিহাস। রয়েছে সত্য-সুন্দরকে গ্রহণ ও অসত্য অসুন্দরকে ঘৃণা করার শিক্ষা। এইসব সত্যসুন্দরকে ধারণ করতে গিয়ে তিনি সব ছড়াতে না হলেও অধিকাংশ ছড়ায় একটি সংবার্তা বা বার্তামূলকে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে নির্দেশ করেছেন। সে ক্ষেত্রে যে ছান্দসিক মুন্‌শিয়ানায় তিনি সত্যের ওপর আলোকে প্রতিফলিত করেছেন, তা বিস্ময়কর সহজ ও ঋজু হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ় এবং ধনাত্মক কঠিন। এ ধরনের মূলভাবনার নির্যাসধর্মী-মর্মকথা স্বভাবত ছড়া-কবিতার শেষে বা শেষের দিকে উচ্চারিত হয়। কারণ আসল কথাটি মিলে গেলে পরে অতিরিক্ত কাব্যকলা বিরক্তিকর না হলেও কেমন যেন ক্লিশে লাগে। অন্তত আমার বিবেচনায় ব্যাপারটি সেই রকমই। তাই লক্ষ করা যায়, বার্তামূলগুলো রিটনের ছড়ায় সাধারণত শেষে বা শেষদিকে উৎকলিত হয়েছে। এবং এই ধরনের ছড়াগুলোয় শ্রুতিসুখ, পাঠানন্দ এবং ভাবসম্পদও অনেক গভীর বলে মনে হয়। রিটন যে এদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্বশীল ছড়াকার, তাঁর যে জনপ্রিয়তা আছে এটিও তার একটা কারণ, পড়তে পড়তে ছড়ার শেষে এসে এমন একটা মানবিক ঝাঁকি, এমন একটি দীপ্ত প্রাণনা, এমন একটি নৈতিক সত্যবোধ পাঠককে আলোকিত করে তোলে যে, মূলত ছড়াগুলো শেষ হবার সাথে সাথে আরম্ভ হয়, শেষটা হয় পাঠকের ঠোঁটে, আর আরম্ভটা হয় তার অন্তরে-চেতনায়।

তার 'ছড়াসমস্ত' প্রথম খণ্ডে মোট ছড়ার সংখ্যা ২৭৬। এর প্রতিটিতেই যে অপরিহার্য ভাবম্যাসেজ রয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে, তা অবশ্যিক নয়। তবে প্রতিটি ছড়ায় কিছু-না-কিছু আবহ সৃষ্টি হয়েছে, কিছু না কিছু কোনো-না-কোনো ফর্মে উচ্চারিত হয়েছে, যেখানে হয় শিক্ষা, না হয় মনোরঞ্জন, নতুবা বিদ্রোহ কিংবা ঘৃণা, বা আত্মতুষ্টি-র প্রকাশ রয়েছে। সেই বিচারে তাঁর ছড়াগুলো সর্বাংশে মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত। তবে কিছু কিছু ছড়ায় বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট কিছু ম্যাসেজ উঠে এসেছে। যেমন :

খেলে এবং ঘুমায় বার মাস
কপালে ওর তাই জোটে না পাস। (আদুরে, ধুত্তুরি)

বেহিসাবি আবেগাশ্রিত বাহুল্য আদর যে সন্তানের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে, এখানে সেই সমাজবাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে। লেখাপড়া না করলে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, এখানে আখেরের সেই পরিণতির কথা। যার মূল সুর হল ছোট ছেলেমেয়েদেরকে নিয়মিত পড়ালেখার দিকে আকৃষ্ট করা। এই উদ্বুদ্ধ'র পেছনে কী দৃষ্টিভঙ্গি

কাজ করেছে তা সহজেই অনুমেয়। কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হলে তা দেশ-জাতির জন্য কতটা যে মঙ্গল বয়ে আনবে সে সব যে ব্যাপক ব্যাখ্যার বিষয় তাতো বলারই অপেক্ষা রাখে না।

আর্মিতে যোগ দিলে হয়ে যাবে জেনারেল
তিস্তা ও উপবন সব আমার কেনা রেল। (পটলার ছোটোমামা, ধুত্তুরি)।

অনুমান করি, এবং হয়তো-বা আসলেও তা-ই, 'জেনারেল'-এর সাথে 'কেনা রেল' অন্ত্যমিলের একটা অসবল মোহ। কিন্তু তারপরও তো অভিজ্ঞতার আলোকে এই বার্তা আমরা আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই পারি যে, আর্মিরা যখন রাষ্ট্র পরিচালনায় পাওয়ার প্রাকটিস করে, তখন তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তখন তারা জনগণের বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে এমনভাবে গ্রাস ও ভোগ করে, যেন তা তার ব্যক্তিক কিংবা পৈত্রিক ভোগ্য।

নব্য রাজাকারের শহর...
ঢাকার শহর নেতার শহর
নকল ভোটে জেতার শহর...
ঢাকার শহর 'হবে'র শহর
'কিন্তু' এবং 'তবে'র শহর...
চামচা এবং চিটের শহর...
মিনিস্টারের চুরির শহর...
কাকের মতন কবির শহর ঢাকা। (ঢাকা আমার ঢাকা, ঢাকা আমার ঢাকা)।

বটে ঢাকার শহর 'হবে'র শহর। কিন্তু কথা, অঙ্গীকার, ভরসা অনুযায়ী কাজ হয় না প্রায় কিছুই। আসলেও ঢাকার একটা বিশ্বখ্যাতি ছিল মসজিদের শহর হিসেবে। যে কথা লুৎফর রহমান রিটনও এই ছড়াতেই বলেছেন : 'পুজো এবং ঈদের শহর/ফার্মেসি মসজিদের শহর।' কিন্তু এখন শহর হিসেবে সেটা ঠগে ভরা, নব্য রাজাকারে ভরা, চিট-চামারে পরিপূর্ণ। এবং কাকের মতো অসংখ্যেয় কবির শহর। রসিকতা করে হলেও সমাজেরই চিত্র এঁকেছেন তিনি। ঢাকার শহরে কবির সংখ্যা অনেক। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি যে পরিমাণ কবিসংখ্যাকে কটাক্ষ করেছেন, এখানে কবির সংখ্যা পাটিগাণিতিক সমষ্টিতে আরও অনেক বেশি। কেননা ছড়াকারবৃন্দও কবি। অর্থাৎ সেই সংখ্যাটি বোধহয় তিনি যোগ না করা সত্ত্বেও কবির সংখ্যাধিক্য নিয়ে বিরূপাক্ষিক হয়েছেন। কবি বিষয়ে তাঁর এই মতামতের দায় একান্ত তাঁরই। এর পক্ষে বা বিপক্ষে আমার কোনো মন্তব্য নেই। তবে মনে করি যেহেতু সব কবিতা ছড়া নয় তবে সব ছড়াই এক ধরনের কবিতা, সেহেতু সব কবিই ছড়াকার না হলেও সব ছড়াকারই এক ধরনের কবি। অতএব, রিটন ঢাকার কবিসংখ্যার যে পরিমাণটি নিয়ে ভাবিত, বাস্তবে কবির সংখ্যা প্রায় তার দ্বিগুণ চাই কি বেশিও হতে পারে। এই ছড়ায় অগত্যা-ধরনের কিছু অন্ত্যমিল এবং অন্ত্যমিলের মোহে কিছু বিষয়-বক্তব্য আছে। যা রিটনের হাতে রচিত না হলেও কোনো সমস্যা ছিল না। যেমন: 'লাকী খানের নাচার শহর' যেনো 'চাচার', 'খাচার',

'কাচার' এর সাথে 'নাচার' শব্দটির বিনুনি দেয়ার মোহ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। নইলে 'লাকী খানের নাচা' কোনো দরকারি বক্তব্য তো ধারণ করে না। এরকম আরও আছে : 'জয়-ওভাকন-রাজা'র শহর'। এ-ও যেন 'গাঁজার', 'সাজা'র', 'মীনাবাজার' এর সাথে 'রাজার' অন্ত্যমিলের একটা অসংবৃত মোহ সমাজচিত্র হিসেবে নিশ্চয়ই সত্য, কিন্তু লাইনটি কি ঢাকার শহরের প্রতিপাদ্য হিসেবে খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে এই শহর 'নূর হোসেনের প্রাণের শহর ঢাকা'?

ভাবছ তুমি আমরা বোবা কালা?

সামনে সময় দিন বদলের পালা। (আজকে তুমি, ঢাকা আমার ঢাকা)।

এই ছড়াটি ১৯৮৪ সালে লেখা। বাংলাদেশে তখন ছিল স্বৈরাচারী সামরিক সরকার। তাকেই নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে শাসানো হচ্ছে। ন্যায়ত এবং সাংবিধানিকভাবে দেশে জনগণের রাজ কায়েম হবে। সেই কথাটি ম্যাসেজ হয়ে উঠেছে এখানে যে, 'সামনে সময় দিন বদলের পালা'। লুৎফর রহমান রিটনের ছড়া নিয়ে কাজ করতে গেলে গবেষকদের জন্য কিছু বিড়ম্বনা আছে। কোনো ছড়াকে যখন সামাজিক নিরীক্ষার আওতায় আনা হয়, বিশেষত তা যদি হয় রাজনৈতিক ও ইতিহাসরোমন্থক ছড়া, তাহলে প্রায়শই তার রচনাকালটা দরকার হয়ে পড়ে। নইলে অনেকক্ষেত্রে সময় নিরূপণ করতে সময় নষ্ট হয় যে কোন্ সরকারের আমলে, কোন সময়ের প্রেক্ষাপটে তা রচিত হয়েছে। কারণ আমাদের কারো কারো মধ্যে এমন প্রবণতা আছে যে, যখন যে সরকার, তখন তার পক্ষ নিয়ে লেখা, টিভিতে অংশ নেয়া, অভিনয় করা, ছবি ওঠানো। রিটনের ছড়ার নিচে কোনো রচনাকালের উল্লেখ থাকে না। হ্যাঁ, এধরনের ক্ষেত্রে ঐ ছড়াটি কোন্ গ্রন্থভুক্ত এবং সেই বইয়ের পেজ অব প্রিন্টার্স লাইন থেকে জানা যায় যে সেটি কখন প্রকাশ পেয়েছিল। তো তাতে কেবল এইটুকু আন্দাজ করা যায় ছড়াটি ঐ সালে বা তার আগে রচিত। কিন্তু নির্দিষ্ট করে দিন-তারিখ তো জানা যায় না। যেমন এই ছড়াটি, এতে কোন্ সময়ের সরকারকে আলোচ্য চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে তাত তখন অবশ্যই জানাটা দরকার হয়ে পড়ে, যখন সেটি নিয়ে কোনো গদ্য লেখার কাজ করা হয়।

খোকার প্রাণের দামে
পেলাম ভাষা ফিরে
তাই সে খোকার নামে
একুশ আছে ঘিরে। (একুশের ছড়া, হিজিবিজি)।

একুশের গৌরব, ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদ, এসব বিষয়ের প্রতি ক্ষুদে নাগরিকদের মানসকে আকৃষ্ট করার এই চেষ্টা। যার ফল সুদূরপ্রসারী। মাত্র আট লাইনে পঁচিশ শব্দের ছড়া। এটি পড়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বেশি করে জানার স্পৃহা জাগবে শিশু-কিশোর পাঠকদের মধ্যে। যার ভেতরে মাতৃভাষা, ভাষা আন্দোলন তথা প্রিয় মাতৃভূমির প্রতি আরও বেশি শ্রদ্ধাসক্ত হবার, প্রেমাসক্ত হবার দেশাত্মক বিষয় রয়ে গেছে।

গুলি ছুটলে যথাতথা
এটা একাত্তরের কথা ।
বাবা বন্দি ওদের হাতে
আমি পালিয়ে গেলাম রাতে ।
মায়ের বায়না ছিল ওরে
আবার ফিরিস নতুন ভোরে । (শহীদ ছেলের কথা, হিজিবিজি) ।

আমাদের মা-বাবা-সন্তানেরা যে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় কী পরিমাণ কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন তারই সরল চিত্র এখানে আঁকতে প্রয়াস পেয়েছেন লুৎফর রহমান রিটন । মা তাঁর সন্তানকে অকাতরে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য । তিনি যুদ্ধযাত্রী সন্তানকে সাহস যোগাতে আশীর্বাদ করছেন তাঁর সন্তান যদি যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফেরে, তাহলে সে যেন মাতৃভূমিকে স্বাধীন করে তবেই ফেরে । বীরমাতার এই সাহসী উৎসর্গ এক আশ্চর্য কামনার সংবার্তা হয়ে ধ্বনিত হয়েছে ছড়াটিতে । যা পাঠ করলে ছোটদের মধ্যে দেশাত্মবোধ আরও জাগরিত হতে বাধ্য । যার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে দেশের মঙ্গলচেতনা ।

রক্তের বিনিময়ে এল স্বাধীনতা
ঝরে তাই লাল ফুল, কাঁদে তরুলতা । (স্বাধীনতা, হিজিবিজি) ।

আমাদের স্বাধীনতা যে তুমুল গণযুদ্ধের মাধ্যমে যথার্থ রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এবং প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ রক্ত-জীবন-সম্ভ্রমমূল্যেই যে এই স্বাধীনতা কেনা হয়েছে, সেই ইতিহাসই ঘনীভূত হয়ে আছে রিটনের এই ছড়ায় । এখানে তার খুবই হৃদয়স্পর্শী ভাববাদ প্রস্ফুটিত । আগেও এদেশের নিসর্গে লাল ফুল ফুটত, বাতাসে তরুলতা কাঁপত । কিন্তু তিরিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, তিন লক্ষ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে যখন স্বাধীনতা পাওয়া গেছে, তখন সেই একই দেশের একই ফুলকে আরও বেশি লাল মনে হয়, যেন শহিদের রক্তে তার লাল রং আরও ইতিহাস-গৌরবের মাহাত্ম্যে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে । সেই একই দেশে, একই তরুলতা আজ যখন একইভাবে বাতাসে কাঁপে, তখন মনে হয় স্বাধীনতার মহান গৌরবজনক ইতিহাসগর্ভা ঐ তরুলতার নড়াচড়া যেন অনেক গম্ভীর, অনেক বেদনায় সমৃদ্ধ । অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হলে মানুষের দৃষ্টিশক্তি এবং তার সাথে সাথে ব্যাখ্যাশক্তিও যে ধনাত্মকভাবে পাল্টে যায়, সেই দার্শনিক বাস্তবতাটিই সহজ সরল ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে ।

ঈদের দিনে মনে রেখ তাকে...
বস্তিপাড়ার ন্যাংটো ছেলেটাকে ।...
ঈদের দিনে মনে রেখ তাকে...
বস্তিপাড়ার ছোট্ট মেয়েটাকে । (ঈদের দিনে, তোমার জন্য) ।

মানবিক মূল্যবোধকে তাড়িত করার গণস্বভাবী আহ্বান এখানে ফুটে উঠেছে । যা আসলে মানবিক শিক্ষা, শিষ্টাচার, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য, নাগরিক দায় ছাড়া অন্যকিছু নয় । ঈদ বা যেকোনো খুশির পর্বকে আমরা অবস্থাপন্নরা যেন এমনভাবে পালন না করি, যাতে দরিদ্রদের

অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকে। আমরা যেন নিজেদের সুখ-উৎসবের স্বার্থপরতায় তাদের কথা বিস্মৃত না হই। তাদেরকে সাথে নিয়েই যেন সকল সুখ-আনন্দকে সার্বজনিক করে তুলি। কেননা মানুষ হিসেবে আমরা কেউ তো কারো চাইতে ছোট নই। এই যদি হয় প্রত্যাশা, তাহলে যে বা যারা দরিদ্র, তার বা তাদের বঞ্চনাকে দূরীভূত করতে আমাদের যথাযথ অবদান কেন থাকবে না?

রায়ের বাজারে বধ্যভূমিতে
এলোমেলো সব লাশ
চোখের পলকে লাল হয়ে গেছে
সবুজ দূর্বাঘাস। (একাত্তরের এমন দিনে, তোমার জন্য)।

১৯৭১ সাল। ডিসেম্বরের ১৪ এবং ১৫ তারিখ। রায়েরবাজারের বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসের চত্বরটি যে খুব কম সময়ে, রিটনের ভাষায় 'চোখের পলকে' রক্তলাল হয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক করুণ সত্যকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার প্রয়াস এখানে লক্ষণীয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের যখন চূড়ান্তপর্ব, বর্বর পাকিস্তানি সৈন্য আর রাজাকার, আলবদরেরা যখন তাদের পরাজয় বিষয়ে নিশ্চিত, তখন তারা ঠাণ্ডামাথায় তৈরিকৃত তালিকাভুক্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করে আমাদের জাতিকে মেধাশূন্য করার নিধনযজ্ঞে নামে। যুদ্ধ শেষ হয় ১৬ ডিসেম্বর। তার ঠিক আগের দুই দিন শত্রুরা ব্যাপক হারে ঢাকায় সেরা সেরা বাঙালি বুদ্ধিজীবীকে ধরে রায়েরবাজারে নিয়ে হত্যা করে। সেই ঘটনারই মর্ম-মর্সিয়া ঝংকৃত হয়েছে এই ছড়াটির বার্তামূলে।

বালক জানে না যুদ্ধের কোনো মানে
সে শাদা পায়রা আকাশে ওড়াতে জানে।...
বালক কখনো ফেরে না পেছনটানে,
ওরাই দেশের স্বাধীনতার কিনে আনে। (বালক জানে না, তোমার জন্য)।

একাত্তরের যুদ্ধবর্ণনা। ছোটরা তো কেবল শান্তিই বোঝে। কিন্তু পরোক্ষে তো বটেই, প্রত্যক্ষেও তারাও রেহাই পায়নি পাকিস্তানের বর্বর সৈন্য এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, পিসকমিটি, আল শাম্সদের হাত থেকে। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধে ছোটদেরও অবদান রয়েছে। পেছনে না ফেরার অবদান, বীরত্বের অবদান। এ কথা অনেকেরই জানা অথবা অজানা, 'মুজিবনগর ইনফর্মার' হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাঙালি কিশোর-বালকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। বড়দের রক্তধারায় তাদের শোণিতস্রোতও যে মিলেছে, সেই বীরত্বগাথা ছড়াকার এখানে তুলে ধরেছেন নিপুণ ছড়াশৈলীতে।

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'– 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' 'ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ'– উদ্ধৃতিটি উদ্ধৃতির উদ্ধৃতি। বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে বেশি সমগ্রবিস্তারি এবং শক্তি-সাহসপ্রবর্ধক বার্তামূল বহন করে এই সাহিত্যশ্রেষ্ঠ পঙ্‌ক্তি। রবিঠাকুরের 'স্বদেশ' পর্বের প্রথম এই কবিতাটি মোট ২৫ লাইনে রচিত। তারই

প্রথম ১০ লাইন আমাদের জাতীয় সংগীত। এবং সেটির প্রথম লাইন হল আলোচ্য উদ্ধৃতিটি। যা বাংলা ভাষার রচিত পুরো দেশাত্মবোধক রচনার শ্রেষ্ঠ অংশ। কুষ্টিয়ার একজন লোকবাউল গগন হরকরা। যিনি নিজের রচা একটি গান গেয়ে গেয়ে চিঠি বিলি করে বেড়োতেন শিলাইদহ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে। সেই লোকসংগীতের সুরকে হুবহু গ্রহণ করে তা এই কবিতায় প্রয়োগ করে রবীন্দ্রনাথ গানটি রচনা করেন। যা পরে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায়। তো উদ্ধৃতি হিসেবে রিটন যখন এই গানের প্রথম লাইনটিকে তাঁর কোনো ছড়ায় ব্যবহার করেন, তখন তা খুব স্বাভাবিকভাবেই সেখানে প্রধান বার্তামূল হয়ে একদম শেষ লাইন হিসেবে প্রতিস্থাপিত হয়।

'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি– ভাষা আন্দোলন, 'ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ'– এটিও একটি উদ্ধৃতির উদ্ধৃতি। আমাদের শহীদ দিবসের প্রভাতফেরির অসামান্য গান। যা আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর কথায় এবং শহীদ আলতাফ মাহমুদের সুরে গীত। এই সেই গান, যা ১৯৫২ থেকে শুরু করে টানা একাত্তর পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত করেছে, সাহস-উদ্দীপনা যুগিয়েছে। আমাদের আন্দোলনগুলোকে স্বাধীনতার আলোকতৃষ্ণায় জাগিয়ে তুলেছে। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় শহীদ দিবস। পরবর্তীতে ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সেই সুবাদে বাংলাভাষা এখন পৃথিবীর সবভাষার মা-ভাষা। সেই ভাষা আন্দোলনের সাক্ষী হিসেবেই খ্যাত এই 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো'... যা এখন পৃথিবীর দেশে দেশে একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঐ ঐ দেশের রাষ্ট্রভাষায় অনূদিত হয়ে আলতাফ মাহমুদের হুবহু সুরে গীত হয়। বাহান্ন'র পর হতে এই সংগীত আকাশবাণীর মতো যেন হয়ে উঠেছে আমাদের নিজকৃত মার্গীয় পঙ্‌ক্তি।

এই একুশে ঘটনাই অঙ্কুরিত অবস্থা থেকে শাখায়-পল্লবে বিস্তৃত হয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত এবং সংঘটিত করেছে। বলা বাহুল্য যে, বাংলাভাষাই পৃথিবীর একমাত্র ভাষা, যার জন্য তার সন্তানেরা প্রাণ দিয়েছে। বাংলাদেশই পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যা একটি ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র, যা একটি সংস্কৃতিপ্রবণ প্রজাতন্ত্র। অতএব, খুব বেশিরকম গ্রহণযোগ্য কারণেই এই পঙ্‌ক্তি আমাদের সমগ্র জাতির জন্য অন্যতম সেরা মঙ্গলবার্তা।

আমরা হলাম লড়াই করে বেঁচে থাকার জাতি

সেই সে প্রাচীন আমল থেকেই লড়ছি দিবস রাতি। (স্বাধীনতার স্বপ্ন, ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ)।

এই ম্যাসেজ পঙ্‌ক্তিতে স্বাধীনতার স্বপ্ন, স্বাধীনতা-উত্তরকালের প্রত্যাশা, প্রত্যাশা পূরণে অনাকাঙ্ক্ষিত স্খলন, তারপর অনেকখানি স্বপ্নভঙ্গ– এইসব বিষয়বাস্তবতা সত্যোদ্ধারের পরাকাষ্ঠা হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাঙালি যে প্রজন্মপরম্পরায় চিরলড়াকু একটি জাতিগোষ্ঠী, তা-ই বলা হয়েছে। বাঙালিরা যে কত জাতি, কত বহিরাগত বণিক, কত লুটেরা অত্যাচারীর সাথে যুগ যুগ ধরে লড়া-পেটা করছে, তার ইয়ত্তা নেই। এতে

তারা কখনো বিফল, কখনো আপাতঃসফল, কখনো-বা সফল হয়েছে। এই বিবেচনায় বাঙালি যথার্থই হাজার বছর ধরে লড়াই করা জাতি। এতসব রক্তাক্ত চড়াই-উৎরাই পার হয়ে যখন মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা পাওয়া গেল, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই আশা করা গিয়েছিল তাদের লড়াইয়ের অবসান হবে। তারা তাদের স্বপ্নকে পূর্ণতা পেতে দেখবে। কিন্তু স্বপ্নকল্প, প্রত্যাশা আর বাস্তবতা কাঙ্ক্ষিত সমান্তরালে চলেনি। সেই রাজনৈতিক সত্যকেই তাই ছড়াকার অকপট কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। এই জাতির বৈশিষ্ট্য এবং অদৃষ্টের লিখন কি তাহলে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে চলেছে যে, বাঙালির লড়াই সংগ্রামের কোনো শেষ নেই! তাদের যুদ্ধ অন্তহীন!

যায় না পাওয়া কাজের মেয়ে
কাজের মেয়ের অভাব আছে
তার পরেও গিন্নিগুলোর
নির্যাতনের স্বভাব আছে। (কাজের মেয়ে, নাই মামা কানা মামা)।

'কাজের মেয়ে' বা 'গৃহভৃত্য'-ও একটা চাকরি বটে। কিন্তু 'কাজের মেয়ে' কোনো ডেজিগনেশন কিনা সেটা আমাদের সমাজে স্থিরীকৃত নয়। তাদেরকে 'বুয়া'ও বলা হয়। এই 'বুয়া'ও কোনো সম্বোধন নাকি ডেজিগনেশন সে বিষয়টিও আমাদের সমাজে অমীমাংসিত। স্বভাবত আমাদের শাহরিক লেখাপড়া জানা গৃহিণীদের বৈশিষ্ট্য হল প্রভুসুলভ আচরণ। তারা কাজের মেয়ে বা বুয়াদের ওপর কত রকমের শারীরিক-মানসিক নির্যাতন যে করেন তার হাজারটা উদাহরণ দেয়া মোটেই কঠিন নয়। এটি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত সমাজচিত্র। এটি 'সভ্য' নারীদের অসভ্যতার অন্তর্চিত্র যা রিটন তাঁর এই ছড়ায় তুলে ধরেছেন একটি বাস্তব বার্তামূল হিসেবে।

মুসলিম খ্রিষ্টান
বৌদ্ধ ও হিন্দু
সকলের দেহে লাল
রক্তের বিন্দু। (সম্প্রীতি, বাঘের বাচ্চা)।

সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের বাতিল বোধের ফাঁপা অন্তঃসারকে ছড়াকার এখানে চিহ্নিত করার প্রয়াসই কেবল পাননি, তিনি মাত্র কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে আশ্চর্য কুশলতায় 'মানুষে মানুষে অভেদ'– এই মহানুভবতার বাণী পরিবেশন করেছেন। রঙে-রঙে-মাংসে সবাই একই মর্যাদার মানুষ। সাম্প্রদায়িক পরিচয় যে আসলে মনগড়া, সেই সত্যকেই তিনি এখানে তুলে ধরেছেন। এখানে যে মানবতাবোধটি উঠে এসেছে, বার্তামূল হিসেবে তা সেক্যুলার চেতনার চাইতেও এককাঠি ওপরে। বলা হচ্ছে যে, আসলে মানুষে-মানুষে কোনো ভেদই নেই। সকলের দেহাভ্যন্তরে একই রঙের রক্ত প্রবাহিত। নানান বরণ গাভীর একই বরণ দুধ, সবাই আসলে একই মায়ের সন্তান। তো এই বাংলাদেশটায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে হাজার বছর সহ-অবস্থানের মাধ্যমে যে সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয়েছে, তা এই অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান-

খ্রিস্টান-বৌদ্ধ এবং বাঙালি-অদিবাসীর এক বিস্ময়কর মানবিক সৌভ্রাতৃত্ব। যার সামাজিক-রাজনৈতিক মূল্য অনেক বেশি।

প্রাণের চেয়ে প্রিয় তুমি
ও জননী জন্মভূমি
তোমার রূপের নেই তো কোনো শেষ
তুমি আমার প্রিয় বাংলাদেশ। (প্রিয়, বাঘের বাচ্চা)।

এখানে পুরো ছড়াটিই বার্তামূল। অবশ্যি মাত্রই চার লাইনের ছড়া। এতে উদ্বুদ্ধকরণের বাণী হচ্ছে, যেকোনো নাগরিকের কাছে তার প্রাণের চাইতে বড় এবং প্রিয় হবে তার জন্মভূমি। এবং সেটা যখন বাংলাদেশ, তখন রূপের দিক দিয়ে, গুণের দিক দিয়ে তার সৌন্দর্যের কোনো শেষ নেই। এককথায় দেশপ্রেমের মর্মবাণী ধ্বনিত হয়েছে এখানে।

কেউবা টোকাই বলে
কেউ পথকলি
এসো আজ ভালোবেসে
একসাথে চলি। (ওরা, বাঘের বাচ্চা)

পথে পথে ঘুরে বেড়ায় যে শিশু-কিশোররা। এটা-ওটা টুকিয়ে-কুড়িয়ে জীবননির্বাহ করে। ভিক্ষাবৃত্তি বা অন্য কোনো করুণ খাটুনিতে নিয়োজিত এই রকম বৈশিষ্ট্যের শিশু-কিশোরদেরকে আমরা সাংস্কৃতিক-প্রাকল্পিক প্রয়োজনে, সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে ভালো উদ্দেশ্যেই কখনো কখনো ভালো বা তথ্যবোধক একটা নাম দিই। যেমন টোকাই। কখনো-বা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তাদের প্রতি সরকারের একই দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়, যেমন 'পথকলি'। তাতে নিশ্চয়ই কোনো দোষ নেই। কেননা এসবের পেছনের উদ্দেশ্য ভালো। কিন্তু প্রায় সবক্ষেত্রেই দেখা যায়, তা-সব সফল হয় না। এই ধরনের কাজে কোনো শিল্পী বা কবি বা নেতা বা রাষ্ট্রপতি হয়তো বিখ্যাত হয়ে যান। যেমন আসমানীর স্রষ্টা জসীমউদ্‌দীন, টোকাইয়ের স্রষ্টা রফিকুন্নবী, পথকলির স্রষ্টা হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ, নেকাব্ববের স্রষ্টা নির্মলেন্দু গুণ, লাডুর স্রষ্টা আশরাফ সিদ্দিকী, রতনের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মালুর স্রষ্টা শহীদুল্লাহ কায়সার। বাংলা সাহিত্যে এই রকম আরও চরিত্র ও চরিত্রস্রষ্টা আছেন। যাদেরকে নিয়ে সৃষ্ট রচনা-চরিত্র-ছবি বিখ্যাত হয়েছে। বিখ্যাত হয়েছেন তাদের স্রষ্টা কবি, শিল্পী, নেতা, রাষ্ট্রপতিরাও। কিন্তু ছিন্নমূল সেই ভাগ্যবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের ভাগ্যের খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে, এমন অভিজ্ঞতা আমাদের খুবই কি কম নয়? জিজ্ঞাসাটি কারো কারো জন্য বিব্রতকর হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এটাই তো আমাদের আবহমানকালের চিরায়ত সমাজচিত্র। মানে সমাজে যেসব হতভাগ্য এইসব সত্য ও প্রতীকী চরিত্রের শিকার, তাদের ভাগ্যে কোনোই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। সে কারণেই লুৎফর রহমান রিটনের এই ছড়ার মর্মকথা হল, যে নামেই ডাকি-না কেন, তাদেরকে নিয়ে যে মহৎ কাব্য, চিত্র, গানই আমরা

রচি-না কেন, আসল কথা হল তাদের জীবনতৃষ্ণার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো। মূল কথা হল তাদেরকে নিয়ে পথ চলা। তাদেরকে ভোগ ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় শরিক করা।

সত্যি পথে চলতে হবে
বলতে হবে
সত্যি কথা।
ন্যায়ের পথে থাকতে হবে
আঁকতে হবে
ন্যায়ের ছবি।
অসুন্দরের বিরদ্ধে
থাকে যেন শির ঊর্ধ্বে। (পরীর সঙ্গে দেখা, এক যে ছিল টুই)।

সত্যাচারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সমগ্র মানবোন্নয়নের প্রতি পদক্ষেপী হতে আহ্বান উচ্চারিত হয়েছে এই ছড়ায়। বলা হয়েছে যে, ন্যায়ের পথে থাকতে হবে এবং নিজের বোধিদীপ্ত মাথাকে রাখতে হবে সবার উপরে। একটি রূপকথামূলক ছড়ানাট্যের মতো এই সর্বমঙ্গলময় বাণী সংলাপ আকারে বিধৃত হয়েছে। এ কথা তো সর্বৈবভাবে সত্য যে, জীবন-সমাজকে সুন্দর করার সব চেষ্টাকে বাদ দিয়েও যদি আমরা কেবল সঠিকভাবে সত্যাচারে ব্রতী হই, তাহলেই সমাজ-পৃথিবীর অনেক অসুন্দর থেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে।

অন্য একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই ছড়ানাট্যে লুৎফর রহমান রিটন ছন্দমাত্রা, অন্ত্যমিল এসবে কিছু ভাঙচুর ও নিরীক্ষার প্রয়াস চালিয়েছেন। যে ধরনের টেকনিক্যাল কাজ তাঁকে এই খণ্ডের কোনো গ্রন্থে খুব একটা করতে দেখা যায়নি। ফলে এই ছড়ানাট্যে অন্যরকম গতি নিয়ন্ত্রণ, থামা-চলা, স্বরাঘাত, অন্ত্যমিল, সংলাপিঝানুতা লক্ষ করা যায়। তাতে ছড়াক্ষেত্রে রিটন যে কী কুলিন মণিকার সে বিষয়টিও অনুমান করা যায়। এই বার্তামূলে রিটনের ছড়াচেতনায় আন্তর্জাতিকতাবাদও লক্ষ করার মতো বিষয়।

ভালোই সবচে ভালো।
অন্ধকারে জ্বালবে আলো। (পরীরানীর দেশে, এক যে ছিল টুই)।

খণ্ডিতভাবে কোনো একক ব্যক্তির ভালো বা উন্নতি করা আসলে ভালো করা বা উন্নয়নসাধন করা নয়। সমগ্রের সামষ্টিক ভালো বা উন্নয়নই আসলে সত্যিকারের অর্থে সমাজমঙ্গল। অতএব, একা নিজের ভালো না করে সবার হিতসাধন করতে হবে। এবং সেটা করলেই দেশের ভালো করা হবে। আর তাহলেই, দেশ যেহেতু সবার, সেহেতু সেই ভালোকে ভোগও করতে পারবে সবাই। এই শুভ অর্থে অন্য যেকোনো এক বা কয়েকজনের ভালো করার চাইতে দেশের ভালো করাই সমাজের সবার ভালো করা নামান্তর।

ধন্য মুজিব ধন্য
একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি
আমরা তোমার জন্য। (ধন্য মুজিব, শেখ মুজিবের ছড়া)।

ছোট-বড়, কিশোর-কিশোরী, সকল বাঙালি-আদিবাসীর জন্য খুবই প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য হল আমার দেশের যে স্বাধীনতা বা আমাদের যে স্বাধীন দেশটির প্রাপ্তি, তার চূড়ান্ত সংগ্রামে সফল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই, আমরা তাঁর জন্য ধন্য তো অবশ্যই। বাংলাদেশের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছোটদের জন্য এ একটি মৌলিক বার্তামূল। যা জানা না থাকলে ইতিহাসজনিত জ্ঞানঘাটতির কারণে তার নিজের কাছে নিজেরই পরিচয়, গৌরব, জাত্যাভিমান, কৌলিন্য সব অজানা থেকে যাবে।

তোমার আমার ব্যবধানটুকু কমবেই জেনো প্রিয়
ঘুচে যাবে ব্যবধান
সব ভুলে এস হাতে হাত রাখি ভেদাভেদ ভুলে যাই
এক সুরে গাই গান। (তোমার আমার, হ্যান করেংগা ত্যান করেংগা)।

মানুষে-মানুষে যে ব্যবধান, ভেদাভেদ, তার অবসান হওয়া যে দরকার এবং সেক্ষেত্রে আমাদের কী করণীয় সেই মানবিক ম্যাসেজটি এই ছড়ায় বলা হয়েছে। সব ব্যবধান ভুলে, মানুষ মানুষকে সত্যিকার ভালোবেসে যখন হাতে-হাত রাখবে, এক সুরে গান গাইবে, নির্দিষ্ট সুন্দরকে নির্মাণে ব্রতী হবে, তখন মানুষে-মানুষে বিরাজমান বিভেদ ঘুচে যাবে। প্রকারান্তরে লুৎফর রহমান রিটন এই মর্মবাণীই এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। এই ভেদাভেদ চূড়ান্তপর্বে একদিন যে ঘুচে যাবেই, ছড়াকার সেই আশাবাদই ব্যক্ত করেছেন আলোচ্য ছড়ার বার্তামূলে। এখানেও আন্তর্জাতিকতাবাদ লক্ষণীয়।

গায়ে খাটি হক চাই, ভিখ না
কইছি কী মিয়াভাই, ঠিক না? (একজন শিশুশ্রমিকের কথা, হ্যান করেংগা ত্যান করেংগা)।

শ্রমিক বা বিশেষ করে শিশুশ্রমিককে আমরা যখন পারিশ্রমিক পরিশোধ করি, তখন আমাদের আচরণে একধরনের মনিবি ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে। যেন আমরা তাকে অনুগ্রহ করছি। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আমরা যে আমাদের দেনা শোধ করছি, আমাদের মধ্যে সেই নম্রতা এবং শিষ্টাচার থাকে না। তবে সত্য তো এই যে, শিশুশ্রমিকটি আমাদের কাছ থেকে সাহায্য বা ভিক্ষা নিচ্ছে না, বরং সে তার ন্যায্য পাওনাই তো নিচ্ছে!

কাকের মাংস কাকেরা খায় না
মানুষে মানুষ খায়!
আধুনিক এই বিশ্বে মানুষ
আজ বড়ো অসহায়। (মানুষ এবং যুদ্ধ, হ্যালো হুলো)।

একাধারে সমাজবাস্তবিক এবং দার্শনিক একটা মূল কথা ছড়াকার এখানে ব্যক্ত করেছেন। একমাত্র মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো প্রাণী তার জীবনযাপনে প্রকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করে না। মানুষ আসলেই সবক্ষেত্রে বিস্ময়কর এক ব্যতিক্রম। সে-ই পৃথিবীতে একমাত্র প্রাণী, যে মেধার খর্বতা করে। এমন কোনো নিকৃষ্ট কাজ নেই, যা মানুষ করে না। সেই কথাটিই রিটন

তাঁর এই ছড়ায় ইঙ্গিতে-ইশারায়, অথচ সহজবোধ্যভাবে বলেছেন। ছোটরা যেন এই ছড়া বা ছড়ার মূল কথা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে, এটিই এই ছড়ার মূল উদ্দেশ্য।

বন্ধু তোমার হৃদয় থেকে
হিংসা কর ছাঁটাই,
শহর থেকে অনেক ভালো
আমার সবুজ গাঁ-টাই। (ভালোবাসার চিঠি, সূর্যমামা, ভীষণ রাগী চাঁদমামা খুব ভালো)।

সরল বীক্ষণে শহর আর গ্রামের একটি মৌলিক সমাজবার্তা এখানে উঠে এসেছে ছড়াকারের হাতে। নগরবাসী লেখাপড়া জানা, যারা ক্ষমতায় অসীন। তারা মেধার কৌশল খাটাতে ধূর্ত। তাদের প্রকৃত আয় এবং জীবনযাপনের পরিমাপক মানদণ্ডে অনেক ফারাক। মানে স্ট্যান্ডার্ড অব লাইফের অনেক ক্ষেত্রেই তারা প্রশ্নবিদ্ধ। তারা প্রতিযোগীর নামে ভেতরে ভেতরে হিংসুক। তারা যতটা অন্যের আগে যেতে চায়, তারচেয়ে বেশি অন্যকে পেছনে ফেলতে চায়। এই তুলনায় গ্রামীণ যে সাধারণ নাগরিক, তাদের জীবনযাপন অনেক সুন্দর-সরল, প্রশ্নমুক্ত। তারপরেও নগরের এদেরকে ওরা 'বন্ধু' সম্বোধন করে এই বিদ্বেষ পরিহারের আহ্বান জানাচ্ছে। যেখানে নগরবাসী বয়েসীদের জন্য এবং বিশেষ করে ক্ষুদে পাঠকদের জন্য অনুশীলনীয় দীক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

'এবারের সংগ্রাম
মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম
স্বাধীনতার সংগ্রাম' (সাতই মার্চ, ১৯৭১, ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ)।

যথার্থই 'সাতই মার্চ, ১৯৭১, ছড়ার শেষ কটি লাইন এই ছড়ার বার্তামূল। মোট মিলিয়ে ১৪টি লাইনে ছড়াটি বিন্যস্ত। বলা বাহুল্য, এই 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' কেবল এই ছড়ার মূলমন্ত্র বা বার্তামূল নয়। এ হচ্ছে বাঙালি জাতির হাজার বছরের গদ্য-পদ্য-ছড়া-কবিতা-নিবন্ধ-বক্তৃতা সমুদয় সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা অধিক ঘনীভূত এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বার্তামূল। যা সাতই মার্চ অভিভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠে পৃথিবী কাঁপিয়ে ধ্বনিত হয়েছিল। একদম শেষে ছড়া, ছড়ার অন্য কোনোখানে যদি রিটন এই ধনুকভাঙা গর্জনকে স্থাপন করতেন, তাহলে তা বেমানান হত এবং তাঁর মতো ছড়াকার সেটা করবেন না, সেটাই তো কাম্য। তাই, যথার্থ যথাস্থানে তিনি এটিকে বসিয়েছেন। এই উদ্ধৃতিতে একটু ভুল রয়ে গেছে। 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' নয়, মূলত লাইনটি হবে, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম' পরের লাইন ঠিকই আছে।

পাঁচ.

এই আলোচনায় নেয়া বইগুলোয় লক্ষ করলে দেখা যায়, খুব আধুনিক ধরনের ভাঙচুর এবং অন্ত্যমিলের মনোমুগ্ধকর মুন্‌শিয়ানা তেমন নেই। আজকাল তো ছড়ায় এমনসব অন্ত্যমিলের

বজ্রআঁটুনি দেখা যায় যে, বিস্ময় না মেনে পারা যায় না। কোনো কোনো ছড়া বা ছড়াকারের ক্ষেত্রে অন্ত্যমিলের নৈপুণ্যের আতিশয্য এতটাই বাহুল্য যে, সেখানে ছড়ার অন্যান্য গাঠনিক বিষয় এবং বক্তব্যবস্তু পর্যন্ত মাঠে মারা যাবার উপক্রমে ধরাশায়ী। মানে অন্ত্যমিলের এমন মারাত্মক চমৎকারিত্ব যে, ভোজবাজির মতো। অনেকটা যেন ভেলকি। সে যেন অনেকটাই জ্যামিতির ক্ষেত্রফলের মতো ঠিক এরকম মনে হয় যে, গজ-ফিতে ধরে, শব্দের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ বিচার করে তার ওজন-ভর সাব্যস্ত করে তারপর তা ছড়ার দেহে স্থাপন করা। মানে একেবারে এপিটাফের শিলালিপি লাগানোর মতো। আধুনিককালের ছড়ার ভাঙচুর বা শ্রাদ্ধও যেন আশ্চর্যরকম জটিলসুন্দর মাত্রা ছেঁটে-জুড়ে, শব্দ ভেঙে-চেঁছে এমন প্রাকরণিকভাবে ছন্দ-ব্যাকরণের মধ্যে গেঁথে তোলা দেয়াল যে, শব্দের ইঁট ও অক্ষরের ধাঁচগুলো পরস্পর অসমান, এবড়ো-খেবড়ো, বিবিধ আকৃতির হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর গাঁথুনিটা টাইলসের মতো মসৃণ। কাজটি সব ছড়াকার পারেন না, কেউ কেউ পারেন। মানে যাঁরা একে পাকা জহুরি, তাতে আবার হাতে কষ্টিপাথর কেবল তাঁরাই পারেন। কিন্তু এসব পণ্ডিতি চাকচিক্যসাধন করতে গিয়ে ছড়া তার সারল্য এবং পাঠ-আনন্দ দেয়ার জৌলুস যে হারাচ্ছে, সেটা বোধহয় একালের ছড়াকাররা বিবেচনায় রাখছেন না বা খেয়াল থাকা সত্ত্বেও অন্যকোনো মোহের কাছে সমর্পিত হচ্ছেন। এসব কারণে পড়ে মুগ্ধ হওয়া গেলেও গাণিতিক মাপজোকের ছড়াগুলো মানুষের মুখে মুখে ফেরার যোগ্য হয়ে উঠছে না। লুৎফর রহমান রিটনের আলোচ্য ছড়াগুলো যে অতটা ম্যাকানাইজ্‌ড নয়, সেইজন্যই তা পাঠনন্দন, সুখভোগ্য এবং সহজ ঋজু।

আলোচ্য ছড়াগুলো সরল-সবল হবার আরেকটা কারণ আছে। যে বিশটি বই এই আলোচনার আওতায়, তার শেষ বইটি বেরিয়েছে ১৯৯৮ সালে, মানে এখন থেকে ছাক্কা ১৭ বছর আগে। ঐ গ্রন্থের ছড়াগুলো নিশ্চয়ই একই বছরে লেখা নয়। কারণ বইটি বেরিয়েছে ফেব্রুয়ারিতে। নিশ্চয় তা-সব এক মাসের (জানুয়ারি) মধ্যেই রচিত নয়। অতএব, তাঁর অধিকাংশ ছড়া বা হয়তো সব ছড়াই ১৭ বছরের অধিক আগে রচিত। আর এক্ষেত্রে তাঁর প্রথম যে বইটি, সেটি বেরিয়েছে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। মানে এখন থেকে ৩৩ বছর আগে। একই হিসেবে এই গ্রন্থের ছড়াগুলোও রচিত হয়েছে তারও পূর্বে। অতএব, আধুনিককালের নানান বাক্যচপলতায় সেগুলো নতুন ঝালরে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েনি। বরং এত আগে রচিত হওয়া সত্ত্বেও রিটন এক্ষেত্রে কিছুকিছু এমন ভাঙচুর, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অন্ত্যমিলের ঝানু শিল্পিত্ব দেখিয়েছেন যে অবাক না হয়ে পারা যায় না। মানে এখন রাখছেন তো বটেই, স্বাক্ষর তখনও রেখেছিলেন যে, তিনি জাত-ছড়াকার বটেন। সামসময়িক কালের তুলনায় অনেক অগ্রগামী তাঁর কয়েকটি অন্ত্যমিলের নমুনা এখানে তুলে ধরা যেতে পারে : মিনসের/তিনসের, বিরুদ্ধে/শির ঊর্ধ্বে, অন্ধকার/খন্দকার, ছাঁটাই/গাঁ টাই, কেদারায়/কে দাঁড়ায়, দারোয়ান/আর ওয়ান, যে যাহার/এজাহার, যাবে দিন/আবেদিন, জন্যেই/ভুবন নেই এই রকম আরও আছে। অত আগে এত পরের উপযুক্ত অন্ত্যমিল। যা শৈল্পিক চমৎকারিত্বে ঠাসা। সবিনয়ে আরেকটু যা বলার, তাহল কিছু কিছু অসরল-রোগা অন্ত্যমিলও রয়েছে

বইগুলোতে। যেমন: টিমটিম/ঘোড়ার ডিম, নাম 'তাঁর'/আনোয়ার, মানুষ খায়/অসহায়, কথাকলি/পথকলি, একাকার/গেল পার, আবিষ্কার/পুরস্কার, করা দায়/পাস্তায় এ রকম ঢের আছে। আর আধামিল, সিকিমিল, মধ্যমিল তো আছেই আছে, সেদিকটায় যাচ্ছি না।

উপভোগ্য বিষয় হল লুৎফর রহমান রিটন এই প্রথম খণ্ডের ছড়াগুলোয় যে যৎসামান্য ভাঙচুর ও অনিয়ম করেছেন, এবং পরে অন্য বহুক্ষেত্রে যেভাবে নিয়মের বাইরে চলে গেছেন, বা গ্রামারের দাসত্ব মানেননি, ছড়াকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার গিনিপিগ বানিয়েছেন, আশ্চর্য যে বেপথু-পরীক্ষাতেও তাঁর অসমানগুলো এক বিস্ময়কর মসৃণতায় এগিয়েছে! এর কারণ কী? কারণ হল তার সৎসাহস এবং ভেতরের কাব্যশক্তি। তিনি যে ছড়ান্তপ্রাণ মানুষ, তিনি যে-ছড়া লেখকের সাথে সাথে ছড়ার পাঠকও, সেই মানস তাঁকে হিম্মৎ ও গতি দিয়েছে। সেই তেজেই রিটন বীরভঙ্গিতে নিয়ম-অনিয়ম টুটে-জুড়ে এগোতে পেরেছেন। তিনি যদি কেবল শক্তিতে এগোতেন, তাহলে পথ-অতিক্রমটি এত সুন্দর হত না। বরং হিতে-বিপরীত হয়ে একটা তালগোল পাকিয়ে যেত। কিন্তু তিনি শক্তির সাথে সাথে যোগ করেছেন যে বিষয়, তা হল সৎসাহস এবং ছড়াপ্রাণের সদিচ্ছা। কথা উঠতে পারে, তা আবার কী করে সম্ভব! যতই বলা যাক, নিয়ম ভাঙার ফলাফল কি নিয়ম মানার মতোই সাবলীল হতে পারে? না পারে না। যখন তিনি নিয়ম জানেন না বলে আপোসেই নিয়মটি ভেঙে পড়েছে। ফলে সেখানে নাস্তানাবুদ অবস্থা। আর হ্যাঁ পারে, যখন তিনি ভালোভাবে নিয়মটি জানেন এবং জানার পরই তা ভেঙেছেন। বলবেন, এ-ও তো প্যাঁচানো যুক্তি এবং এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব। না, মোটেই তা নয়। বাইসাইকেল তো হ্যান্ডেল ধরেই চালানোর নিয়ম। ধরা যাক আপনি একদমই সাইকেল চালাতে জানেন না। এখন আপনি যদি প্রথমেই হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়ে চালাতে যান বা চালানো শিখতে যান, তাহলে কী হবে? উত্তর খুবই সোজা। আবার ধরেন আপনি খুবই ভালোভাবে সাইকেল চালাতে জানেন, এখন যদি হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়েও চালান, মানে অনিয়মও করেন, তবুও কিন্তু সাইকেলটি সাবলীলভাবেই চলতে থাকবে। এমনকি তা আপনাকে এবং অনেককে তাক লাগিয়ে পর্যন্ত দিতে সক্ষম হবে। তো ছড়া লেখার ক্ষেত্রে লুৎফর রহমান রিটন সেইসব অনিয়ম করেছেন, তা ঠিক ঐ রকম ঝানু চালকের হ্যান্ডেল ছেড়ে সাইকেল চালানোর ক্যারিশমা।

রিটনকে ভবিষ্যতে পরিমাপ করতে যে বড় দৈর্ঘ্যের ফিতে লাগবে, তা ঐ অত আগে, মানে তখনই কি বোঝা যায়নি? আমি ঐ গ্রন্থগুলো প্রকাশের সময়পর্ব ১৯৮২ থেকে ১৯৯৮-

এর কথা বলছি। এই ১৬ বছরে তাঁর আলোচ্য ২০টি বই। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেরিয়েছিল ১৯৯৪ সালে ৫টি। তার আগে-পরে অন্য যে হিসাব তা হল : ১৯৮২ সালে ১টি, ১৯৮৪ সালে ২টি, '৮৭ সালে ১টি, '৮৯-এ ২টি, '৯০-এ ১টি, '৯২-এ ২টি, '৯৩-এ ১টি। ১৯৯৪-এর কথা তো আগেই বলেছি। তারপরে '৯৫ সালে ২টি এবং '৯৬, '৯৭, '৯৮ সালে

প্রত্যেক বছরে একটি করে। অত পেছনেই তিনি যে ঢের অগ্রসর, সে কারণে অনেক আগেই রিটন বাংলাসাহিত্যে অন্যতম প্রধান এবং অবশ্যই প্রতিনিধিত্বশীল ছড়াকার। আমি তো দৃঢ়ভাবে মনে করি, ব্যক্তি-রিটন না হোক, রিটনের প্রতিভা না হোক, তাঁর ছড়া ইতোমধ্যেই গবেষণার যোগ্য। আর সেটা করা গেলে আমি নিশ্চিত যে, তাঁর প্রতিভাকে এবং যুগপৎভাবে তাঁকেও উপেক্ষা করা যাবে না। আমার এই কথার সত্যতা তুলে ধরার জন্য তাঁর সাম্প্রতিককালের এবং ঐ গ্রন্থগুলোর পরের পর্বের ছড়াগ্রন্থগুলো আশ্রয় নেয়াটা দরকার ছিল। কিন্তু এই আলোচনাকে তাঁর প্রথমখণ্ড 'ছড়াসমস্ত'য় সীমাবন্দি রাখতে চাই কৌশলগত কারণে। কেননা এখানে একটি পর্যায় পর্যন্ত একজন রিটনকে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। এরপরের যে রিটন, তিনি অন্য আরেকজন রিটন, যেখানে তাঁর ছড়াবোধ, ভাঙচুর-নিরীক্ষাকলা অন্য আলোর বিচ্ছুরণে আলোকিত। সেই রিটনকে এই রিটন থেকে তাই আলাদা রাখাটাই যুক্তিযুক্ত। এবং এইভাবে কাল ও পর্ব বিভাজন করে রিটনের অনেকগুলো অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন দাঁড়িয়ে গেলে, তখন পুরো রিটনকে পূর্ণ অবয়বে আঁকার কাজটা সুবিধেজনক এবং যুক্তিযুক্ত হবে। রিটন যে বহু পথ অতিক্রম করেছেন, সেই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার মানসশক্তি তাঁকে আরও বেশি ছড়া-পথ অতিক্রম করতে সহায়ক হোক, এই প্রত্যাশা অবশ্যই আমাদের করা উচিত।

২২.১০.২০১৫

গ্রন্থসহায়ক

১। 'ছড়াসমস্ত', লুৎফর রহমান রিটন, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০, পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮

২। কৃতজ্ঞতা স্বীকার : নাসের মাহমুদ।

[লেখক: ছড়াশিল্পী ও শিশু-কিশোর সাহিত্যিক। একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।]

আমীরুল ইসলামের ছড়ায় লোক-উপাদান

বি ল্লু ক বী র

প্রত্যেকটি ছড়াই এক ধরনের কবিতাও, কিন্তু কোনো কবিতাই কোনো রকমেই কোনো ছড়া নয়। এই বিবেচনায় যিনি ছড়াকার, তিনি কবিও, কিন্তু যিনি কবি, তিনি ছড়াকার নন। অর্থাৎ ছড়াকার কবির তুলনায় সৃজনশীলতায় এবং যুগপৎ ভাবে মননশীল ও অগ্রসর। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা যেতেই পারে যে, ছড়াকার মেধাসমন্বয়ে এবং ভাবসম্পদে একাধারে সমৃদ্ধ এবং ওজনদার, মানে ভারি এবং ভারী। তার ওপর কোনো ছড়াকার শিশুদের যদি বিশেষ ও শিশুদের ছড়াকার হন, তাহলে তো তিনি বিনাবিশ্লেষণেই আরও এক কাঠি উৎকৃষ্ট বা সরেস। মনে হতে পারে পক্ষপতিত্ব, কিন্তু আদপে তা নয়। সত্য জ্ঞানে সাত-পাঁচ ভেবেচিন্তে ষোল আনা দায়িত্ব নিয়েই এই মন্তব্য। আমার যা ভাবনা, সেইটে বলি, খোঁড়া হলে গ্রহণ না করলেই হল, কিন্তু যদি বস্তনিষ্ঠ যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়, তাহলে কে কবে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন? তা তিনি কবিই হোন বা গদ্যকারই হোন বা সাহিত্যের অন্য কোনো শাখার ঝানু কুশীলবই। একজন কবি, যিনি বয়েসী পাঠকদেরকে বিবেচনায় রাখলেই যথেষ্ট হয়। কারণ কবিও বয়েসী বলে বয়সীর মেজাজ-মর্জি মালুম করাটা সহজ। কিন্তু ছড়াকার যখন ছোটদের লিখিয়ে, তখন তাঁর জন্য ব্যাপারটা সামাল দেওয়া বেশ শক্ত। কেননা তাঁকে বড়দেরকে তো বিবেচনায় রাখতেই হয়, সেই সাথে পুরোমাত্রায় মাথায় রাখতে হয় ছোটদেরকেও। আর একথা তো বলাই বাহুল্য যে, ছোটদের চিত্তচাপল্যকে ঠিকঠিক বুঝে ওঠাটা অত সহজ নয়, যতটা সোজা বড়দের বেলায়। বলবেন তো যে কেন? তার জবাব খুব ভেবে দেখার মতো। ছোটদের জিজ্ঞাসা হয় মূলস্পর্শী এবং সরল। কারণ হল ছোট পাঠককে প্রাণিত ও তাড়িত করে তার মন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বড় যে পাঠক, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার মগজ ফলে তা বিশেষ স্বতোৎসারিত হয় না। এবং অনেক ক্ষেত্রে বড়দের জিজ্ঞাসা, সম্পূরক প্রশ্ন এগুলো বাহাস-বিতর্কের নামান্তর, যাকে অশীল ভাষায় 'পাকামো' বলা যেতে পারে। অন্য দিকে যে ছোটরা সবসময় সারল্য এবং মূলগত মনের তাড়নায় জিজ্ঞাসা করে, সেই কারণে এই জিজ্ঞাসাটি প্রকৃতই কিন্তু জিজ্ঞাসা। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, কেন, ছড়াকারের পক্ষে ছোটদের অন্তরের চাহিদা, হাসি-খুশি এবং বিরাগ-অভিমান হৃদয়ঙ্গম করাটা অত কঠিন কেন হবে? তিনি কি তাঁর শিশুকাল অতিক্রম করে আসেননি? তার প্রবীণত্বের আড়ালে কি শিশুকালটা সঞ্চিত নেই? বয়েসী যদি বয়েসীকে বুঝতে পারেন, তাহলে তিনি কমবয়েসীকে

মালুম করতে পারবেন না কেন? পারবেন না, বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পারবেন না। কারণ বয়েসী কবির ক্ষেত্রে যখন বয়েসী পাঠক, তখন পরিপক্ব মেধার ব্যাপারটা দুপক্ষের ক্ষেত্রেই পুরাঘটিতবর্তমান। সুতরাং নিজেকে বুঝলেই অন্যকে বোঝা যায়। কেননা কবি নিজেও একজন পাঠক। প্রশ্ন উঠতে পারে, পাঠক কি ছড়াকারও নন? আলবত-ই হ্যাঁ। কিন্তু ছড়াকার যেখানে প্রবীণ, ছোট পাঠক সেখানে ক্ষুদে। সেক্ষেত্রে ছড়াকারের বাল্য কেবলই ধূসর স্মৃতি। সেটা তিনি খেয়াল রাখার চেষ্টা সেই ভেবে তা করেননি যে, বড় হয়ে তাঁকে পোলাপানদের লেখক হতে হবে, অতএব শিশুকালের কাণ্ডকারখানাগুলোকে সংরক্ষণ কর, থরে থরে সাজিয়ে রাখ! তাই তাঁর জন্য ক্ষুদে পাঠকের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করাটা যতটাই শক্ত, কবির জন্য পাকা পাঠকের চেতনাকে দোলা দেয়া ততটাই সহজসাধ্য। খুব ভালো বুঝতে পারছি যে, এতক্ষণ যা বোঝাতে চাচ্ছি, তা মনের মতো করে ঠিকঠিক বোঝাতে পারছি না। সেক্ষেত্রে সহৃদয় এবং মেধাবান পাঠকের ওপর ভরসা হারানোর মতো নিরেট মূর্খ আমি নই। তাঁদের যথেষ্ট বুঝক্ষমতার গুণে, আমার বুঝিয়ে তোলার ক্ষেত্রে যে কৌশলগত ঘাটতি তা আশা করি পুষিয়ে যাবে।

এতক্ষণ ইনিয়ে-বিনিয়ে যে দীর্ঘ শিবের গাজন আওড়ালাম, তাতে আসল ধান ভানার মুখপাত দিয়ে, একটা আবহ সৃষ্টির তো যুক্তি রয়েছে। তা নয় যদি আচমকা 'এক দেশে ছিল এক রাজা' বলে বলে শুরু করে দিই, তাহলে মনোপ্রস্তুতি বা আগ্রহ নির্মাণের কলাটি ব্যাহত হতেই পারে। আর শুরুতেই যদি সেই হোঁচটটা খেতে হয়, তাহলে সমস্যা। অন্তত গান নয়, কবিতা নয়, ছড়া নয় একেবারে সাত কাহন গদ্য শোনার বেলায় তো অবশ্যই। এতক্ষণে অরিন্দম..... ।এই লেখাটার প্রধান প্রতিপাদ্য হল ছড়াকার আমীরুল ইসলাম (১৯৬৪) ছড়াকার বাদেও আরও দুচারটে অভিধায় তাঁকে সাজানো যায় বটে। কিন্তু অভিজ্ঞাপ্রসূত যে মুকুটটি তার জন্য প্রথম প্রাপ্য, সেটা 'ছড়াকার'। এ বিবেচনা একটায় আমার, সকলের কাছে বা কারো কারো কাছে তা পুরোপুরি কিংবা অংশত গ্রাহ্য হবেই বা হতেই হবে, তেমনটি কাম্য নয়। তবে আমি তাঁর বিষয়ে যা বলার প্রয়াস পাচ্ছি, তার পটভূমিতে একটা গবেষণাজাত দায় এবং অন্তরের সমর্থন আছে। কেউ যদি আমার সাথে সামান্যও একমত না হন, তার জন্যও আমীরুল বিষয়ে নতুন কিছু ভাবনার প্রাণনা সৃষ্টি করতে কি পারলাম না? সেইটেই ভাবসম্পদ হিসেবে ভালো অর্জন। এমনকি সেটা আমীরুল ইসলামের জন্যে যতখানি সম্মানজনক তার চাইতে পুরো বাংলা ছড়াসাহিত্যের জন্য কল্যাণকর। আমিরুলকে আমরা সত্যিকার অর্থে বিমুগ্ধ অথবা অতিরঞ্জন করে অথবা স্বজনপ্রীতি করে কোন শিরস্ত্রাণটি পরাব সে অন্য প্রসঙ্গ। কারণ তাতে আমাদের একটা যা নয় তাই গদ গদ ভাব থাকতে পারে, সস্তা ধরনের লোকদেখানি মনোভাব থাকতে পারে, থাকতেও পারে আরো কোনো ভালো বা কম ভালো উদ্দেশ্য। সেই জন্য আমরা তাঁকে কোন মনিহারটি পড়াব, কোন বিশেষণে বিভূষিত করব, কোন পুরস্কারটি তাঁকে দেব, তার আগে গভীর বিশ্লেষণে দেখাতে হবে যে, কোন্ মুকুটটি আসলে তাঁর প্রাপ্য, যেটি তিনি তাঁর সৃজনশীল প্রতিভানৈপুণ্যের শক্তিতে অর্জন করেছেন।

আমীরুল ইতোমধ্যেই, অর্থাৎ এযাবৎকালে যত পুরস্কার-সম্মাননা-বাহবা পেয়েছেন, সেটা প্রাতিষ্ঠানিকই হোক আর ব্যক্তিকই হোক, তার আগেই তিনি সেটা স্বতঃপ্রণোদিত পাঠকসমাজের কাছ থেকে পেয়ে গেছেন। সেটা হল আমীরুল ইসলামের 'ছড়াকার' স্বীকৃতিটি। সবার আগে কিন্তু পাঠকেরা তাকে 'ছড়াকার'-এর শিরস্ত্রাণটি পরিয়েছে। তার পরেই নানা গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি সেই মুকুটে একটা-দুটো করে মণি-অরণির দ্যুতিপাথর গুঁজে দিয়েছে। কিন্তু তাঁকে এসবের যোগ্য করে তুলেছে প্রধানত তাঁর প্রতিভার তেজ, তার পরেই তাঁর পাঠকের স্বীকৃতি। অর্থাৎ সব পুরস্কার ইত্যাদি পাবার আগে, ঐসব পুরস্কারদাতা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্যদের ওপর বিশেষ প্রভাবকের দায়িত্ব পালন করেছে তার পাঠকেরাই। ভালো লাগে যে, এই পাঠকের মধ্যে আমিও আছি।

এই রকম একজন আমীরুল ইসলাম, যিনি ছড়া লেখেন এবং এর বাইরে অনেক রকমের সংস্কৃতিঘেঁষা কাজকর্ম করেন, তাঁরই বিষয়ে শুধুমাত্র ছড়া সংশ্লিষ্ট গদ্য লেখা খুব শক্ত না হলেও খুব সহজও নয়। তাঁকে নিয়ে সাতকাহন না হোক অন্তত অদীর্ঘপরিসর আধখানা প্রবন্ধ রচনা আমার জন্য অনেকটাই ঝকমারি। 'ঝকমারি' মানে ঝুঁকি। ঝুঁকি এইজন্য, আলোচনার প্রতিপাদ্য এমন একজন আমীরুল ইসলাম, যার রয়েছে প্রচুর খ্যাতি-স্বীকৃতি এবং ভক্ত পাঠক। অর্থাৎ সামান্য স্খলনও কারো না কারো কাছে শূন্যসহ্য হতেই পারে। এই কথাটা এই বেলা বলে রাখা দরকার, তাঁকে নিয়ে যখন লেখা, তখন আটপৌরে মোসাহেবির মতো সকলের মনরক্ষা করা তো আর যাবে না। সেটা করার দরকারও নেই। ভয় পাচ্ছি না বটে, কিন্তু সাহসেও কি ঘাটতি? কী জানি! তাঁর ছড়ার জগৎ অনেক বিস্তারিত। তাঁর বিষয়-বক্তব্য, দেখার সক্ষমতা এবং অনুভবের গভীরতাও নানা বৈচিত্র্যে, বহুরেখায় ব্যাপ্ত। সেই জন্য পুরোটা আমিরুলকে এক লেখায় তো কাঠামোবদ্ধ করা যাবে না। অতএব, অন্ধের হাতি দেখার মতো একটা ব্যাপার। আমার বা এ ধরনের গদ্যলেখকের ভয় বা ঝুঁকিটা সেইখানে। সেই জন্য আগেই বলে রাখি– এখানে শুধুমাত্র তাঁর 'ছড়া রচনাবলী-১'-কে নেয়া হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০০৬ -এ বেরুনো এই বইটির পৃষ্ঠসংখ্যা ৩৯২ এবং ছড়াসংখ্য ১৬৯৪। বইটির নামকরণ লক্ষ করার মতো নয় কি? বেশ খানিকটা অন্যরকম, কিন্তু ব্যতিক্রমজনিত বাধো বাধো লাগে না মোটেই। প্রায় তিন দশক ধরে যে ছড়ার চাষাবাদ করেছেন তিনি, তারই সবগুলো বইকে গ্রন্থিত করা। কিন্তু বইগুলোর নামোল্লেখ তো নেইই, ছড়ার সূচিপত্র পর্যন্ত দেয়া হয়নি সচেতনভাবেই! এ-ও একটু অন্যরকম বই কি। কিন্তু কথা হচ্ছে বইয়ের নাম থাকল না, সে না হয় হল, কিন্তু অসুবিধা হল এই ঢাউস বই থেকে চট্ করে দরকারি ছড়াটাকে বের করা। সমস্যা না? এই রকমের সমগ্র-রচনাবলি-অমনিবাস ধরনের বইগুলো কেবলমাত্র পড়ার জন্য তো নয়। শখের সংগ্রহ হিসেবে সাজিয়ে রাখার বাস্তবতা, সে কিছুটা আছে মানছি। কিন্তু মূলত এই চারিত্রের গ্রন্থ ব্যবহার করার জন্য। অতএব, নতুনত্ব চমক হিসেবে ভালো লাগলেও ব্যবহারের অসুবিধাকে বিবেচনায় না রাখাটা ঠিক হয়েছে কিনা প্রশ্ন! এই প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই আমীরুল ইসলামের কাছে এবং প্রকাশকের কাছে আছে। তবে

সেটা, আমরা যারা বই পাঠ ব্যতিরেকেও ব্যবহার করতে চাই, তাদের কাছে গোঁজামিলে লাগবে। ঠিক আছে যে বইয়ের নাম সন্নিবেশন এবং অলংকরণ সহ ছড়ার রচনাবলি সাজালে কবিকে ভারিক্কিটা ব্যাহত হয়, অতএব এরকমটা করলে বইয়ের গাম্ভীর্য এবং আভিজাত্য বৃদ্ধি পায়। এবং সেটা এই বইয়ে ঘটেছেও বটে। তাহলে ছড়াগুলোকে শিরোনামের আদ্যাক্ষরভিত্তিক সাজানো যেতে পারত। কারণ বই-উপযোগিতার ঘাটতি ঘটুক এমনটি লেখক, প্রকাশক, পাঠক কারোরই কাম্য নিশ্চয় নয়। তাঁরা এই অনুযোগ কানে তুলবেন কি তুলবেন না, সেটা তাঁদের ব্যাপার। কিন্তু সামান্য ব্যবহারকারী পাঠক হিসেবে আমি এই সমস্যার সাথে যে লড়েছি, এবং অনেকখানি কাতরও হয়ে পড়েছি, সেই কথাটি অসত্য নয়। দুটো অসুবিধার কথা বলি– বইটিতে যে অন্যূন ১৭০০ টি ছড়ার শুমারি-সিদ্ধান্ত দিয়েছি, কষ্টটা ভাবলেই অনুভব করা যাবে এজন্য প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা আমাকে ওল্টাতে হয়েছে, তারপরও সন্দেহ থাকে, এতবড় যোগের পাটিগণিত তো আর চাট্টিখানি কথা নয়, অন্তত অঙ্কে যেখানে আমার মতো কাঁচা। অথচ বইটিতে যদি সূচিপত্র থাকত, তাহলে পুরো আধবেলার কাজটি আমি খুব বেশি হলে বিশ মিনিটে শেষ করতে পারতাম এবং তাতে গণনাটার নির্ভুলতা বিষয়ে কোনো দোনোমনো থাকত না। আরেকটা সমস্যা– এই বইটার মধ্যে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামে একটা ছড়া আছে, 'ভ্যানগগ' নামেও একটা ছড়া আছে। এখন এই দুটি ছড়াকে চট করে আমি কীভাবে বের করব এই ৩৯২ পৃষ্ঠার দশাসই কিতাব থেকে? খুব জোর দিয়ে বলতে চাই, এবং সামান্য পাঠক হিসেবে অধিকারের তেজ নিয়েই বলতে চাই যে, গ্রন্থওয়ারি সূচিপত্র না দেওয়াটা পাঠকের জন্য বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেছে। গবেষক-লেখকদের ক্ষেত্রে সেই বিড়ম্বনাটা আরও প্রকট। বরং এ ধরনের বই আরও অতিরিক্ত তথ্যসংযোজন দাবি করে, এমনকি নির্ঘণ্ট পর্যন্ত শ্রম দিতে পারলে আরও ভালো হয়। এই কাজ অবশ্য লেখকের নয়– প্রকাশকের, কিন্তু পরিকল্পনার দায় এড়িয়ে যেতে পারবেন না আমীরুল ইসলামও। হ্যাঁ, পাছে আমার ঔদ্ধত্ব হয়, সেদিকটায় চোখ-কান খোলা রাখা সত্ত্বেও এই দোষারোপটা আমি করছি। এবং খুব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি যে, এই বক্তব্যের বাড়াবাড়ির জন্য লেখক, প্রকাশক দুপক্ষই আমার প্রতি বিরক্ত হবেন, চাইকি রাগান্বিতও। কিন্তু পাঠক হিসেবে আমিও যে একটি পক্ষ, এবং বইয়ের ক্ষেত্রে পাঠক তৃতীয় পক্ষ হলেও যে খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে আমলযোগ্য কুশীলব সেই সত্যকে অস্বীকার করবেন কে?

কথা উঠতে পারে বড় পণ্ডিতি ফলাচ্ছি। না, ব্যাপারটা সে রকম নয়। তবে আবার নতুন করে পুরো আমীরুল ইসলামকে পাঠ করতে হল। এবং এখন আরো দায়িত্বসহ বলতে সাহসী হই যে, এই ভাটি বয়সে এসে শকুনের চোখে আবার নতুন করে আমীরুলের সৃজনজাতের ছড়াভুবনের অলি-গালি-রাজপথ অক্ষরে অক্ষরে, দাঁড়িতে-কমায় চাক্ষুষ করলাম। আমারও যে তাঁর প্রতি দুর্বলতা-ভালোবাসা কম নয় সেটাও কিন্তু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। এই সামান্য লেখার সুবাদে যত কষ্টই হোক, তাঁর ছড়ার দীর্ঘপাঠ শেষ করে অনেক ক্ষেত্রেই আমীরুল ইসলাম নতুন মুদ্রায়, গভীর আলোয় উদ্ভাসিত লাগছে। নিজের সমৃদ্ধি অনুভব করে

আমি অন্তত পরিতৃপ্ত যে, তাঁর লেখাসমগ্র বিষয়ে আমার অনেক দৈন্যই কেবল ঘুচল না, নতুন নতুন কৌণিক রেখায় এই ছড়াশিল্পীর মাহাত্ম্য এবং কিছু না কিছু তো আছেই স্খলনের ধুন্দুমার, আমাকে আলোকিত বেশ করল।

নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আমীরুল ইসলামের ছড়াগুলো ক্লাস্টারাইজড করা যায়। কিন্তু যে অনেক বড় স্পেসের গদ্য লেখার ক্যানভাস। অতএব সেদিকটায় যাচ্ছি না। তার পরেও নিজেই নিজেকে এই এই প্রশ্ন করার মোহ সংবরণ করতে পারছি না যে, বিষয়-বৈয়াকরণে আমাদের স্যোশিও পলিটিকাল এবং লোক-ঐতিহ্যের কোন দিকটায় তিনি বিচরণ করেননি! পাঠকের মূল্যায়নের সত্যিই যদি কোনো মূল্য থেকে থাকে, তাহলে বলি– এক বিস্ময়উদ্রেককারী ছড়ার নিপুন কারিগর তিনি। সহজ বিষয়গুলো তো সহজ থেকেছেই, মুনশিয়ানার গুণে, আমীরুলের কবজির দক্ষ-নৈপুণ্যে কঠিন বিষয়গুলোও কেমন জলের মতো তরল হয়ে উঠেছে। এবং যে ব্যক্তিক-জাতিক-আঞ্চলিক-বৈশ্বিক চেতনার স্ফুরণ তাঁর টোটাল কাজের মধ্যে প্রাণনা জাগাতে পরিপোক্ত, তা তাঁকে এক আন্তর্জাতিকতাবাদী মানবকর্মীতে পরিণত করেছে। যারা এই মতামতের সাথে একাত্ম হতে দ্বিধান্বিত, তাদেরকে আরেকবার তাহলে আমীরুলকে পাঠ করতে হবে। আমার বেলায় যা ঘটেছে, তার বা তাদের ক্ষেত্রেও তা-ই যে ঘটবে সেটা অনুমান করাতে আমার কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না। পরীক্ষা প্রার্থণীয়। এতে ছড়ার নাম 'ছড়া' এই রকম অন্তত ১৩৬ টি ছড়া আছে। মানুষের নামে শিরোনাম এমন ছড়ার সংখ্যাও কম নয়। গুণে দেখেছি ২০৮টি! আর স্বাভাবিক প্রসঙ্গে ছড়ার মধ্যে এর বাইরে আরও কত ভালো এবং ভালো-নয় মানুষ বা মানুষের প্রসঙ্গ যে এসেছে, তা বলার নয়। রীতিমতো বিস্ময় না মেনে গত্যন্তর থাকে না। আমীরুল ইসলামের যে বিশাল ছড়াপৃথিবীর নির্মিতি, সেটাই প্রমাণ করে যে তিনি নির্মাতা হিসেবে কতটাই দক্ষ এবং রুচিবান। মন্তব্যটি গড় নয়, কিছু কিছু ব্যত্যয় যে ঘটেনি বা প্রায়ই ঘটার উপক্রম হয়নি, ষোল আনা সে ভাবে বোধহয় বলা যাবে না। মানুষ, পাখি, কীট-পতঙ্গ, যুদ্ধ, ধর্ম, স্বাধীনতা, নারী, শিশু, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি, দেশ, বিদেশ, বাহন, অস্ত্র-শস্ত্র, আত্মীয়-শত্রু-বন্ধু, পার্বণ, উৎসব, প্রতিবাদ, হুল্লোড়, খেলাধুলা, ইতিহাস, অঙ্ক, বর্ণমালা, বিশ্বজনীন বিষয়াদি, লোকপুরাণ, রূপকথা, স্বপ্নকল্প, কটাক্ষ, বাহবা, হাহাকার, সমবেদনা, শিল্প-সংস্কৃতি, শিশু, জেন্ডার, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, লোক-উপাদান, মানে কি যে তাঁর ছড়ায় স্পর্শিত হয়নি প্রশ্ন সেটাই! এমনকি নিজ শিরোনামে তিনি নিজেও অনেক ক্ষেত্রে ছড়ার প্রতিপাদ্য কুশীলব হয়ে দাঁড়িয়েছেন খুবই নিপুণ অবয়বে। এখন কোনটা রেখে কোনটাকে এখানে আলোচনার বিষয় করি! সবগুলো বিষয়কে ধরতে গেলে বোকামি হবে। অতএব, আমরা এই রচনায় শুধু তাঁর ছড়ার লোক-উপাদান নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করতে পারি। আমার এ ধরনের বিষয়ে যা সামান্য লেখাপড়া আছে, তাতে আমীরুলের ছড়ার এই রকমের কোনো স্যোসাল অডিট হয়েছে বলে দেখিনি। সুতরাং কারো দ্বারা প্রভাবিত বা প্রাণিত হয়ে এই গদ্যের আয়োজন নয়। এবং খুব সচেতনভাবেই এজন্য আমি কোনো আকরগ্রন্থের খোঁজ করিনি। জানার মধ্যে

যা বইপত্র, সাক্ষাৎকার, মূল্যায়নধর্মী দস্তাবেজ ইত্যাদি আছে, ভুলেও ওসবের দিকে হাত বাড়াইনি। সেটা করলে আমার জন্য সুবিধা হত, এই লেখাটার মান বাড়াতে সহায়তা হত। কিন্তু তাঁকে নিয়ে এবং তাঁর ছড়া-জগতের লোক-উপাদান বিষয়ে একটা মৌলিক লেখা দাঁড় করানোর মোহ সম্ভবত আমাকে লোভতুর করে তুলেছে। নইলে কষ্ট করে কমজোর লেখার চাইতে সহজেই একটা ভালো গদ্য রচনার সুযোগকে কেন আমি কাজে লাগালাম না? উত্তরটা প্রশ্নের আগেই কিন্তু দিয়ে দিয়েছি। হতে পারে না? শুধু প্রশ্ন দেখে উত্তর, একটা সেকেলে নামতা, উত্তর দেখেও কিন্তু প্রশ্ন লেখা যায় এবং তার মধ্যে অন্যরকম ব্যতিক্রমী আহলাদের অনুভব আছে।

যাই হোক। আমীরুল অবশ্যি বলেছেন 'আশৈশব ছড়ার সুর, ধ্বনি ও শব্দের মোহময় জাদুতে আচ্ছন্ন আমি– বাঁচার জন্য ছড়া লিখি কিংবা ছড়া লিখি বলেই বেঁচে আছি।' অন্তরের ছড়াপ্রেম ছড়াসাহিত্যের সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত কেউ এমন সহজে, এমন টলটলে গভীর হৃদয়স্পর্শী কথা বলেছেন বা বলতে পেরেছেন, আমার জানা নেই। আমি খুব ঘন অভিনিবেশসহ তাঁর পঁচিশ বছরের সব ছড়া পড়েছি। শুধু পরিমাণ দেখেই যেখানে চোখ বিস্ফরিত হবার কথা, সেখানে আমি তাতে রীতিমতো আবগাহন করেছি। এই বাস্তবতায় একেবারে হৃদয়ের গভীর অন্তস্তল থেকে যে বোধ আমাকে আলোড়িত করে, তা হল– আমীরুল ছড়া লেখেন, নাকি ছড়াগুলো আমিরুলকে দিয়ে নিজেদের লিখিয়ে নেয়? আমার প্রশ্ন জাগে এবং সাথে সাথে উত্তরও দৃঢ় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যে, এককভাবে আমীরুল ইসলামই ছড়াগুলোকে তৈরি করেননি, ছড়াগুলোও আমীরুলকে নির্মাণ করেছে। দুপক্ষই আজ দুপক্ষের ক্ষেত্রে অলংঘনীয় প্রভাবক। স্রষ্টাও সৃষ্টি করেন, সৃষ্টিও স্রষ্টা গড়ে।

যে কথা বলছিলাম, আমরা আলোচনা করব আমীরুলের ছড়ায় লোক-উপাদান নিয়ে। আমীরুল নিজে বলেছেন 'বাংলা ছড়ার ঐতিহ্য অনেক সমৃদ্ধ। লোকছড়া ও আধুনিক ছড়ায় তারই চিহ্ন পাওয়া যায়। এখন ছড়ার অনেক বৈচিত্র্য, অনেক বিষয় এবং ছড়াকারের সংখ্যাও অনেক। ছড়ার এই অগ্রযাত্রায় আমরাও অংশ নিয়েছি– এটুকুই আনন্দ। ছড়া লিখে আনন্দ পাই। ছড়ার আনন্দ যদি ফুরিয়ে যায় তবে আমার জীবনের আনন্দও ফুরিয়ে যাবে।' অতলস্পর্শী নিরাবেগ এবং আবেগকে একই বাক্যে এতটা মানিয়ে বলতে পারা খুব একটা সহজ মুনশিয়ানা নয়। শিবের গাজন রেখে এবার ধান ভানা, মানে আমিরুলের ছড়ায় লোক-উপাদানের খনন বা তত্ত্ব-তালাশ।

আমীরুল-এর সব ছড়া ধন্য ধন্য করার মতো আহামরি তেমনটা যে নয়, সেই কথা বলতে অনেকখানি ধৃষ্টতা লাগে। সেটা আমার থাকাটা উচিত নয়। কিন্তু অত ভদ্দর-লোক পাঠক তো আমি নই। সাহস দেখাচ্ছি বটে, কিন্তু ভয়ে-ভয়ে বিনীত ভাবে। একটা সংসদীয় ভাষায় বলা মনে হয়ে যায় যে, তাঁর কিছু কিছু ছড়া এবং ছড়া বিষয়ক কর্মপ্রয়াস নিয়ে অন্যভাবে বলার সুযোগ রয়েছে। তবে তাঁর বেশির ভাগ লেখাই যে ভালো এবং ছড়া নিয়ে তাঁর যে ভাঙাচোরা, নিরীক্ষা, প্রাকরণিক ব্যবচ্ছেদ, সেইটেই হচ্ছে 'আমীরুল-প্রতিভা'

সেইটেই হচ্ছে বাংলা ছড়াসাহিত্যে তাঁর অবদান। এখনই, জীবদ্দশাতেই তিনি যে লেখার বিষয় হয়ে পড়েছেন, সেইটেই আভাস দেয় যে, ভালো গুণ এবং অ-ভালো গুণসম্পন্ন ছড়াশিল্পী আমীরুল ইসলামকে বাদ দিয়ে এখন আর বাংলা ছড়ার মূল্যয়ন সম্ভব নয়, ভবিষ্যতে তো নয়ই। তাঁর যৎসামান্য লেখা কারো কারো ততো ভালো না-ও লাগতে পারে। কিন্তু সেগুলোকে যদি আপাতত বাদ রাখি, তাহলে সেটা হবে সম্পদের আকাশস্পর্শী পর্বতের পাদদেশ থেকে কয়েকটি নুড়ি সরিয়ে দেয়ার মতো। কিন্তু সেগুলোরও সাহিত্যিক উপযোগিতা রয়েছে নুড়ির মতো, পুরো পাহাড়ের মতো নয়। সব মিলিয়ে বাংলা ছড়ার বর্তমান যে পৃথিবী, তাতে প্রতিনিধিত্বশীল কয়েকজনের মধ্যে তিনি যে একজন উজ্জল কুশীলব, এই কথা অস্বীকার করার মতো কোনো সুযোগ নেই। সে সুযোগ অবশ্যি খোঁজারও কোনো দরকার আছে বলে মনে হয় না। তাঁর ছড়ায় ভাষা, বর্ণমালা এবং তার উপমা-তুলনা হয়ে এসেছে মা। পৃথিবীর যে কোনো প্রাণীর জন্য তার মা হল চিরন্তন শাশ্বত। আর মানুষসহ যেকোনো সবোলা ও অবলার ভাষা, ভাব প্রকাশ, ইশারা-ভঙ্গি হল অনাদি কালের অবলম্বন হিসেবে এমন একটি লোকউপাদান, যার আশ্রয়ে তারা টিকে থাকে, সুখী হয়, প্রাণিত হয়, ক্ষুব্ধ হয়, সংগ্রাম করে জয়ী বা বিজিত হয়। তাই মৌলিক প্রাচীন হিসেবে আমাদের ভাষার চাইতে বেশি আর কোনো লোক-ভাবসম্পদ নেই। সেই বিষয়টিই ঘুরে-ফিরে এসেছে আমীরুলের ছড়ায়। তাঁর ছড়া কেন অনেকের চাইতে অনেক বেশি জনপ্রিয়, তার অনেকগুলো উত্তর আছে। মধ্যে একটা হল লেখাগুলো স্বাভাবিক উচ্চারণে বলে যাওয়ার মতো সারল্যে উদ্ভাসিত। তা সহজেই বোধগম্য বলে রস-আস্বাদনের বেলায়ও সোজা এবং স্বাদু। কিন্তু তার পরেও ভাষা প্রসঙ্গ কখনো কখনো ছড়ার সীমা ডিঙিয়ে পদ্যপ্রবণ হয়ে উঠেছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই পদ্যও যেন কবিতা-ছুঁই ছুঁই। এখানে প্রসঙ্গতা খুব তরল একটা দুটো নমুনা-উদাহরণ উপস্থাপন করা মোটেই কঠিন কিছু নয়। আসলে বিষয়ের ভারিক্কি চাঁড়েই এভাবে কোনো কোনো ছড়া পদ্যপ্রবণ হয়ে ওঠার উপক্রম হয়েছে। সেই পদ্যপ্রবণতা যখন কবিতার কাছাকাছি যাবার উপক্রম হয়েছে, তখন যেন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে 'ছড়া' থেকে বেশ দূরবর্তী হয়েই পড়েছে। এই রকমের ক্ষেত্রে আসলে মূল যে শেকড়াশ্রয়ী লোক-বক্তব্য, সেইটেই বড় প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে, তার ছড়াবাচ্যতা কতখানি অক্ষুণ্ন থাকল বা থাকল না, সম্মানি পাঠকের সেই মৌলচিত্ত গৌণ হয়ে পড়ে। লোক-আবহ এমনই বাউলা করে তোলে সংশ্লিষ্ট মানুষকে, জাতিকে। একটা উদাহরণ এখানে দেয়া যায় যেমন :

'হাজার বছর লালন করা মায়ের সুখের ভাষা
মাটির জন্যে মায়ের জন্যে আমার ভালোবাসা।
সেইতো আমার ছড়া'– (পৃষ্ঠা ৯)।

আসলে ছড়ার মধ্যে যখন লোকবিষয় যুৎসইভাবে মানিয়ে যায়, তখন তাতে যা বলা হয়, তা তে বলা হয়ই, যা বলা হয় না, তা-ও বলা হয়ে যায়। ফলে তার অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যেয়

বিষয়বক্তব্য হয়ে ওঠে ব্যপক খননের যোগ্য। আর এর সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী বৈশিষ্ট্য হল খুব ঋজুভাবে শব্দগুলো উচ্চারিত হওয়া। অবশ্য আমীরুল ইসলাম বলেছেন–

'সহজ ছড়া লিখতে আমায় কহযে
সহজ ছড়া যায় না লেখা সহজে।' (পৃষ্ঠা ২৯০)

আমাদের যেকোনো লেখকের ওপর রবীন্দ্রনাথ যে অলংঘনীয় প্রভাবক, সেই বীক্ষাপটও এখানে সুস্পষ্ট বিভায় উদ্ভাসিত। বটে সত্যই তো, কঠিন কথা, সহজ করে লেখা সহজ কথা নয়, অনেক কথা অল্পে আঁটোসাটোয় পূঞ্জিভূত করার কৌশলটি কঠিন না হয়ে যায় কোথায়! আমীরুল যখন লেখেন... 'শহীদ মিনার দাঁড়িয়ে থাকে কান্নাচাপা বুকে। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙা-গানটি মুখে মুখে... একুশ আমায় চমকে দিয়ে ভাঙাও মনের ভুল। কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে রক্ত রাঙা ফুল।' (পৃষ্ঠা-১০)। তখন তো বিস্ময়কর ভাবে মাত্র তিন-চার পঙ্‌ক্তিতে তিনি পুরো ভাষা-আন্দোলন এবং তার পরবর্তী একুশে অনুশীলনের ছবি আঁকেন। রচনাটুকু সহজপাঠ্য বলেই কঠিন লেখ্য। এবং একই কারণে যুগৎভাবে তা হৃদয়স্পর্শী। এর সাথে সম্পর্কিত করা যায় এমন শতেক চরণ রচনা করেছেন তিনি–

'নিচে নেমে এসো মাটিতে তোমার পরিশোধ করো ঋণ।
মাটিকে চেন না তুমি চেন না জন্মভূমি।' (পৃষ্ঠা ২৬) ।

শহীদ মিনারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন– 'তুমিই হলে এই বাংলার
জাগ্রত এক চিত্র এই বাঙালির স্বপ্ন-সাহস
চিরকালীন মিত্র।' (পৃষ্ঠা ৭১)।

সহজ করে বলার যে ছড়াশর্ত তা এখানে ষোলোআনা। কিন্তু বিষয়বিস্তীর্ণ যেটা ধরে রাখা হয়েছে, সেই গুণ কি কবিতার অতলান্তকেও ছাড়িয়ে যায়নি? বিস্ময় না মানলে সেটা বোধহয় অনুভূতির বৈকল্য। অতএব, আমীরুল ইসলাম তাঁর গৌরবের দিকে পাঠককে আকৃষ্ট করেন– 'ধন্য আমি ধন্য। এই দেশের জন্য।' (পৃষ্ঠা ৭৩)। সুতরাং–

'ফুলের জন্যে ভালোবাসা
পাখির জন্যে ভালোবাসা
নদীর জন্যে ভালোবাসা
গাছের জন্যে ভালোবাসা
সবার জন্যে ভালোবাসা
ছড়ার জন্যে ভালোবাসা।'...(পৃষ্ঠা ৮৮)

এই ভালোবাসা যখন 'সবার জন্যে', 'ছড়ার জন্যে', তখন তা যেন আলোকসম্পাত ঘটায় আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকঐতিহ্যের ওপর, আমাদের মহত্তর ভাবসম্পদ অসাম্প্রদায়িক মনন-মেজাজের ওপর। যা মূলত মানবতার প্রত্যাশা, বৈশ্বিক জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি।

'কে হিন্দু? কে মুসলমান?

এসব বড় নয়
আমরা সবাই বীর-বাঙালি
এটাই পরিচয় ।
বাংলা আমার প্রাণের ভাষা
বাউল কবির গানের ভাষা...
বাংলা আমার সংস্কৃতি
ভয় পাই না, পাই না ভীতি
সব বাঙালি সমান মানুষ'...(পৃষ্ঠা ৯৪) ।

এ হচ্ছে চিরকালীন, বিশ্বজনীন মানবস্বপ্ন । আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সমালোচনা-সাহিত্য তেমন দানা বাঁধেনি । ফলে লেখার মূল্যায়ন যেমন প্রায় হয়ই না, লেখকের জবাবদিহিতাও তেমনই শূন্যের ঘরে । ফলে অনেক লেখক যেমন কোনো অঙ্গীকারসমৃদ্ধ বাধ্যবাধকতার ধার ধারেন না, তেমনি যাঁরা দায়িত্ব নিয়ে লেখেন, তাঁরাও প্রাপ্ত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত থাকেন । এই আক্ষেপ বা অনুযোগের অনুকূলে হাজারটা উদাহরণ তুলে ধরা কঠিন কোনো বিষয়ই নয় । এই যে না-প্রাপ্য পুরস্কার, না-প্রাপ্য ধিক্কার, কোনোটারই যথাযথ অনুশীলন না-থাকায় ঢের ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে সাহিত্যসমগ্রের । নইলে বিশ্বসভায় আমাদের অবস্থান আরও উজ্জ্বল হতে পারত বিলক্ষণ । কী রকম সম্ভাবনা, কী রকম বঞ্চনা সেই কথাটা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে । শিল্পসংস্কৃতির দেশ-জাতি হিসেবে ফরাসিরা গৌরব করে বলে; তাদের একটিই মাতৃভূমি, সেটা হল ফ্রান্স । কিন্তু পৃথিবীর অন্য সকল দেশের সংস্কৃতিপ্রবণ নাগরিকদের মাতৃভূমি দুটি! একটি তার স্বদেশ, আর অন্যটি হল ফ্রান্স । অথচ তাদের চাইতে বা পৃথিবীর যে কোনো জাতি-রাষ্ট্রের চাইতে আমরা বেশি সংস্কৃতিবান । বাংলাদেশই পৃথিবীর একমাত্র রাষ্ট্র যা ভাষাভিত্তিক, সংস্কৃতিভিত্তিক । এবং ভাষা ও সংস্কৃতির চেতনা তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের মতো মহান মাঠে অকুতোভয় করেছে । এবং শেষ পর্যন্ত তাদের একুশে বা ভাষা আন্দোলনের অর্জনটি হয়ে উঠেছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ।' অর্থাৎ বাংলা হয়ে উঠেছে সকল ভাষারই মা-ভাষা । সুতরাং আমরাও বলতেই পারি বা এতদিনে বলতে পারাটাই সমীচীন ছিল যে, বাঙালিদের একটাই মাতৃভাষা– বাংলা । কিন্তু পৃথিবীর আর সব ভাষাভাষীর মাতৃভাষা দুটো, একটা হল তার নিজ ভাষা, আর অন্যটি হল 'বাংলা ভাষা' । আসলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের আত্মসমীক্ষার কোনো আয়োজন নেই বলে এখন পর্যন্ত আমাদের সামগ্রিক অবয়ব নিজেদের কাছে অদেখাই রয়ে গেছে । আমরা নিজেরাই রয়ে গেছি নিজের অচেনা ।

ছড়া বলুন ক্লেরিহিউ বলুন বা কবিতা, গান ইত্যাদি যে উপস্থাপনের যোগ্য সাহিত্যমাধ্যম, তাতে তাল-লয়ের প্রয়োজনে, রাগ-আলাপের আবহ তৈরির দরকারে, পারিবেশিক মোহ নির্মাণের প্রশ্নে কিছু অনর্থক বোল, শব্দঝংকার বা যাকে বলে ননসেন্স রাইমের আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় । তা নিজে কোনো অর্থজ্ঞাপক নয়, কিন্তু অন্যের অর্থকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে

সহায়ক পরিস্থিতি রচনা করে। যা আসলে সংস্কৃতিচর্চার, বিশেষত গান-ছড়া জাতীয় রচনার একটি লোক-ঢং। সেই সুন্দরের নির্ভরতা আমীরুল ইসলামের ছড়ায় খুব মানানসই মুনশিয়ানার সাথে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। ঝানু পাঠকমাত্রেরই তা অনুধাবনযোগ্য এবং উপভোগ্য। যেমন– 'তাক ধিনা ধিনতা' (পৃষ্ঠা ১৬), 'তাক ধিনা ধিন তানা' (পৃষ্ঠা ১৮), 'তাই তাই আই' (পৃষ্ঠা ১৯), 'ধিতাং ধিং' (পৃষ্ঠা ১৯), 'ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি' (পৃষ্ঠা ২৮), 'ধেই ধেই ধিনতা' (পৃষ্ঠা ৩২), 'লাপ্পা লারে লাপ্পা' (পৃষ্ঠা ৩২), 'হাঁইও হো' (পৃষ্ঠা ৫৪), 'উলুক ঝুলুক চুলবুলি (পৃষ্ঠা ১৬৫), 'হাঁউ মাউ খাঁউ'(পৃষ্ঠা ৫৮), 'ঢ্যাম কুড়াকুড়' (পৃষ্ঠা ৭২), 'চুটুর পুটুর পুট' (পৃষ্ঠা ৯৫), 'ধুম তা না না ধুম তা না না' (পৃষ্ঠা ১৪৬), 'হইচই হইচই' (পৃষ্ঠা ১৪৬), 'হিংটিং ছট' (পৃষ্ঠা ১৫০), 'আইকাম বাইকাম' (পৃষ্ঠা ১৮৫), এই রকমের আরো আছে। যা মূলতই লেখা ও কলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের একটি বিশেষ চারিত্র্য। এই সব লোক-উপাদানের ব্যবহার আমীরুলের ছড়াতে সমৃদ্ধি যোগাতে সহায়কীর ভূমিকা রেখেছে। একাধারে তা ছড়াকার হিসেবে আমীরুলের লোকরুচিরও নমুনা বটে। তিনি আধুনিক কিন্তু শেকড়লগ্নও। ফলে তাঁর ছড়া বাঙালির একালকে সেকালের পুরনো আত্মীয়তার সেতুবন্ধকে অটুট রেখেছে। ছড়ার বিষয়-বক্তব্য ছড়াও এইসব অনুষঙ্গ আমীরুলের সৃজনশীল ভেতর-অন্তরকে বুঝতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এখানে চট্ করে যেটা বলা যায়, এই রকমের অনর্থক ভাবশব্দ রবিঠাকুর (রে-রে-রে অথবা 'হিং টিং ছট'), লালন ফকির (তা-না-না-না), নজরুল ইসলাম (হৈ-হৈ-রব) প্রমুখ প্রচুর ব্যবহার করেছেন। মানে হল এ একটা যুগের ওপার থেকে বয়ে আসা একটা লোকজ ধারা, যা অতীতের বর্তমান বলে চিরকালের ভবিষ্যৎ।

এরপরে যেটা বলার– অন্য নানান রকমের লোকঅনুষঙ্গ এসেছে আমীরুল ইসলামের ছড়ানির্মিতিতে। তা কখনও খেলাধুলা, কখনো মেলা, কখনো-বা পূজাপার্বণ, উৎসব, খাদ্য, পোশাক, যুদ্ধ, রুপকথার কুশীলব, মিথ, বিশ্বাস, কুসংস্কার, প্রকৃতি, জন্তু-দানব ইত্যাদি। খুবই স্বাভাবিক যে, বাংলা ভাষায় বাঙালি ছড়াকার সাহিত্যচর্চা করবেন, আর এইসব বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি বা তাঁর ছড়া ইত্যাদি মুক্ত, এ নিশ্চয়ই হতে পারে না। আমরা যারা তাকে চাক্ষুষ করার সুযোগ পাই, তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের যে প্রজন্মের পাঠক তাকে দেখার সুযোগ পাবে না, তাদের জন্য এখানে বলে যথার্থ হবে যে, আমীরুল ইসলাম ছড়াকার হিসেবেও, মানুষ হিসেবেও সহজ, সোজা-সাপটা, হাসিখুশি, সাদাসিধে, অতীতরোমন্থক বাঙালি। নিরাভরণ পারিপট্যে তাঁর চলা এবং বলা। বিশেষত তাঁর ছড়া বিষয়ক বলা-বক্তব্যগুলো আমাদের অতীতচারিতায় সম্পদময়। এবং কেবল বাঙালির লোক-বিষয়য়ই নয়, সংশ্লিষ্ট প্রতিপদে প্রাসঙ্গিক বিদেশি লোকতথ্যও সমন্বিত হয় তাঁর বক্তৃতায়-বচনে। ছড়ায় খুব সহজ ভাষাভঙ্গিতে তিনি যে অনেক বিষয় তুলে আনতে দক্ষ, সে ক্ষেত্রে এটাই তাঁর অন্যতম কারণ যে, শুধু আত্মবীক্ষণে লোক-অতীতই নয়, অন্য দেশের, অন্য

জাতির প্রাচীন সাহিত্যেরও ঐবিধ জ্ঞান তাঁর টনটনা। এমনকি এইসব অতিনৈপুণ্যের কারণে তাঁর কিছু কিছু ছড়া এতটাই সোজা, যেন কিছুই না। এবং নিজের কনফিডেন্স লেভেল বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকায় প্রায় তিনি এক-বৈঠকে ছড়া লেখা চূড়ান্ত করেন বলে মনে হয়। অন্তত আমার ধারণা এই রকমই, পরে আর তিনি নিজের ছড়াকে কাটাছেঁড়া করেন না, করার সময় পান না বা করার প্রয়োজন বা চাঁড় বোধ করেন না। এরও বহু উদাহরণ দেয়া যায়, কিন্তু তা এখানে প্রাসাঙ্গিক হবে না। তার চাইতে বরং এখানে এমনকিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা যায় বা গেলে ভালো হয়, যেখানে তার নানাবিধি লোকপ্রীতির রোমাঞ্চ অনুভব করা যাবে। যেমন:

বাবার জুতো দাদার জামা
মুড়কি মোয়া মুড়ির ধামা'...(পৃষ্ঠা ১২)।

তার পর বলা যায়–

'গপ গপ
আলু চপ
কম কম
চম চম।' (পৃষ্ঠা ২৪)।

'কত ধানে কত চাল
ভেবে ভেবে নাজেহাল।' (পৃষ্ঠা ৪৩)।

'মাছে ভাতে বাঙালি, মাছ খাও আস্ত
না খেলে কী করে হবে তাগড়াই স্বাস্থ্য?' (পৃষ্ঠা ৫১)।

'গুড়িমুড়ি খাই।
গুড় যদি কম থাকে
মামার বাড়ি যাই'... (পৃষ্ঠা ১৩৮)।

এই রকমের বহু উদাহরণ রয়েছে আমীরুল ইসলামের ছড়ার পঙক্তিতে। তবে এ বিষয়ক আর একটা উল্লেখকে উদ্ধৃত করি, সেটা হল–

'পানতা খাবো ইলিশ খাবো
নেভার মাটন চপ
খাবার বেলায় ম্যায় বাঙালি
ভালোই আমার কপ।' (পৃষ্ঠা ১১৪)।

এ আসলে একটা ভাত টিপেই হাঁড়ির সব ভাতের অবস্থা নির্ণয়। উপরের উদ্ধৃতিগুলোর দিকে লক্ষ করলেই আঁচ করা যাবে, কথগুলো খুব সাধারণ এবং লকলকে সরল। এখানে কোনো দার্শনিক ভেদ না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু লোকবাংলার যে অতীতমুখী আয়না এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তার পারদের মাজেজা বিক্ষিপ্ত হবার আবশ্যিকতা রয়েছে। চমচম,

রসগোল্লা এইসব দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন বললেই বাঙালির লোকখাদ্য এবং খাদ্যরসিকতার চিত্র আমাদের চিন্তাপটে ফুটে ওঠে। গুড়ের জিলাপি, জিবেগজা, পানতোয়া, ফুলকো লুচি, আমিত্তি, সন্দেশ, রাজভোগ, বন্দে, রসমঞ্জরি, রসকদম্ব, প্যারা, মণ্ডা, কাঁচাগোল্লা এইসব খাবার আমাদের অতীপ্রাচীন কাল থেকে জিভে রস আনে। এবং আমাদের সামাজিক জীবনবাস্তবতায় দুধেল গরু পালনের ইতিহাসও দৃশ্যায়িত হয়। আর 'কত ধানে কত চাল' যে লোকশ্লোকটিকে আমীরুল ইসলাম ব্যবহার করেছেন, সেটা তো বাঙালিমাত্রেরই জানা। কর্মফল বা খারাপ কাজের পরিণতি বোঝাতে এ হচ্ছে সংসদীয় ভাষায় এক ধরনের শাসানি বা বলা যেতে পারে চোখরাঙানি। আবার ভালো কিছু অর্জন করতে যে কী বেশি পরিমাণ কসরত করতে হয়, সেটা বোঝাতেই এই বাগধারাটার ব্যাপক ব্যবহার পাওয়া যায় আমাদের জীবনসাহিত্যে। মানে বাক্যটি কোথায় ব্যবহৃত, তার ওপর নির্ভর করে যে মামুলি ধান আর চাল দিয়ে কী বলা বা বোঝানো হল। আর মাছে-ভাতে বাঙালি সে তো চিরপ্রাচীন, চিরনতুন, বাঙালি জাতির সঙ্গের-সাথি একটি অমর পঙ্‌ক্তি। সেখানে কেবল যে আমাদের খাদ্যপছন্দের বিষয়টা রয়েছে, স্বাস্থ্যজ্ঞানের আভাস রয়েছে, পুষ্টির প্রচার রয়েছে তা-ই কিন্তু নয়। ঐসব কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতার একটা দূরের ইতিহাসও এখানে পাওয়া যায়। অন্যকোনো উদাহরণও এখানে আমীরুল ইসলাম ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তাতে করে তাঁর সংশ্লিষ্ট ছড়াটি (আয়ুবৃদ্ধি) যে লোকমর্যাদা পেয়েছে, সেটা পেত না। তার পরে গুড়মুড়ি, চিড়ে-খাগড়াই, বাতাসা-কদমা এসবের বেলাতেও একই কথা। আবহমান কালের যে বাঙালি সমাজচিত্র, সেইটেই এখানে বড় বিষয় বলে লেখকের কাছে বিবেচিত। শেষে যে উদ্ধৃতিটি দেয়া হয়েছে যে, 'পানতা খাবো ইলিশ খাবো। নেভার মাটন চপ'। এখানে অধুনাকালের পোস্ট, বার্গার, মাটনচপ ইত্যাদি ফাস্টফুড থেকে বাঙালিকে বিমুখ করার চেষ্টা, সেটা হয়তো ঠিক আছে বা ঠিক নেই। সেই আলোচনায় যাব না। কারণ বাইরে থেকে যখন যন্ত্রপাতি আসে, তখন সেখানকার সংস্কৃতিও আসে, বিদেশ থেকে উপভোগ্য আসলে দুর্ভোগ্যও আসে। এখন তার কোনটা গ্রহণ করলে এবং বর্জন করলে আমার সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বা লাভবান হবে, সেটা নির্ভর করবে আমাদের রুচি-চেতনার ওপর। এখন কর্পোরেট কালচারকে প্রতিপালন করব আর সহজপ্রাপ্য মজাদার ভোগ্যকেও বর্জন করব সেই কাজটা খুব কঠিন। বিশেষ করে ভোগবাদ যখন পুরো পৃথিবীকে আষ্টেপৃষ্টে পেঁচিয়ে ধরেছে। এই উদ্ধৃতি নিয়ে এ-ও আমার মূল আলোচনা নয়। আমি যেটা বলতে চাই, তা অনেকটাই প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ছড়াকারের সাথে আমার বিনীত দ্বিমত। 'নেভার মাটন চপ' একথাটা আমার পছন্দই হয়েছে। তবে 'নেভার' বলতে বোধহয় একেবারেই ' নেভার' নয়, কম, এতটাই কম যে, নেই বললেই চলে। ছড়ার ভাষা হিসেবে যথার্থ। কিন্তু আমার বলা-বক্তব্য হল 'পানতা খাবো ইলিশ খাবো' এই লাইনটা নিয়ে।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যাঁরা প্রতিনিধিত্বশীল ছড়াকার, সন্দেহ নেই আমীরুল ইসলাম তাঁদেরই একজন। এছাড়া অগ্রসর মেধার বাঙালি হিসেবেও তিনি একজন মান্য। তিনি যখন

এই 'পান্তা ইলিশ' মেনুটা উল্লেখ করেছেন, তখন চট করে সে বিষয়ে একটা ভিন্নমত ব্যক্ত করতে দ্বিধা-দোনোমনোও হয়। আবার সাহসও যে একেবারেই হয় না তা তো আর নয়। কারণ বাঙালি হিসেবে ইলিশের ভাগে আমারও তো অধিকার বলে কথা। আমি খুব সংসদীয় ভাষায় বলছি যে, 'পান্তা ইলিশ' শুনলে পরে মনে হয় যেন বাঙালির অতি প্রাচীন একটি খাদ্যতালিকা এটি। কিন্তু প্রশ্ন হল বাস্তবে কি তা-ই? 'পান্তা-ইলিশ' কি বাঙালির লোভাতুর কোনো খাবার? তারা কি এটা সুযোগ পেলেই খায়? অথবা এমন কোনো অতীত আছে কি, যখন আমরা 'পান্তা ইলিশ' খেতাম বা প্রিয় খাদ্য হিসেবে খেতাম? এবং বাঙালির যে রেসিপি, যে খাদ্যাভ্যাস, তাতেও কি পান্তাভাতের সাথে ইলিশ একটুও মানিয়ে যায়? যে কোনো বাঙালি লেখক-পণ্ডিত পাঠককে বিনম্র শব্দায়নে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমরা কি আমাদের কোনো প্রাচীন সাহিত্যে, বর্ণনায়, আয়োজনে, উল্লেখ দেখাতে পারব যে, বাঙালি 'পান্তা-ইলিশ' খায় বা পছন্দ করে খেতো? আমার যে সীমাবদ্ধ জানাজানি এবং পড়াশুনো, তাতে এমন কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাছাড়া এমনিতেও তো ঠাওর করা যায়, বাসি-পান্তা হল বাঙালির গরিবি খানা। একটু মাদকতায় ঝাঁজালো হয়ে পান্তা কাঁচামরিচ চট্‌কে লবণ দিয়ে মাখিয়ে কামড় দিয়ে-দিয়ে পেঁয়াজ সহযোগে খাওয়াটাই হল বাঙালির লোকঐতিহ্য। এর সাথে বাসি কোনো ডাল বা ভাজি ভুজি থাকলে সেটাকে দিয়েও খাওয়া চলত। বিকল্প হিসেবে বা শখ করে পাকা কাঁঠাল দিয়েও নোনা-পান্তা খাওয়ার খবর পাওয়া যায়। কিন্তু 'পান্তা-ইলিশ' কখ্‌খনো না। পারলে বরং প্রাত্যাহিক গরিবি পান্তা রেখে বছরের শুরুতে, হালখাতার দিনে একটু ভালো কোনো আনকমন খাওয়া-দাওয়ার চেষ্টা থাকত বাঙালির। হালের শহুরে সৌখিন বাঙালিরা এই বেমানান 'পান্তা ইলিশের' প্রবর্তক। এটা নিতান্ত পোশাকি, ঢং। অতএব, আমীরুল ইসলামের 'ছড়া' শিরোনামের এই ছড়াটিতে যখন মাটন চপকে একেবারে 'নেভার' বলে 'পান্তা ইলিশ' খাবার কথা বলা হচ্ছে, এবং ছড়াটির তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে দাবি করা হচ্ছে যে- 'খাওয়ার বেলায় ম্যায় বাঙালি'; তখন মনে হয় যেন আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকখাদ্য হিসেবে 'পানতা ইলিশের' প্রাচীনত্ব রয়েছে। কিন্তু সত্য আদতে তা নয়। অতএব, যে প্রাতিষ্ঠিক পর্যায় থেকে আমীরুল ইসলাম এই বিষয়টিকে তাঁর ছড়ায় অঙ্গীভূত করেছেন, তাতে কথা ওঠার সুযোগ বোধ করি রয়েই গেছে।

বাঙালির যে কুসংস্কার ও লোকবিশ্বাস রয়েছে, জাতির লোকসাহিত্যে তার একটা মজবুত অবস্থান এবং প্রভাবক-সক্ষমতা অস্বীকার করা যায় না। এমনকি কখনো কখনো বাঙালির মার্গীয় এবং পালনীয় যে সব অলোকের বিশ্বাস রয়েছে, সেসবও কুসংস্কারের মতো একার্থবোধক হয়ে আছে। এইসব বিষয় আমীরুলের ছড়ায় স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। তবে মাত্রাগত দিক থেকে তাকে ব্যাপক বলা যাবে না। কিন্তু বিষয়গুলো যে তাঁর ছড়ায় নানামাত্রিক রেখায় উঠে এসেছে, তার অলংঘনীয় সাহিত্যমূল্য অবশ্যই আছে। তারও দু-চারটে উদাহরণ এখানে তুলে ধরা যেতেই পারে-

'ভূতরা নাচে ধিতাং ধিং

ভূতের মাথায় লম্বা শিং
শিং এর উপর আলোর ফুল
খুকু হারায় কানের দুল।' (পৃষ্ঠা ১৯)।

'নেই' ভূতকে আছে করে রাখার এক আশ্চর্য ক্ষমতা আমদের। তাহলে ভূতই নেই তো মাথা কী? তো নেই মাথাতে যদি শিংই আছে, তাহলে তাকে বেঁটে করার কী প্রয়োজন! অতএব, 'ভূতের মাথায় লম্বা শিং'...। এই রকমের বহু আছে তাঁর ছড়ায়। 'আগন্তুক' ছড়ার শুরুটা এরকম–

'লোহার মুখ রুপোর চোখ
হীরের কুচি দাঁত
মধ্যরাতে জানালা দিয়ে
বাড়িয়ে দিলো হাত। (পৃষ্ঠা ২৩)।

এই রকম হলে গা-ছমছম না করে উপায় কী? এই রকমের আছে 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' (পৃষ্ঠা ২৪)।

'ভূত এসেছে আমার ঘরে কি করি, কি করি
মধ্য রাতে ভূতের ভয়ে হাত পা কেঁপে মরি।
বুকে আমি থুতু ছিটাই না যেন পাই ভয়।
ভূতের কাছে হেরে গেলে বিরাট পরাজয়।' (পৃষ্ঠা ৩৬)।

ভূতদের এই এক অভ্যেস। যত কাণ্ডকারখানা রাত-অন্ধকারে, অমাবশ্যায়, পোড়োবাড়িতে, শ্মশানে, গোরস্তানে, তেঁতুল আর শেওড়াগাছের তলায়। মানে যত আঁধার রাত, অন্ধকারটা যত ভুরকুটি-জমাটি-ঘন, ভূতদের আনাগোনা ততো সুবিধে। দিনের বেলায় বা ইলেকট্রিকের আলোয় তাদের কোনো আনাগোনা নেই। সারাদিন ভরে শেওড়া আর তালগাছে ঘুমুবে। আর রাত নামলেই তারা সেখান থেকে নেমে এসে যত পেঁজোমি শুরু করবে। বুকে থুতু নিলে নাকি ভয় কেটে যায়। সেই লোকসংস্কারটা খুব সহজ-শুভ্রভাবে এসেছে আমীরুলের ছড়ায়। আরও কিছু উদাহরণ এখানে দেয়া যায়—

'এক ছিল হাঁউ আর
এক ছিল মাঁউ
দুয়ে মিলে সারাদিন
হাঁউ মাউ খাঁউ।' (পৃষ্ঠা ৬২)।

'ভূত রয়েছে চৌদিকে
ভূতে ধরে বৌ'দিকে
বৌদি ছিল চ্যাঁচানি
প্যাঁচা বলে প্যাঁচানি... (পৃষ্ঠা ১১৯)।

'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়

দুয়ে দুয়ে পাঁচ হিসাব মিলায় । (পৃষ্ঠা ১৪৮) ।
ওঝা মানে বদ্যিবুড়ো
ভূতের চোখে মরিচ গুঁড়ো । (পৃষ্ঠা ২৫৪) ।
'কেউ আমরা পুকুরপাড়ে
যেতাম না সন্ধ্যাতে
তেঁতুল গাছে ভূতরা থাকে
ভূত আসে রোজ রাতে ।
বড় বড় ডাণ্ডা থাকে
কালো ভূতের হাতে ।' (পৃষ্ঠা ২৭৬) ।
'কোথায় আছে দুধসাগরের ঢেউ?
ব্যঙ্গমাদের খোঁজ পাবে না কেউ?...
কোথায় আছে পক্ষীরাজের ঘোড়া
ঘোড়ারে তুই পাখনা দুটি ওড়া ।
আছে ফুল পরীদের ঘর,
কোথায় দূরের উধাও তেপান্তর'–(পৃষ্ঠা ৩৮৩) ।

আসলে জ্ঞান যেখানে শেষ হয়, বিশ্বাস কিংবা যাকে বলে 'সংশয়বাদ' সেখান থেকে শুরু হয় । সেই কারণে 'জ্ঞান' জ্ঞানও আবার বিশ্বাসও, কিন্তু বিশ্বাস কোনো জ্ঞান নয়, সে কেবলই বিশ্বাস । সেই জন্যই উপরের উদ্ধৃতিগুলোয় দেখা যায়– বৌদিকে ভূতে ধরে, সুখে থাকতে ভূতে কিলায়, বদ্যি বুড়ো ওঝা হয়ে লোকচিকিৎসা করে । শুকনো মরিচ পোড়ানো ধোঁয়া দেয়া হয় ভূতের চোখে-মুখে । আর সন্ধ্যা নামলে পুকুরপাড়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না, 'প্রশ্নই ওঠে না', মানে সাহসেও কুলোয় না । কারণ সেখানে আছে তেঁতুলগাছ, –যেটা কিনা ভূতেদের বসবাসের আখড়া । ভূত যখন, তো কালো, যে যেমন দেখে আর কি, কল্পনার দেখা তো! আসে তার হাতে দাও তুলে মানানসই অস্ত্রাপাতি । অস্ত্র বলতে সেই সেকেলে সোটা । কোনো অবস্থাতেই গদা নয়, গাদা বন্দুক নয় একালের আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র তো নয়ই । কারণ ভূত-প্রেতরা তো সেকেলে, আমাদের কল্পনাকে তারা অতিক্রম করতে পারবে কেন! তাই তারা একটুও গ্রাজুয়েটে হয়নি! এখনও সে-ই নাকে কথা, এখনও সেই শেওড়া- তেঁতুল-তালগাছে বসবাস, এখনও মানুষকে ছেঁচড়া ভয় দেখানো বটে মানুষের কল্পনার হিম্মত, গোঁজামিলে হলেও একটা মিল তো বটেই । সেই সাথে যোগ হয়েছে দুধসাগর, পক্ষীরাজ ঘোড়া, নানা প্রজাতির পরি-পেতনি, গোদান, শকসো, জিন, প্রেত । এইসব মিথ আর রূপকথা, ভুল ভয় আর আনন্দ সবকিছুই সমৃদ্ধ করেছে আমীরুলের ছড়ার জগৎকে । তাঁর ছড়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়– বড়দের ছড়া আর ছোটদের ছড়া । বড়দের ছড়া সহজ, কেননা তা কেবলই বড়দের । কিন্তু ছোটদের ছড়া বেশি সহজ বলে লেখার বিষয় হিসেবে কঠিন । এই কঠিনেরে

ভালোবাসা এই জন্য কঠিন যে, তা কেবলই ছোটদের জন্য নয়। যুগপৎভাবে সেগুলো ছোটদের-বড়দের সকলের।

আমীরুল ইসলাম বলেছেন বটে, সহজ করে ছড়া লেখা কঠিন, কিন্তু সেই কঠিনকে অনুশীলন করতে তিনি পাকা মণিকার। আসলে তিনি ভালো কারেই জানেন যে, লেখার জন্য কব্জিতে জোর থাকলে সামান্য 'পাউরুটি আর ঝোলা গুড়' দিয়েও অসাধারণ ছড়া লেখা সম্ভব। আর সেই মুরোদ না থাকলে তার তুলনায় অনেক মান-পুষ্টির দামিসব খাদ্য-খোরাক নিয়েও পচা ছড়া লেখা হয়। মূল সাহিত্যবিজ্ঞান হল ছড়ায় বর্ণিত দ্রব্যগুণে ছড়া ভালো হওয়াটা নির্ভর করে না, বরং সেটা নির্ভর করে ছড়াকারের দক্ষতার ওপর। এবং সেই দক্ষতা আমীরুলের যে আছে সে কথা খোলামেলাভাবে না বললেও বলে। তাঁর কথায়–

কেউ ছড়া লেখে দিন রাত।
নির্ঘুম কাটে তিন রাত।
কারো ছড়া খুব পষ্ট
ছড়া লেখা কী যে কষ্ট! (পৃষ্ঠা ২৬)।

ছোটদের প্রিয় পাত্র-পাত্রী বা কুশীলব বলতে যা বোঝায় বাবা, মা, ভাই-বোন, বন্ধু, গাছ, পাখি, নদী, পশু, পোকা, ফুল, ভূত-প্রেত, স্বাধীনতা, একুশে, মহান মুক্তিযুদ্ধ সবই এসেছে তাঁর ছড়ায়। সেখানে যে ব্যক্তিবিশেষের নামসমাগম ঘটেছে তার একটা অসম্পন্ন তালিকা এখানে করা যেতে পারে। সেটা করা গেলে দেখা যাবে সেখানে রয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, আকরাম খান, আনিসুজ্জামান ড., আফরোজা বানু, আব্বাসউদ্দিন, আফজাল হোসেন, আব্দুল্লা আবু সাঈদ, আব্দুল্লা আল মামুন, আনিসুল হক, আযম খান, আয়ুব খান, আরজ আলী মাতুব্বর, আল মাহমুদ, আলী ইমাম, আসলাম সানী, আসাদ চৌধুরী, ইউনুস ড., ইমদাদুল হক মিলন, ইয়াহিয়া খান, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঋত্বিক ঘটক, এখলাস উদ্দিন আহমদ, এঞ্জেলা গমেজ, এম আর আখতার মুকুল, এসএম সুলতান, কাইয়ুম চৌধুরী, কামরুল হাসান, কামাল লোহানী, খায়রুল আলম সবুজ, জসীম উদ্‌দীন, জয়নুল আবেদিন, জহির রায়হান, জাহানারা ইমাম, জুয়েল আইচ, জিয়া (গ্রান্ডমাস্টার), জীবনানন্দ দাশ, টিক্‌কা খান, তসলিমা নাসরিন, তারামন বিবি, তিতুমীর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, দীনেশ সেন, ধ্রুব এষ, নজরুল ইসলাম, নিউটন, নির্মলেন্দু গুণ, নূর হোসেন, পাবলো পিকাসো, ফয়েজ আহমেদ, ফরিদুর রেজা সাগর, বেগম রোকেয়া, ব্রজেন দাস, ভাসানি, ভ্যানগগ, মঈনুল আহসান সাবের, মধুসুদন দত্ত, মহাদেব সাহা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মান্না দে, মুনতাসির মামুন, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, মোস্তফা মনোয়ার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রফিক আজাদ, রফিকুন্নবী, রফিকুল হক, রমেশ শীল, রাবেয়া খাতুন, রাহাত খান, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই, লালন ফকির, লিও টলস্টয়, শওকত ওসমান, শাইখ সিরাজ, শামসুর রাহমান, শাহরিয়ার কবির, শাহাবুদ্দীন নাগরী, শিশির ভট্টাচার্য, শেখ মুজিব (বঙ্গবন্ধু), সত্যজিৎ রায়, সমরেশ বসু, সলিল চৌধুরী, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুকুমার রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুফিয়া কামাল, সুবর্ণা মোস্তফা, সূর্য সেন, সেলিনা হোসেন,

সৈয়দ শামসুল হক, হানিফ সংকেত, হাবিবুর রহমান, হাসন রাজা, হাশেম খান, হুমায়ুন আজাদ, হুমায়ুন আহমেদ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ৯৯টি উজ্জ্বল নাম। এ নামগুলো নেয়া হয়েছে মোটামুটিভাবে ছড়ার শিরোনাম থেকে। অর্থাৎ ছড়ার শরীর জুড়ে রয়েছে এর চাইতে আরও বেশিসংখ্যক। অবশ্যি গালিভার, কাজলরেখা, ঠাকুমা, কাজলরেখা, টোকাই, সিন্ডারেলা ধরনের নামগুলো এই তালিকায় নেয়া হয়নি। বাদ রাখা হয়েছে প্রিয়, আমি, হাবু-গাবুদের কমপক্ষে আরও ১৫টি নাম। এখন নিশ্চয়ই আন্দাজ করা যাচ্ছে যে, আমীরুল ইসলামের ছড়াজগৎ কী বিপুল পরিমাণ পরিসরকে ধারণ করেছে এবং এইসব এক একটি নাম কত ব্যাপক পরিমণ্ডলের প্রতিনিধিত্ব করে। এছাড়া এরও অন্যান্য প্রচুর বিষয়-বক্তব্য তো তাঁর রয়েছেই। অর্থাৎ আমীরুলের ছড়ার রাজত্ব বিপুল বৈভবে পরিপূর্ণ। তাঁকে আমাদের সাহিত্য হয়তো এখনই যথাযথ মূল্যায়ন করছে না, কিন্তু ভবিষ্যৎ-আলোচক এবং যেকোনো সময়ের গবেষকরা তাঁকে ধর্তব্যের বাইরে রাখতে পারবেন না। বিশেষত ছড়া রচনা, তার নানা দৃষ্টিকৌণিক ভাঙাভাঙি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিন্যাসবীক্ষণ, অন্ত্যমিলসমীক্ষা– এমনকি অন্ত্যমিলকে অগ্রাহ্য করার প্রথম-প্রবণতা সব মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তিনি যেসব মাত্রা যোগ করেছেন, যেসব নতুন পথের সন্ধান করেছেন তাতে করে তাঁকে ছড়ান্তপ্রাণ নিবেদিত ছড়াপ্রকৌশলী বললে খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। বিশেষত তিনি যে অন্ত্যমিলবিহীন ছড়া লেখার চেষ্টা এবং পরীক্ষাটি করেছেন সেটা নিয়ে মিশ্র মূল্যায়নের সুযোগ মনে হয় আছে। আমার মূলত এরকমটাই মনে হয় যে, কবিতার বেলায় ছন্দ অপরিহার্য, আর ছড়ার বেলায় ছন্দ এবং অন্ত্যমিল দুটোই অলংঘনীয়। আর সেই জন্যই সত্যিকারের ভালো ছড়া লেখা ভালো কবিতা লেখার চাইতে দুরূহ। তাই, বিষয়টি দাঁড়িয়ে যাবে কি না এখনও ভাববার বিষয়। তবে অন্ত্যমিলবিহীন ছড়াগুলোকে যদি ছোটদের গদ্যকবিতা বলা হয়, তাহলে কোনো প্রশ্ন নেই। সেটা হতেই পারে, বড়দের জন্য যদি হয়, তাহলে ছোটদের বেলায় কেন হতে পারবে না। তবে ছোটরা বা ঐসব ছড়ার বড় যারা পাঠক, তারা বিষয়টিকে কিভাবে নেন সেটিই লক্ষ করার ব্যাপার! সে যা হয় হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমীরুল ইসলাম যে একটা নতুন চিন্তার খোরাক যুগিয়েছেন, তার ভাবপুষ্টির মূল্য কম নয়।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আমীরুলের অন্ত্যমিল পরিসজ্জার মুনশিয়ানা বিষয়ে দু-চারটি উদাহরণ টানলে ভালো হয়। তাঁর ছড়ায় সাধারণ যে অন্ত্যমিল, তা তো আছেই হাজার-হাজার। কিন্তু অসাধারণ যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্যবিধ ব্যতিক্রমী অন্ত্যমিল, তার অসাধারণত্ব বিস্ময় সৃষ্টি করে। যাকে বলা যেতে পারে– খুট্ করে অন্যরকম, একটুর জন্য অসাধারণ, সহজ বলে দোলা-জাগানি। তার নমুনা অন্বেষণ করা যেতে পারে: চিন্তে' কাল/ইন্তেকাল, ফারজানা/তার জানা, পানদানীতে/ চান্দা নিতে, খাপছাড়া/ মাপ ছাড়া, বোকামি/ লোক আমি, তাই যে রিয়া/ নাইজেরিয়া, বিথি ও পিয়া/ ইথিওপিয়া, 'রাজা' তো' সে/ বাজাতো সে, নামী সে/ আমিষে, ছড়া লেখায়/ পড়ালেখায়, আচার্য/ বাঁচার যো– এই রকমের আরও অনেক আছে। ছোট ছোট সামান্য, কিন্তু বাহ্যত, নির্মাণকলার দিক দিয়ে মেধাক্ষরণের ফসল হিসেবে

তা কি অসামান্য নয়? আমীরুলের দুর্বল মিলের উদাহরণও কম নেই। কিন্তু সেটা তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। তাছাড়া দশকের পর দশক জুড়ে যে অক্লান্ত লেখালেখি, তার কাল, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা, পরিপক্বতার কালপরম্পরা অধি-ঘাতটি তো থাকবেই থাকবে। তা কেবল আমীরুলের ক্ষেত্রে নয়, বাংলা বা যে কোনো ভাষার যে কোনো লেখকের বেলায় সত্য। তো আমীরুলের অন্ত্যমিল, দুর্বলতা-সবলতা আর অন্ত্যমিল লংঘন করার যে প্রবণতা, তা আমাদের যার, দৃষ্টিতে যা-ই মনে হোক না কেন, তিনি নিজেও তাঁর 'মিল' শীর্ষক ছড়ায় এ বিষয়ে বলেছেন এবং সেই বলায় বোধকরি তিনি নিজেই নিজের দ্বারা কিছুটা আক্রান্ত হয়েছেন, বিশেষত অন্তমিলের ব্যাকরণ যখন ভাঙার চেষ্টায় তিনি সচেষ্ট। তিনি মিল-অন্ত্যমিল বিষয়ে বলেছেন:

'শুদ্ধ ছড়ার লেখক যারা
খুঁজবে তারা মিল,
মিলের সঙ্গে চিল মিলাবে
চিলের সঙ্গে নীলা।...
নীলের সঙ্গে বিল মিলাবে
বিলের সাথে বালা,
অন্ত্যমিল আর অনুপ্রাসের
অনেক রকম জ্বালা।...
জ্বালার সাথে তালা এবং
তালা সাথে তালি,
মিল হয়নি মিল হয়নি
শুনবে গালা/গালি।' (পৃষ্ঠা ২৭৩)

এখানে বোধহয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আর কোনো দরকার নেই। ছড়া, অন্ত্যমিল, উপমা, অনুপ্রাস, স্বরাঘাত, মাত্রা, পর্ব, ছন্দ, তাল, অদ্যাক্ষর, মধ্যমিল, ছড়া, পদ্য, ক্লোরাইড, লিমেরিক, হাইকু, তর্জা, শোলক, কবিতা, সংগীত এসবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিষয়ে যে কোনো চূড়ান্ত বা স্থির সিদ্ধান্ত নেই এই বাস্তবতার সাথে ছড়াক্ষেত্রে আমীরুলেরও নানা মতামত এবং তারও আবার পরিবর্তন, মাজা-ঘষা আছে, সেই সত্যই আসলে ধরা পড়ে তাঁর ব্যাপক বিস্তারিত ছড়ার শিল্পসৌকুমার্যে। তিনি ছড়ার জন্য জীবনভর যে সময়-শ্রম এবং একাগ্রতা নিবেদন করেছেন, তার যে তুলনা হয় না, সেইটেই বড় কথা।

আমীরুল ইসলামের 'ছড়া রচনাবলী-১'-এ ছড়াকার, ছড়া মানে, আষাঢ়ে ছড়া, সহজ ছড়া, বন্যার ছড়া, ছড়াপদ্য, মায়ারাণীর ছড়া, সহজ ছড়া, ছড়ার ছন্দ, বিষ্টির ছড়া, নবছড়া, নতুন ছড়া, ঢাকাই ছড়া, কড়া ছড়া, ভুল ছড়া, এই ধরনের নামে বেশকিছু ছড়া রয়েছে। এছাড়াও অন্ততপক্ষে ৮৯টি ছড়া এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, আসলে যেগুলোর কোনো নামকরণ হয়নি। সেগুলো 'ছড়া' এই শিরোনামে প্রকাশ করা হয়েছে। আবার এই দুই রকমের

ছড়ার বাইরে নূন্য তমপক্ষে আরও ৯টি ছড়া এতে সন্নিবেশিত রয়েছে, যেগুলোর শিরোনামই ‘লোকছড়া’। আমাদের এই আলোচনার প্রধান প্রতিপাদ্য তাঁর ছড়ার লোকউপাদান হওয়ায় আলোচ্য ছড়াগুলো আলাদা দৃষ্টি কাড়ার দাবি রাখে। যদিও ‘লোকছড়া’ নয়, বরং আমাদের বিষয়টি হল ‘ছড়ায় লোক-উপাদান’। এবং বলাই বাহুল্য সে ছড়া আমীরুল ইসলামের। তবুও আলোচ্য ‘লোকছড়া’গুলোর দিকে একটু নজর দেয়া যেতে পারে যে, সেগুলোকে এই রচনার সাথে সম্পর্কিত করা যায় কি না।

‘আমার বাড়ি যাইও ভোমর
বসতে দেব সোফা
পেটিস দেব, পেস্ট্রি দেব
জমবে খাওয়া তোফা।
জলপান যে করতে দেব
ডায়েট ফ্রি কোক
আমার বাড়ি যাইও ভোমর
সেথায় অনেক লোক।’ (পৃষ্ঠা ১২১)।

এই ছড়ায় মূলত বাঙালির তথাকথিত আধুনিক জীবনযাপনকে কটাক্ষ করার ছলে অতীত জীবনের স্মৃতিকাতরতার অভিব্যক্তি ঘটেছে। যা বলা হয়েছে তা আসলে এই ছড়ার বক্তব্য নয়, বরং যার জন্য এই বক্তব্য উঠে এসেছে, সেই লোকজীবনের প্রতি বিধুরতা, সেই সরল সৌন্দর্যের প্রতি মায়া-মোহকে জাগরিত করাই এখানে আসলকথা আগের জীবনের ক্ষেত্রে, পূর্বের অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে, আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে, খাদ্যাখাবারের ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন এসেছে এবং আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি কিভাবে নির্বাসিত হয়েছে সেই বেদনাই এখানে আনন্দিত। এবং ‘সেথায় থাকে অনেক লোক।’ এই পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া একান্নভুক্ত যৌথ পরিবারের স্মৃতির উদ্ভাসন ঘটানো হয়েছে। আরেকটা ছড়া, সেখানেও এই একই মনোবেদনার নস্টালজিয়া–

‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
পোলাও দেব মেপে
পোলাও নাকি নষ্ট
বিষ্টি নাই বিষ্টি নাই
কষ্ট আহা কষ্ট।’ (পৃষ্ঠা ১৪১)

আরেকটি ছড়া এখানে বেশ প্রনিধানযোগ্য হবে। যেখানে একটি লোকছড়ার ছন্দ-মাত্রা-ঢং গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে ছেলেভোলানি প্রাচীন ছড়াকাটার হারানো সত্যটি উঠে এসেছে। এবং একই সাথে বাঙালির উৎসবপ্রিয়তা ও দারিদ্র্যের চালচিত্র। কিন্তু অভাবের কষাঘাত যে আমাদেরকে সংস্কৃতিপ্রবণতা থেকে ফেরাতে পারে না, সেই গৌরবের সত্য উচ্চারিত হয়েছে। এতকিছুর পরেও সেই কল্প-জলাধার ‘ক্ষীর নদী’, সেই নদীতে খোকাবাবুর

মাছ ধরতে যাওয়া এবং নতুন বউ নিয়ে পালকিতে দুলে দুলে ফেরা। যদিও খোকামনির বিয়ের খরচপাতির টানাটানি।

'হৈ রে বাবুই হৈ
রাঙা ধানের খই
খোকামনির বিয়ে দেব
পয়সা-কড়ি কই ?
খোকন গেছে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে
একটা বউ বিয়ে করে
আসবে দুলে দুলে।' (পৃষ্ঠা ১৬৬)

আরেকটা 'লোকছড়া' বেশ গুরুত্ববহ। সমাজচিত্র, পারিবারিক দরদ-ভালোবাসা, মাতৃভক্তি এবং লোককল্পনাশ্রিত প্রকৃতি সব কিছু উঠে এসেছে যে রচনাটিতে। এবং ছড়াটি নির্মাণের ক্ষেত্রে আমীরুলের লোকসারল্য সত্যিই কি উপভোগ্য নয়?

'মেঘরাজারে মেঘরাজারে
তুইতো সোদর ভাই
একটুখানি মেঘা দিলে
ভিজ্জা ঘরে যাই।
ঘরে আমার মায়ে আছে
মায়ের মনে দুখ
মায়ের কথা ভাবতে গেলে
ফাইটা পড়ে বুক।
কচু ক্ষেতের পানি যেমন
টলমল করে
মার চোখের পানি দেখলে
বুক ভাঙিয়া পড়ে।' (পৃষ্ঠা ১৬৮)

মেঘকে সহোদর ভাই ডাকা কৃষিভিত্তিক বাঙালি-জীবনে এক বিস্ময়কর প্রকৃতিপ্রেম। যা কত সহজেই চিত্রিত হতে পেরেছে আমীরুল ইসলামের হাতে। আসলে ঐ যে, আগেও একবার বলেছি, কবজিতে জোর থাকলে 'পাউরুটি আর ঝোলাগুড়' দিয়েও ভালো ছড়া হয়। তা যদি না থাকে তাহলে ঘি-মাখন-পনির দিয়েও কিছু হয় না। 'মার চোখে পানি দেখলে/বুক ভাঙিয়া পড়ে' এ তো বাঙালি জাতির আদি-চিরন্তন এক পরিবারের বন্ধনচিত্র। এবং উপমাগুলো দৃঢ় সুন্দরের সাথে যে উপমেয়, সে দক্ষতার সাধুবাদ পুরোটাই আমীরুলের। শেষ ছড়াটার উদ্ধৃতি বেমানান হবে না এখানে–

'ইকিড় মিকিড় চামচিকির

রেল চলেছে ঝিকির ঝিকির
রেল যাবে দেরিতে
এরচে ভালো বাসে চেপে
পার হয়ে যাই ফেরিতে ।' (পৃষ্ঠা ২২৬) ।

এর আর ব্যাখ্যার দরকার নেই– সেকাল-একাল, বাহন, গতির পরিবর্তনজনিত সুবিধা ও সমস্যা । 'ঘাটে এসে গড়াগড়ি'র চিরন্তন বাঙালি আর কি । লোকছড়াগুলোসহ অনেক ছড়ার গাঁথুনির ক্ষেত্রে লোক-ঢং একটা প্রভাবক কলা হিসেবে কাজ করেছে আমীরুলের ওপর । সেটাকে 'নেয়া' না বলে 'অভিগ্রহণ' বললেই যথার্থ হয় । বাঙালি হিসেবে লোকমোটিফের ওপর তাঁর যে দুর্বলতা এবং ঝোঁক রয়েছে, জাতীয়তাবাদিতার এই সংক্রমণটি অন্য অনেক প্রথিতযশা বাঙালি কবি-ছড়াকারের মতো আমীরুলকেও বিশেষ মহিমা দান করেছে । লোকছড়া বাদেও লোকবাংলার বহু উপাদান তাঁর ছড়াকে অলংকৃত করেছে । এ ছড়া অন্য বেশ কয়জন দিকপাল কবি-ছড়াকারও তাঁর ওপর স্পষ্ট ভাবেই প্রভাবক । আবার অনেক অজ্ঞাত রচয়িতার ছড়ার দ্বারাও তিনি কম প্রভাবিত নয় । কিন্তু তা-সবের মধ্যেও তাঁর যে স্বকীয়তা, তাঁর যে মৌলিকত্ব সেটা আপন বিভায় প্রজ্বলিত । এবং যাঁরা সমকালীন ছড়া চর্চার সাথে চড়িত, তাঁরা জানবেন যে, চলতি সময়ের বহু ছড়াকারের ক্ষেত্রে আমীরুলও ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছেন । সব মিলিয়ে এক্ষেত্রে তিনি একজন সম্পদব্যক্তিত্ব । নিজে সমৃদ্ধ হন এবং অন্যকে সমৃদ্ধ করেন । এই বক্তব্যের আনুকূল্য দাবি করে এমন কয়েকটি ছড়ার উদ্ধৃতি এখানে প্রযুক্ত হতে পারে–

'তাই তাই তাই
মামাবাড়ি যাই
ছড়ায় পড়া মামার বাড়ি
কোথায় এখন পাই!
মামা থাকে আমেরিকায়
মামীর খবর নাই!' (পৃষ্ঠা ১৯) ।
'এক ছিল হাঁউ আর
এক ছিল মাঁউ
দুয়ে মিলে সারাদিন
হাঁউ মাউঁ খাঁউ ।' (পৃষ্ঠা ৬২) ।
'বেড়াল বেড়াল ডাক পাড়ি
এই বেড়ালের রাগ ভারি ।
আয়রে বেড়াল চলে আয়
এক লাফে তুই কোলে আয় ।' (পৃষ্ঠা ৭৪) ।
'জোটে যদি মোট একটি পয়সা

পাইবে না কিছু হে অনুরাগী
দুটি জোটে যদি তাও লাভ নেই
পাইবে না কিছু কেনার লাগি ।' (পৃষ্ঠা ৯৭) ।
'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর পথে এলো বান
আটকে গেল গাড়িঘোড়া, নৌকাগুলো আন
আটকে গেছে ডাবল ডেকার, আটকে গেছে জিপ
ঘরের চালে বসে এখন হাতে নিলাম ছিপ ।' (পৃষ্ঠা ৯৯) ।
'বিপদে মোরে রক্ষা করো
এটাই মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি পাচ্ছি কেবল ভয়
হাসপাতালে আহত আমি কে দেয় মোরে সান্ত্বনা
সন্ত্রাসীর ছুরিকাঘাতে জীবন সংশয় ।' (পৃষ্ঠা ১৩৫) ।
বাঙালি কোনদিনই
হয়নি স্বয়ম্ভর ।' (পৃষ্ঠা ১৬৪) ।
'সৎ সঙ্গে সর্বনাশ
অসৎসঙ্গে স্বর্গবাস ।'(পৃষ্ঠা ২০১) ।
আমার বাড়ি কমলাপুরে রেললাইনের ধারে
মায়ের লগে থাকি আমি ছোট্ট এ সংসারে ।
বাড়ি তো নয় বস্তি এটা পলিথিনে ছাওয়া
ঘর নড়বড় করতে থাকে একটু এলে হাওয়া ।' (পৃষ্ঠা ২১৯) ।
'ধান ফুরালো গান ফুরালো
বাঁচার উপায় কি?
এই দ্যাখো না তাইতো কিনে
পাথর এনেছি ।' (পৃষ্ঠা ২৩৬) ।

এই রকমের অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে আমীরুল ইসলাম সচেতন গ্রহণের মাধ্যমে প্রভাবিত। যেমনটি তিনিও অন্যের ক্ষেত্রে প্রভাবক। আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য– আমীরুল তাঁর ছড়ার শরীরে বহু ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এতে তাঁর যে মানবিক মানবিক মননের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা আসলে বৈশ্বিক ইস্যু হিসেবে মানবসমগ্রের আবশ্যিক লোকবিষয়। পৃথিবীর সব মানুষের কান্নার সুর এক এবং অন্তরের রক্তক্ষরণের কষ্ট অভিন্ন বোধে জারিত। অতএব তিনি যখন বলেন–

'উদার আকাশ মুক্ত বাতাস
শুনছি এসব নষ্ট হচ্ছে
ভাবতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ।' (পৃষ্ঠা ৩৮) ।

তখন তা দেশ, উপমহাদেশ ছাড়িয়ে বৈশ্বিক আন্তর্জাতিকতাবাদকে স্পর্শ করে। তিনি খুব ঋজু এবং সহজগ্রাহ্য করে বলেন, যেন কত সোজা! কিন্তু এইভাবে লেখার কাজটা যে শক্ত, তা অস্বীকার করা যায় না।

'মানুষের লোভী হাতের ছোঁয়ায়
কল-কারখানা গাড়ির ধোঁয়ায়
প্রিয় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে
টেপ টিভি এসি ভিসি আর নিয়ে
সকলেই খুব খুশি তো হচ্ছে।' (পৃষ্ঠা ৩৮)।

সমগ্রের জন্য এই রকম যখন অভিব্যক্তি, তখন তা মামুলি ছড়ার চাইতে বেশিকিছু হয়ে ওঠে। নিছক সাহিত্যের তুলনায় বড়কিছু মানবিক শ্রম হয়ে ওঠে।

'পানির ধর্ম অন্যরকম
নয় সে মুসলমান
জল বলতেও পানির কিন্তু
হয় না অসম্মান।
পানি এবং জলের মধ্যে
কিসের ব্যবধান?' (পৃষ্ঠা ৭৪)।

অসাম্প্রদায়িক উদারতার মধ্যে চেতনাকে অঙ্গীভূত করার এই এক আশ্চর্য কাব্যশক্তি আমীরুলের। একেই তো বলা যায় সমগ্রের হয়ে ওঠা। তাঁর এ ধরনের ভাবনা সাফল্যের আর একটা উদাহরণ দিই–

'ফিলিস্তিনি শিশু তোমার বুকে আঘাত মেরে
ভিনদেশি কোন দস্যু এসে স্বপ্ন নিলো কেড়ে?
উদোম গায়ে পথের মোড়ে কাঁদছো বসে তুমি,
কোথায় গেলো সোনায় রাঙা তোমার জন্মভূমি?
শাদায় কালোয় বিভেদ নিয়ে চলছে মারামারি
অন্ধকারে ছন্দহারা 'শান্তি' জমায় পাড়ি।....
বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ চলে তুমুল জাঁহাবাজ
আনন্দময় শিশুর মেলা বসবে কোথায় আজ?' (পৃষ্ঠা ১১১)।

আমীরুল ইসলামের ছড়ায় বাঙালি লোকখাদ্যের ঢের উল্লেখ আছে। যা একাধারে সাহিত্যগবেষণার আকর এবং পুষ্টিবিধিসহ ইতিহাস। সে আমলের সাথে এ আমলের তুলনামূলক আলোচনার তথ্যসহায়কও বটে। আসলে তাঁর ছড়ার পঙ্‌ক্তিগুলো যে নানা দিকে

নানা ভাবে বিশ্লেষিত হবার দাবি রাখে, এ-ও এক রকমের অসাধারণত্ব। এইভাবে বিষয়-উপস্থাপন ছড়ার একটা বৈশিষ্ট্য। ছড়া বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে পুরাতন মাধ্যম। প্রথমে তা মুখে-মুখে পার হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। পরে তা লেখ্যরূপ পায়। প্রথমে তা ছোটছোট, কারণ তাকে সহজে মুখস্থ করতে পারার প্রশ্ন ছিল। পরে তা মাঝারি, তারপরে বড়, পরে আরও বড়। সবকালেই ছড়ার অন্ত্যমিল তার ছন্দের মতো অপরিহার্য। সে কথা এখানে বলা হয়েছে, কিন্তু যেটা বলা হয়নি, তা হল তাঁর দুর্বল অন্ত্যমিলেরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। যার উদাহরণ টানাটা বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। এমনকি শব্দব্যবহারের সামান্য-সামান্য উদাসীনতা নিশ্চয়ই সম্পাদকের চোখ এড়িয়ে গেছে কেননা যেখানে তাঁর মতো বড় মাপের ছড়াকারের পঙ্‌ক্তিতে অবিকল অবয়বে 'কালোরাত্রি' (২৫ মার্চ– পৃষ্ঠা ১৮৭), 'বান্দরবন' পৃষ্ঠা ৩৪, 'সগৌরবে' পৃষ্ঠা ৩৬৭, 'সখ্যতা' পৃষ্ঠা ৩৭২ ইত্যাদি, এই রকমের অপকারী মেদসহ এবং উপকারী অস্থিহারা কিছু শব্দের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় সেখানে ভূমিকাটা রাখা দরকার ছিল প্রকাশকের চূড়ান্ত সম্পাদকের। এটি অবশ্যি প্রায়োগিক দিক, সে জন্য দায়ী না-আমীরুল, না তাঁর লোক-উপাদান।

অনেক মিলের আশ্রয় আছে তাঁর ছড়ায়। যার সামান্য ছোঁয়ায় অনেক পটভূমি যুক্ত হতে পেরেছে তাঁর রচনায়। যেমন একাধিকবার এসেছে 'বাকরখানি' এই খাবারটির নাম। যার শানেনুজুলে রয়েছে খনি বিবি এবং আগাবাকেরের প্রেমকাহিনি এবং করুণ পরিণতির রক্তক্ষরা গল্প। এই রকমের আরও আছে। যেমন: 'ডুমুর গাছে ফল রয়েছে ফুল নেই।' (পৃষ্ঠা ৫০), চাঁদের বুড়ি, দই মারার নেপো, বোতলভূত, হ্যামিলনের বাঁশিঅলা, আকাশগঙ্গা, নাক ও নরুন, মোহর ভরা সোনার ঘড়া, শাদা বেড়াল কালো বেড়াল, বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা, দুধের সাগর, পক্ষীরাজ, অচিনপুর, হোঁদলকুতকুত, মেঘের দেশের পরি, তেপান্তর, ঠাকুরমা'র ঝুলি, কুঁচবরণ রাজকন্যা, ঘোড়ার ডিম, মা দুর্গা, অচিন পাখি, ব্যঙ্গমা ইত্যাদি। এখানে উক্ত সবগুলো বিষয়-চরিত্র ঠিকঠিক মিথ কিনা সে বিষয়ে বলা-বক্তব্যের সুযোগ যে রয়েছে তা বিস্মৃত না হয়েই ওগুলোকে এখানে তুলে এনেছি। কোনোটি হয়তো বিশ্বাস, কোনোটি-বা কিংবদন্তি, গালগল্প, কথিত উপাখ্যান। সে যাই হোক মূলত আমীরুলের ছড়ার লোকমেজাজকে আলোকিত করতে এই এলোপাতাড়ি বিষয়-বিন্যাসের ব্যাপারটিকে সুহৃদ পাঠক যেন বিবেচনায় রাখেন। শেষে একথা বলা নিশ্চয়ই যায়, ছড়ার এক অমোঘ-অমেয় নির্মাতা হিসেবে ভাবীকাল আমীরুলকেও লোকবাংলার ভাবসম্পদ হিসেবে বিবেচনা করবে। তিনি তাঁর 'ছড়া রচনাবলী-১'-এর শেষ ছড়াটিতে বলেছেন–

'ছড়া কখনও হয় না শেষ
ছড়ার দেশ বাংলাদেশ।
হাটে ছড়া

মাঠে ছড়া
ছেলেবুড়ো কাটে ছড়া ।
ছড়া ছড়া অনেক ছড়া
ছড়ায় ছড়ায় ভুবন ভরা ।' (পৃষ্ঠা ৩৯২) ।

তিনি হয়তো ভেবেচিন্তেই এই ছড়াটাকে বইয়ের একদম শেষে সাজিয়েছেন যে, ছড়া বিষয়ে তাঁর ভাবনাসমগ্রের একটা ঘনীভূত উপসংহার এখানে উপস্থাপিত। যাতে তাঁর ছড়াবোধটুকু পাঠকের মনে দীর্ঘ অনুরণন তুলতে পারে। ভাবনা এবং সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক নয়। বইয়ের শুরুতেও ছড়া বিষয়ে তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি পাঠকের অনুকূল প্রস্তুতির আবহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছেন... 'ছড়ার আনন্দ যদি ফুরিয়ে যায় তবে আমার জীবনের আনন্দও ফুরিয়ে যাবে ।' এই লেখাটা এখানেই শেষ করে দিতে পারলে ভালো হত। কারণ বইটির প্রথম এবং শেষ পৃষ্ঠায় মাত্র দুটো লাইনের মধ্যে ছড়ার আমীরুলকে তিনি নিজেই তুলে ধরেছেন পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু তাঁর এই বিবেচনার সাথে আমার এবং অনেক পাঠকের বিবেচনা পুরোপুরি বা অংশত মিলবেই এমন তো না-ও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'... ঠিক সেই রকমের দার্শনিক ভেদ-গভীরতায় ভীষণ সহজে একটা ছড়া লিখেছেন আমীরুল– পৃষ্ঠা নম্বর ৩৬২–

'আমার মুক্তি ছড়ায় ছড়ায়
একটি ভালো ছড়া,
লিখতে যদি পারি তবে
আলোয় ভুবন ভরা ।'

আমার অনুভবটা এখন এই রকম যে, এমন অতৃপ্তিবোধই ছড়াকার হিসেবে আমীরুল ইসলামকে এতদূর এনেছে। এবং একই আত্মক্ষুধা তাঁকে নিয়ে যাবে আরও বহুদূর। তিনি গন্তব্যকে স্পর্শ করুন, এই শুভকামনা।

২৬.৯.২০১৮

সহায়কী:

১। ছড়া রচনাবলী-১, আমীরুল ইসলাম, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, মনিরুল হক, অন্যান্য, ৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা।
২। সোহেল মল্লিক, ছড়াকার, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

[লেখক: ছড়াশিল্পী ও শিশু-কিশোর সাহিত্যিক। একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।]

প্রবাদ-প্রবচনে সমাজচিত্রের প্রতিফলন

জা হা ঙ্গী র আ ল ম জা হা ন

বাংলাদেশের মৌলিক সমাজজীবনে বিভিন্ন ধরনের খেলা বিদ্যমান আছে। এর মধ্যে কিছু খেলা গৃহের অভ্যন্তরে এবং কিছু খেলা গৃহের বাইরে অনুষ্ঠিত হয়। এ রকম খেলার সংখ্যা অগণন। অধিকাংশ খেলার সঙ্গেই 'চি' বা খেলার ডাক ব্যবহার করতে দেখা যায়। এসব ডাক বা ছড়ার মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের প্রবহমান চিত্র ফুটে ওঠে এবং সমাজবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র এ দ্বারা সহজতর হয়। প্রচলিত খেলাধুলার মাধ্যমে শুধু শরীর বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চর্চাই হয় না; এর দ্বারা মানসিক আনন্দের খোরাক জোটে এবং মানুষের অবসর মুহূর্তগুলো বিনোদিত আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়।

অসংখ্য চিত্র এবং অসংখ্য ঘটনার সমবায়ে মানবজীবনের দু'একটি স্নিগ্ধ অনুভূতি শরৎকালের মেঘের মতো অতি সন্তর্পণে আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সম্ভাবনা ও প্রত্যাশায় নিরন্তর সচকিত হয়ে ওঠে। ছড়ার আদি উৎপত্তি কোনো পরিকল্পিত গবেষণার মাধ্যমে ঘটেনি। বরং সুপ্ত মনের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ হিসেবে স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। কালে কালে মানুষ ছড়ার ঢঙে কৌতুক বলা, গল্প বলা, ধাঁধাঁ বলা, প্রবাদ বলা বা হেঁয়ালি করার এক চমৎকার কৌশল আবিষ্কার করে। শুধু কি তাই, গ্রামীণ খেলাধুলায়– বিশেষ করে কাবাডি (কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে কাবাডিকে বলা হয় চিড়চিড়ানি), হাডুডু, বৌচি, গোল্লাছুট, কানামাছি, কুতকুত ইত্যাদি খেলায় দম ধরে খেলার ডাক বা 'চি' ধরার যে রেওয়াজ রয়েছে সেখানেও মুখে মুখে ছন্দোবদ্ধ ছড়া উচ্চারণের একটি প্রথা প্রচলিত আছে। এ ধরনের ডাক বা 'চি'র জন্য উচ্চারিত ছড়াগুলোরও কোনো লিখিত রূপ নেই বা সর্বপ্রথম কে এই ছড়াগুলো উচ্চারণ করেছিল তারও কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এ সকল কাব্যময় কথামালার কোনো লিখিত রূপ তো নেই-ই, এগুলোর কোনো নির্দিষ্ট লেখকও নেই। সুতরাং যা মুখে মুখে উচ্চারিত হতে হতে লোকসমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাকেই আমরা 'লোকসাহিত্য' হিসেবে বিবেচনা করে থাকি। লিখিত

অনেক উপাদানও লোকসাহিত্য হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে। ভারত উপ-মহাদেশীয় লোককাহিনির বিচিত্র গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে এ কথার সত্যতা পাওয়া যায়। *পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততি* বা *জাতক* প্রভৃতি লিখিত সাহিত্য এক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মৌখিক সাহিত্যও অনেক সময় লিখিত সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। *রামায়ণ, মহাভারত* এমনকি *ইলিয়াড* ও *ওডেসি*'র অনেক কাহিনি এবং ঘটনা মৌখিক ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং লোকসাহিত্য মূলত মৌখিক ঐতিহ্যগত সাহিত্য হলেও কখনো কখনো লিখিত সাহিত্য থেকেও এটি অনেক কিছুই গ্রহণ করে বা করেছে। লোকসাহিত্যের নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্র নেই। এর ক্ষেত্র বহুধাবিস্তৃত ও বহুমুখী। তা হতে পারে কবিতা, ছড়া, গান, প্রবাদ, ধাঁধাঁ, কিস্‌সা-কাহিনী, উপাখ্যান, রূপকথা, রসবার্তা অথবা এ জাতীয় যে কোনো কিছু। লোকসাহিত্য সমাজবদ্ধ শ্রমজীবী মানুষ বা লোকসমাজ হতে উদ্ভূত বিধায় এর মূল উদ্গাতা সেই সাধারণ মানুষ বা জনপদজন; যাকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে 'Common people'।

এই সাধারণ মানুষ বা জনপদজন (Common people) হতে উদ্ভূত কিশোরগঞ্জের আঞ্চলিক লোকছড়া নিয়ে এ রচনার অবতারণা। কিশোরগঞ্জ ১৩টি উপজেলা নিয়ে গঠিত বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতির একটি সমৃদ্ধ জেলা। এ জেলার লোকসাহিত্য সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এক বিরাট সঞ্চয়। কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্য নিয়ে গবেষণা করে অনেকেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত হয়েছেন। বলে রাখা প্রয়োজন যে, কিশোরগঞ্জে প্রচলিত লোকছড়ার অনেকগুলোর সাথেই বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার (ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোণা জেলার) এবং বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, নোয়াখালী, কুষ্টিয়া, যশোর এমনকি ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার অনেক লোকছড়ার অদ্ভুত মিল পাওয়া যায়। অর্থাৎ কিশোরগঞ্জে এমন অনেক লোকছড়া বা খেলার ডাক আছে, যা উল্লিখিত জেলাগুলোতেও প্রায় একইরকমভাবে প্রচলিত। এদিক থেকে অনুমান করা যায় যে, লোকছড়াগুলো অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করে অনেক সময় দেশব্যাপী পরিব্যাপ্ত ছিল কিংবা আছে। সে বিবেচনায় লোকছড়া নিঃসন্দেহে আমাদের অস্তিত্বের মূল বা শেকড়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং এগুলোই আমাদের আদি ও অকৃত্রিম ভাণ্ডার। এ রচনায় লোকসাহিত্যের বিশাল পরিসরে না গিয়ে শুধুই ছড়াসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রবাদ-প্রবচনে ছড়ার চারিত্র্য

বাংলা লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছে অপরিমেয় প্রবাদ-প্রবচন। প্রবাদ হচ্ছে নিরক্ষর লোকসমাজের যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফসল। আদিমকাল থেকেই আমাদের লোকসমাজ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং আপন চেষ্টাতেই সেসকল সমস্যার সমাধান করেছে। উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে তা-ই অতঃপর মানুষের মুখ থেকে প্রবাদ আকারে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের গ্রামীণ

জনসমাজে প্রচলিত প্রবাদগুলো ধর্ম এবং যাদুর প্রভাব থেকে রেহাই পায়নি। ধাঁধাঁর মতো প্রবাদও ধীরে ধীরে ধর্মনিরপেক্ষতা অর্জন করেছে। লোকসমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে একইরকম সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি হত। ফলে তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতাও ছিল প্রায় একইরকম। প্রাকৃতিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা ও সংকট সকল ধর্মভুক্তদের মধ্যে একইরকমভাবে সৃষ্টি হত। যে কারণে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মিলিত অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবেই প্রবাদের সৃষ্টি বলে মনে করা হয়।

বাংলা প্রবচনের ক্ষেত্রে 'খনা' নামক এক বাঙালি রমণীর অভিজ্ঞতালব্ধ বচনগুলো আমাদের লোকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। উপদেশধর্মী এ সকল বচন আজও আমাদের জনসমাজে কথায় কথায় উচ্চারিত হতে শোনা যায়। শুধু তাই নয়, কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে খনার বচনগুলোকে অনেকে অনুসরণীয় কর্তব্য বলেও বিবেচনা করে থাকেন। লোকসমাজে প্রচলিত ও উপদেশ হিসেবে অনুসৃত খনার বচনগুলো ছড়াধর্মিতায় ভরপুর। এছাড়া আমাদের নিরক্ষর গণমানুষের মুখ থেকে যে সকল প্রবাদের জন্ম হয়েছে সেগুলোতেও ছড়ার চারিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এ পর্যায়ে কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রবাদ হিসেবে প্রচলিত ছড়াধর্মী কথামালার কিছু উদাহরণ এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হল। উল্লেখ্য যে, এ সকল প্রবাদের কোনো সুনির্দিষ্ট লেখক নেই। এগুলো গ্রামের অশিক্ষিত, নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মৌখিক সৃষ্টি। তথাপি এগুলোতে অসাধারণ ছড়ার চারিত্র্য খুঁজে পাওয়া যায়। চমৎকার ছন্দ-মাত্রা ও অন্ত্যমিলের সমন্বয়ে সাধারণ নিরক্ষর মানুষের মুখ থেকে সৃষ্ট এই অসাধারণ কথামালা অনেক শিক্ষিতজনেরও ভাবনার খোরাক জোগায়।

প্রবাদগুলোতে ছন্দোবদ্ধ বাক্য দ্বারা অনুসরণীয় উপদেশ যেমন নিঃসৃত হয়েছে, তেমনি তির্যক শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও অনেক প্রবাদে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। কিশোরগঞ্জে প্রচলিত উপদেশধর্মী কয়েকটি ছন্দায়িত প্রবাদ নিম্নরূপ–

দিন থাকতে খাইট্টা খাও,
বেইল থাকতে আইট্টা যাও।

(শব্দার্থ : খাইট্টা খাও– খেটে খাও, বেইল– বেলা, আইট্টা যাও– হেঁটে যাও)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: উপর্যুক্ত প্রবাদের প্রমিত অর্থ খুঁজে বের করলে দেখা যায় যে, এই প্রবাদে দৈহিক স্বাস্থ্য ভালো থাকা অবস্থায় কায়িক শ্রমের মাধ্যমে মানুষকে জীবিকা নির্বাহ করতে বলা হয়েছে, আবার বেলা থাকতে থাকতে সূর্যাস্তের পূর্বেই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে হেঁটে যেতে বলা হয়েছে। যার সরল অর্থ এই যে, কোনো মানুষই যেন জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়। অর্থাৎ আপন শক্তি ও সামর্থ্যই যেন হয় প্রতিটি মানুষের একমাত্র অবলম্বন।

যে করে পরের আশ
তার ঘড়ে সর্বনাশ।

(শব্দার্থ: আশ– আশা, ঘড়ে– ঘটে)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: উপরের ছড়াধর্মী প্রবাদটিতেও উপদেশমূলক বাণী নিঃসৃত হয়েছে। নিজের কাজ নিজে না করে অন্যে এসে করে দেবে– এ আশায় বসে থাকলে তার ভাগ্যে সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না। অর্থাৎ এ প্রবাদেও অপরের মুখাপেক্ষী না হবার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ঊনা ভাতে দুনা বল
অধিক ভাতে রসাতল।

(শব্দার্থ: ঊনা– অল্প, দুনা– সামান্য)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: উপর্যুক্ত ছন্দোময় প্রবাদে স্বাস্থ্যগত সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি কম খায় তার যেমন স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা থাকে, তেমনি অধিক খেলেও রসাতলে যাবার সম্ভাবনা প্রবল হয়। উল্লিখিত প্রবাদে এই চিরন্তন সত্যটিকে উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। কথায় আছে– না খেয়ে মানুষ মরে না, মরে বেশি খেয়ে।

এমুন কথা কইও না কেউ কয় ঝুট
এমুন জা'গাত্ বইয়ো না কেউ কয় উঠ্।

(শব্দার্থ: এমুন– এমন, কইও– বলো, জা'গাত্– জায়গায়, বইয়ো– বসো)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: উল্লিখিত প্রবাদে নিগূঢ় সত্যের ছন্দোময় উপদেশটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রতিটি মানুষ জ্ঞান-গরিমা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে গড়ে উঠুক– এই চিরন্তন প্রত্যাশাটি উপরের প্রবাদে প্রকটভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বলা হচ্ছে কোনো স্থানে বা সমাজে এমন কথা যেন কেউ না বলে যা সবার বিবেচনায় ঝুট বা মিথ্যে বলে গণ্য হয়। আবার লোকসমাজে প্রত্যেকে যেন নিজের সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় রেখে কথা বলেন এবং এমন স্থানে বসেন যাতে অন্য কেউ এসে তাকে সে স্থান থেকে উঠিয়ে দিতে না পারে। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ যেন নিজের সামাজিক মর্যাদার পরিমাপ ও পরিসীমা সম্পর্কে সজাগ থাকে– সে বিষয়ে উপরের ছড়াধর্মী প্রবাদে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

দো দেল্ বান্দা কলেমা চোর
না পায় বেহেশ্‌ত, না পায় গোর।

(শব্দার্থ: দো দেল্– দুই মন)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: উপর্যুক্ত প্রবাদে দুই মনের তথা দোদুল্যমান মানুষের সিদ্ধান্তহীনতার পরিণতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি সব বিষয়ে দোদুল্যমানতা তথা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন তার ভাগ্যে ভালো এবং মন্দ কোনোটাই জোটে না। 'না পায় বেহেশ্‌ত, না পায় গোর' বলতে এখানে ভালো এবং মন্দকেই বোঝানো হয়েছে।

জাতে কান্দে জাতের লাইগ্যা
কুত্তা কান্দে ভাতের লাইগ্যা।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: উপরের প্রবাদে মানুষের বংশগত ও শ্রেণিগত চরিত্রের প্রতি তির্যক কটাক্ষ হানা হয়েছে। মানুষের আচরণ তথা ব্যবহারের মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কালচার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যিনি যে জাতের (কালচারের) মানুষ তার আচরণে সেই জাতের (কালচারের) প্রতিফলন ফুটে উঠবেই। অন্যদিকে এ প্রবাদের ভিন্নরকম অর্থও খুঁজে পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত মানুষ সবসময় তার জাত (সম্মান) রক্ষার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকেন (জাতে কান্দে জাতের লাইগ্যা)। আবার নিম্নশ্রেণির মানুষ (প্রবাদে যাদেরকে 'কুত্তা' বলা হয়েছে) জাতপাতের ধার না ধেরে শুধু ক্ষণ্নিবৃত্তি নিবারণের চেষ্টাতেই ব্যাপৃত থাকে (কুত্তা কান্দে ভাতের লাইগ্যা)। শ্রেণিচরিত্রের প্রতি কটাক্ষধর্মী এ প্রবাদে দার্শনিক তত্ত্বনির্ভরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অইবো ছেড়া ডাকবো বাপ
তে যাইবো মনের তাপ।

(শব্দার্থ: অইবো– হবে, ছেড়া– ছেলে, তে– তাহলে, মনের তাপ– মনের দুঃখ)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: উল্লিখিত প্রবাদে মানুষের নৈমিত্তিক হতাশার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ যা নেই ভবিষ্যতে তা পাওয়া যাবে কি যাবে না তার কোনো ঠিক-ঠিকানা না থাকলেও বায়বীয় প্রত্যাশায় বুক বেঁধে অপেক্ষায় থাকার যে প্রবণতা, তার প্রতিই এ প্রবাদে তির্যক কটাক্ষ হানা হয়েছে। অর্থাৎ কবে ছেলে হবে, সেই ছেলে বড় হয়ে কবে বাবা ডাকবে, তারপর মনের জ্বালা জুড়োবে– এই অসম্ভব সম্ভাবনার প্রত্যাশায় বসে থাকার কোনো যুক্তি নেই বলে এ প্রবাদে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল' শীর্ষক প্রমিত প্রবাদটি উপর্যুক্ত প্রবাদের সমার্থক বলে গণ্য হতে পারে।

ফ্যান দিয়া ভাত খাইয়া গপ্পো মারে দৈ
মাইট্টা উক্কার তামুক খাইয়া গুড়গুড়িডা কই?

(শব্দার্থ: ফ্যান– ভাতের মাড়, মাইট্টা উক্কা– মাটির হুঁকো, তামুক– তামাক, গুড়গুড়ি– হুঁকোর নল)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: উপরের প্রবাদে একশ্রেণির চাপাবাজ মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করা হয়েছে। যে মানুষ ফ্যান দিয়ে ভাত খেয়ে দৈ দিয়ে খেয়েছে বলে চাপা মারে এবং মাটির হুঁকোয় তামাক খেয়ে ফর্সি হুঁকোয় (অভিজাত পরিবারে ব্যবহৃত নলওয়ালা হুঁকো) তামাক খেয়েছে বলে গুল মারে, সে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা এ প্রবাদে চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে।

আমার আছে তোমার আছে করি ওড়াউড়ি
আমার নাই তোমার নাই যাও দূরাদূরি।

(শব্দার্থ: উড়াউড়ি– হুড়োহুড়ি, দূরাদূরি– দূরে)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: উল্লিখিত প্রবাদে একটি চমৎকার সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে। আমার হাতে যতক্ষণ অর্থ বা সম্পদ আছে ততোক্ষণ সবার কাছেই আমি প্রিয় ও গ্রহণীয়, কিন্তু

যখনই আমার অর্থ সম্পদ থাকে না তখন সবাই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যায় বা পর হয়ে যায়। অর্থনৈতিক কারণে মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রে তথা আচরণে কী অদ্ভুত বৈপরীত্য ঘটতে পারে, তার প্রতিফলন উপরের প্রবাদে সরলভাবে চিত্রিত হয়েছে।

পরের পুতে মারে মাছ চোখ পাহাইয়া চায়
নিজের পুতে মারে মাছ ইচ্ছামতন খায়।
(শব্দার্থ: পুতে– পুত্রে, চোখ পাহাইয়া– চোখ পাকিয়ে)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: এ প্রবাদেও অপরের মুখাপেক্ষী না হবার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। পরের ছেলের মাছধরা দেখে চোখ পাকিয়ে তাকানোর কোনো অর্থ নেই। বরং নিজের ছেলে যে মাছ ধরবে তা নিজের রুচিমতো রেঁধে ইচ্ছেমতো খেলে কারো কিছু বলার থাকে না। অর্থাৎ নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল হতে পারাটাই অত্যুত্তম।

বান্দির পেডে যার জনম
তার কিয়ের দেব-ধরম?
(শব্দার্থ: বান্দির পেডে– বাঁদির পেটে, কিয়ের– কিসের)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: মানুষের শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্যের চিত্র উপরের প্রবাদে বিধৃত হয়েছে। ছোট জাতের পরিবারে জন্ম নেয়া কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে সদাচরণ বা ধর্মীয় মূল্যবোধ আশা করা ঠিক নয়; প্রবাদটিতে এই সত্যটিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

রোজা থাইক্কা তামুক খায়
ফাল দিয়া ফাল দিয়া ভেস্তে যায়।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: এ প্রবাদে ভণ্ড প্রকৃতির মানুষকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা ভণ্ডামিতে সিদ্ধহস্ত তাদের আচরণকে ব্যঙ্গ করার জন্য মূলত এ প্রবাদের সৃষ্টি।

কপালে যার নাই ঘি
ঠকঠকাইলে অইব কী?

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: চিরদুঃখী মানুষের বিড়ম্বিত ভাগ্যের প্রতি এ প্রবাদে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার জীবনে সুখ নেই, সুখের পেছনে দৌড়ে তার কোনো লাভ নেই– একথা বোঝানোর জন্যই এ প্রবাদের সৃষ্টি।

কলির বামুন ধোরা সাপ
যে না-মারে হের পাপ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: অনিষ্টকারীকে দমন করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য– এ প্রবাদে এই সত্যকেই তুলে ধরা হয়েছে।

যার যা স্বভাব কভু নাহি যায়
ঢুলির ঢোল নাই, পেড অইলেও বাজায়।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: মানুষের শ্রেণিগত ও পেশাগত চরিত্র বোঝাতে এই প্রবাদটি ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রবাদটি 'কয়লা ধুলে ময়লা যায় না' শীর্ষক প্রমিত প্রবাদেরই সমার্থক।

গাছে উডে মরতো
জামিন অয় ভরতো ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: অন্যের উপকার করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এ প্রবাদ জনসমাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।

যে খাইছে তার লাইগ্যা বাড়অ
যে না খাইছে তার লাইগ্যা লাড়অ ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: 'তেলা মাথায় তেল' শীর্ষক প্রমিত প্রবাদের আঞ্চলিক রূপটিই এ প্রবাদে প্রকাশ পেয়েছে ।

সাজলে-গুজলে নারী
লেপলে-পুছলে বাড়ি ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য রক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিকভাবে এ প্রবাদটি ব্যবহার হতে দেখা যায় ।

হারাদিন থাহে বেডি
হাঁই আইলে দেয় নাহ কাডি ।
(শব্দার্থ-হারাদিন– সারাদিন, থাহে– থাকে, বেডি– মহিলা, হাঁই– স্বামী, নাহ– নাকে, কাডি– কাঠি)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: নারীর আহ্লাদেপনা ও আলস্যকে কটাক্ষ করতে এ প্রবাদটি মুখে মুখে সৃষ্টি হয়েছে ।

পরের বাড়ির পিডা
দাঁতে লাগে মিডা ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: নিত্য দেখা কোনো বস্তুই মানুষের কাছে ভালো লাগে না । জীবন যখন একঘেয়ে হয়ে ওঠে তখন নতুনের আস্বাদ পেতে প্রতিটি মনই উন্মনা হয় । নিজের ঘরের প্রাত্যহিক রান্নার স্বাদ একঘেয়েমির সৃষ্টি করে । তাই পরের ঘরের রান্নাই যেন তার রসনায় তৃপ্তি যোগায় । মানুষের এই মানসিক বৈপরীত্য বোঝাতে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।

পুটকি ফাইট্টা দম যায়
ছুবাইন্যার মায় পইসা চায় ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: জীবিকা নির্বাহে প্রাত্যহিক টানাপড়েন ও দৈন্যদশার চিত্রটি এ প্রবাদে প্রকাশ পেয়েছে ।

পরের ঘর ছ্যাপের ডর
নিজের ঘর আইগ্যা ভর ।
(শব্দার্থ: ছ্যাপ– থুতু, আইগ্যা– মলত্যাগ করে)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: নিজের জিনিস যেভাবে ইচ্ছে সেভাবেই ব্যবহার করা যায় । এতে কারো কিছু বলার থাকে না । কিন্তু অন্যের জিনিস ব্যবহার করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা

আবশ্যক। পরের ঘরে থুতু ফেলতেও সতর্কতা প্রয়োজন। নিজের ঘরে মলত্যাগ করলেও তাতে ভয়ের কিছু থাকে না।

দারোগা ডাকছে চাচী
আমি কি আর আছি?
অথবা
দাদা ডাকছে চুদির ভাই
আনন্দের আর সীমা নাই।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: ক্ষমতার অযৌক্তিক দাপট প্রদর্শনকারীর প্রতি এ প্রবাদে কটাক্ষ করা হয়েছে।

চিনলে জরি, না চিনলে জঙ্গলের খড়ি।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: অনেক অপ্রয়োজনীয় বস্তুও অনেক সময় মূল্যবান হয়ে ওঠে। ছোট বলে কাউকে বা কোনোকিছুকে অবজ্ঞা করা ঠিক নয়– এই মর্মার্থটিই এ প্রবাদে প্রকাশ পেয়েছে।

চেরাগ আলী মুন্সির পুত
ঘরঅ নাইগা খিদার খুদ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: কারো অহেতুক বাহাদুরিকে কটাক্ষ করতে এই প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। 'উপরে ফিটফাট, ভেতরে সদরঘাট' প্রবাদের সমার্থক হিসাবে এ প্রবাদটি প্রচলিত।

হাঁইয়ের-তা দিয়া ভাইয়ের নাম
কাঁওড়া পিন্দা নাইয়র যাম।

(শব্দার্থ: হাঁইয়েরতা– স্বামীর, কাঁওড়া– গহনা, পিন্দা– পরিধান করে, যাম– যাবো)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: পরমুখাপেক্ষিতার প্রবণতাকে কটাক্ষ করতে এ প্রবাদ গ্রামে-গঞ্জে ব্যবহার হতে শোনা যায়।

হাতে রান্ধে ধীরে খায়
তে না বলে মজা পায়।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: ধৈর্যশীলতার মাহাত্ম্য বোঝাতে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আল নাই বেডার গাল বড়
পঁচা আদার ঝাল বড়।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: শক্তিহীনের অসার তর্জন-গর্জনকে এই প্রবাদে কটাক্ষ করা হয়েছে।

পথঅ পাইলাম কামার
দাও ধারায়া দেও আমার।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: এই প্রবাদে সময়ের কাজ যথাসময়ে সেরে নেয়ার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে।

পরের বাড়ির পিডা

দাঁতা লাগে মিডা ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: 'আপন চেয়ে পর ভালো, পরের চেয়ে বন' এরকম ভাবার্থ বোঝাতে এ প্রবাদের সৃষ্টি ।

আমতলায় বিয়াইছে গাই
হেই সম্বন্ধে মামাতো ভাই ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা বোঝাতে এ প্রবাদ ব্যবহৃত হয় । অনেক সময় দূরাত্মীয়কে তাচ্ছিল্য করার জন্যও প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে ।

বাড়ির গরু ঘাডের ঘাস খায় না ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: নিজের এলাকায় গুণী মানুষের অমর্যাদা হলে এ প্রবাদটি প্রয়োগ করতে দেখা যায় ।

আত্তিরঅ পিছলে পাও
সুজনেরও ডুবে নাও ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: ধনবানের আর্থিক পতন কিংবা সামাজিক বিপর্যয় ঘটলে এ প্রবাদ ব্যবহার করা হয় ।

যদি থাকে বন্ধের মন
গাঙ পার অইতে কতক্ষণ ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: সামাজিক ঐক্য সুদৃঢ় করতে এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি সমুন্নত রাখতে এ প্রবাদ ব্যবহার করতে দেখা যায় ।

যেই দ্যাশের যেই বাও
নাও মাথাত্ দিয়া পাথলা বাও ।
(শব্দার্থ: মাথাত্– মাথায়, পাথলা– মাথাল)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: প্রচলিত নিয়ম-নীতি ও সামাজিকতা মেনে সমাজ-সংসার পরিচালনার ওপর এ প্রবাদে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ।

যার যেমুন বুঝ
দাড়ি ফালাইয়া রাহে মুছ ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: প্রত্যেকের নিজস্ব চিন্তা-চেতনাকে প্রাধান্য দিতে এ প্রবাদে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে ।

বাঘে খায় দেখলে
সাপে খায় লেখলে ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: ভাগ্যের অনিবার্য পরিণতি বোঝাতে প্রবাদটি ব্যবহার করা হয় ।

কবে অইবো গাছঅ আম
বাপে-পুতে মিল্যা খাম ।
(শব্দার্থ: খাম– খাবো)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: অনিশ্চিত ভবিতব্যকে ইঙ্গিত করতে এবং অপ্রাপ্তির হতাশা বোঝাতে এ প্রবাদের সৃষ্টি ।

হুনছিলাম না হাতেগুতে
হুনাইয়া দিছে ভাই পুতে ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: অযাচিত কথার বাহুল্য বোঝাতে এ প্রবাদটি ব্যবহার হতে দেখা যায় ।

খা-উইয়্যা আছে করুইয়্যা নাই
গিরি মরলে কান্দুইয়া নাই ।

(শব্দার্থ: খা-উইয়্যা– যে খায়, করুইয়্যা যে করে, গিরি– গৃহকর্তা, কান্দুইয়া– কাঁদার লোক)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: কাজ করার মানসিকতা সম্পন্ন কর্মী মানুষের অভাব বোঝাতে এ প্রবাদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।

কী করবো তর ভাজন পুতে
কান বুজাউরি লগে ফুতে ।

(শব্দার্থ : ভাজন পুত– ভাইয়ের ছেলে বা নিকটজন, কান বুজাউরি– যে কান মন্ত্রণা দেয়, ফুতে– শোয়)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: নিন্দুকের অযৌক্তিক ও অকারণ নিন্দাজনিত মানসিকতাকে এ প্রবাদে কটাক্ষ করা হয়েছে ।

আমার পেডঅ উঠলে বিষ
মায়্যা আমারে ডাক দিস ।

(শব্দার্থ: বিষ– ব্যথা, মায়্যা– মা)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: নিজের প্রয়োজনে নিজের সচেতনতা বোধ জাগ্রত করতে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।

চুল নাই বেডির চুলের লাইগ্যা কান্দে
কচু পাতার ডিফা দিয়া লাম্বা খোঁপা বান্দে ।

(শব্দার্থ: ডিফা– গুঁজে দেওয়া)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: এ প্রবাদে নিজের যা নেই তা নিয়ে অহেতুক হতাশ না হবার পরামর্শ দেয়া হয়েছে ।

পুতের উঠলে দাড়ি, পুত থাহে না বাড়ি
ছেড়ির উঠলে স্তন, মায় পায় না মন ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: ছেলে-মেয়ের বয়ঃসন্ধিক্ষণের বিপজ্জনক সময়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এ প্রবাদে উপদেশ দেয়া হয়েছে ।

বেডাইনের গোসায় বাশ্শা
বেট্যাইনের গোসায় বেশ্যা ।

(শব্দার্থ-বেডাইন– পুরুষ, বাশ্‌শা– বাদশা, বেট্যাইন– মহিলা)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: নারীর জেদ ও রাগকে প্রশমিত করার জন্য এ প্রবাদের মাধ্যমে উত্তেজিত নারীদের নিবৃত্ত করা হয়।

বেশি পিরিত বেশি জ্বালা
কম পিরিতে আছি ভালা।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: অতিশয় প্রিয়জনের কাছ থেকে দুঃখ পেলে তা মনকে অধিক মাত্রায় বিষিয়ে তোলে। তাই কারো সাথেই অধিক মাত্রায় জড়িয়ে না পড়ার উপর এ প্রবাদে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

ঘরে মরছে পুতের বউ
বাইরে মরছে ঝি জামাই
পরে পরেই গ্যাছেগা
এইবারের বালাই।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: অন্যের ক্ষতি দেখে উৎফুল্ল হলে এ প্রবাদটি কটাক্ষস্বরূপ উচ্চারিত হতে শোনা যায়। প্রবাদটি অনেকটা 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে' শীর্ষক প্রমিত প্রবাদের সমার্থক।

দেখতে হুনতে মাইন্সের লাহান
মুইত্যা দেয় পানির লাহান।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: পোশাক-পরিচ্ছদে সুন্দর মানুষ অসুন্দর আচরণ করলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

বাপ-দাদার ঘুড়া নাই
পুটতি হতি লাগাম।
(শব্দার্থ: ঘুড়া– ঘোড়া, হতি– পর্যন্ত)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: চাপাবাজ মানুষকে কটাক্ষ করতে এ প্রবাদের সৃষ্টি। আবার সহায়-সম্বলহীন মানুষ যদি নিজেকে কেউকেটা প্রমাণের চেষ্টা করে সে ক্ষেত্রেও এ প্রবাদ কটাক্ষ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।

উপকারীর ঘাড়অ লাথি
উপকারী যায় হুদাআত্তি।
(শব্দার্থ: হুদাআত্তি– শূন্য হাতে)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: অন্যের উপকার করার পর উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা উপকারদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে এ প্রবাদ প্রয়োগ করা হয়।

আভাইগ্যা নাইয়র যায়, গাঙও চিত্তয়।
(শব্দার্থ: আভাইগ্যা– অভাগা, চিত্তয়– চিৎ হয়)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা : যে কোনো শুভকাজে বাধা এলে এই আক্ষেপসূচক প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে ।

এক বাপের এক ঝি
কনি বাইয়া পড়ে ঘি ।

অথবা

এক বাপের এক পুত
খাইয়া করে লুতলুত ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: অতি আদুরে কন্যা বা পুত্রের আহলাদেপনার মাত্রা সহ্যসীমার বাইরে চলে গেলে বিদ্রূপসূচক এ প্রবাদ প্রয়োগ করা হয় ।

রাজ্যি জুইড়া হাঙ্গামা
চুঙ্গা পাইত্যা দৈ ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা : প্রবাদটি 'পর্বতের মুষিক প্রসব' শীর্ষক প্রমিত প্রবাদের ভাবার্থই বহন করে ।

ডাইল দিয়া ভাত খাই
সিদা পথে বাইত্ যাই ।
(শব্দার্থ: সিদা– সোজা, বাইত্– বাড়িতে)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: নিজের সরলতা ও ঝামেলামুক্ত আচার-ব্যবহার বোঝানোর জন্য প্রবাদটি ব্যবহৃত হয় ।

বার বাউনের তের ডাবা
তেও করে কাবাকাবা ।
(শব্দার্থ: বার বাউন– বারজন ব্রাহ্মণ, তেও– তবুও, কাবাকাবা– খাইখাই)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় ব্যবহৃত 'এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরিভুরি' চরণটির অর্থই যেন এই আঞ্চলিক প্রবাদে প্রকাশ পেয়েছে ।

যার মরা তার দেহা নাই
হুদাহুদি ঘুম কামাই ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: বিপদাপন্ন ব্যক্তির উদ্বিগ্নতা অপেক্ষা তৃতীয় ব্যক্তির উদ্বিগ্নতা অধিক বোঝাতে এ প্রবাদ প্রয়োগ করা হয় ।

দুই ডহি এক্কানঅ
ঠ্যাস-টক্কর বেক্কানঅ ।
(শব্দার্থ: ডহি– পাতিল, এক্কানঅ– একত্রে, বেক্কানঅ– সর্বত্র)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: একসাথে বসবাস করলে মাঝে মাঝে মনোমালিন্য ও ঝগড়াঝাটি হতেই পারে, এরকম অর্থে এ প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।

যার মনঅ যেইডা

ফাল দিয়া উডে হেইডা ।

অথবা

কানা ত মনে মনেই জানা ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যাঃ এ প্রবাদটি 'চোরের মন পুলিশ পুলিশ' শীর্ষক প্রমিত প্রবাদের সমার্থক ।

মিড়মিড়্যা ঘোড়া কেলাই খাওনের যম ।

(শব্দার্থ: মিড়মিড়্যা– মিচ্‌কে স্বভাবের)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যাঃ মিচ্‌কে তথা মিনমিনে স্বভাবের ব্যক্তিগণকে বিদ্রূপ করতে এ প্রবাদ ব্যবহৃত হয় ।

উঁক দেয় না বেডা ক্ষেতেত্ত

চিনি দিব বেডা মটকাত্ত ।

(শব্দার্থ: উঁক– আঁখ, ক্ষেতেত্ত– ক্ষেত থেকে, মটকাত্ত– চিনির পাত্র থেকে)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যাঃ অসার প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী ব্যক্তিদের প্রতি এই প্রবাদে তির্যক বিদ্রূপ করা হয়েছে ।

যেইডা অয়না বিয়ান রাইতে

হেইডা অয় না শেষ রাইতে ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যাঃ প্রবাদটি 'যার হয় না নয়ে, তার হয় না নব্বইয়ে' এই প্রমিত প্রবাদের সমার্থক ।

আমি আনছি মাইগ্যা

তরে দিয়াম আইগ্যা ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যাঃ নিজের জন্য সংগৃহীত সামান্য বস্তু অন্যকে না দেবার অর্থ বোঝাতে এ প্রবাদ ব্যবহৃত হয় ।

হিল হিল মতিঝিল

সাদা দিল যার

পুটকিমারা তার ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যাঃ সততা ও সরলতা সত্ত্বেও ক্ষতির সম্মুখীন হলে এ প্রবাদের মাধ্যমে খেদ প্রকাশ করা হয় ।

খাইয়া দাইয়া কামাই

ঝি বাঁচলে জামাই ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যাঃ স্বার্থপরতার প্রবণতাকে এ প্রবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে ।

যার আছে বুঝ, হে পরে পুছ ।

(শব্দার্থ: হে– সে, পুছ– জিজ্ঞাসা)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা : বুদ্ধিমান মানুষ যে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে অন্যের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করে থাকেন। আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়াকে উৎসাহিত করতেই এ প্রবাদের সৃষ্টি।

আ-পদিরার পদ অয়, তামা-কাঁসার দাম অয়।
(শব্দার্থ: আ– পদিরার– নিচু জাতের)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা : সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটে। আজ যিনি বিত্তবান কাল তিনি বিত্তহীনও হয়ে যেতে পারেন। মর্যাদাহীন মানুষও অর্থের জোরে হঠাৎ মর্যাদাবান হয়ে ওঠে। এই সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টিই আলোচ্য প্রবাদে ফুটে উঠেছে।

কুত্তার কোনো কাম নাই
দৌড় ছাড়া আঁডা নাই।
(শব্দার্থ: আঁডা– হাঁটা)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: অযৌক্তিক ও আরোপিত ব্যস্ততা প্রদর্শনকারীকে উপহাস করার জন্য এ প্রবাদের সৃষ্টি।

মা মরলে বাপ তালৈ
ভাই অয় বনের পালৈ।
(শব্দার্থ: পালৈ– পাখি)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: মাতৃহীন সংসারে অশান্তির আধিক্য বোঝাতে এ প্রবাদের সৃষ্টি।

আমি করি ঝি ঝি
ঝিয়ে করে হাঁই হাঁই।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: কারো উপকার করতে চাইলেও সে যদি ভুল বুঝে উপকারদাতাকে তাচ্ছিল্য করে তবে এ প্রবাদ প্রয়োগ করা হয়।

জামাইরা সাত ভাই
এক জামাই না থাকলে কেউ নাই।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে স্বামীই সবচেয়ে কাছের মানুষ। স্বামী না থাকলে স্বামীর আত্মীয়-স্বজন দিয়ে স্ত্রীর কিছুই আসে-যায় না। এরকম অর্থ বোঝাতে প্রবাদটি প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

পুটকিত্ নাই চাম্
রাধা-কৃষ্ণ নাম।

অথবা

পুটকিত নাই চামড়া
উপুত অইয়া কামড়া।
(শব্দার্থ: উপুত– উপুর হয়ে)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও তথাকথিত আভিজাত্য প্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টাকে কটাক্ষ করার জন্য এ প্রবাদ প্রয়োগ করা হয় ।

শিন্নি দেখলে আউগ্যায়
কুত্তা দেখলে পাউচ্ছায় ।
(শব্দার্থ: আউগ্যায়– এগিয়ে আসে, পাউচ্ছায়– পিছিয়ে যায়)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: সুবিধাবাদী মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে এ প্রবাদে তুলে ধরা হয়েছে ।

শিন্নি অইয়া হামায়
কলেরা অইয়া বাইরঅয় ।
(শব্দার্থ: হামায়– প্রবেশ করে, বাইরঅয়– বের হয়)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: দুষ্ট ও ভণ্ড প্রকৃতির মানুষকে এ প্রবাদে উপহাস করা হয়েছে । যারা মিষ্টি কথায় মোহিত করে অবশেষে চরম ক্ষতিসাধন পূর্বক মানুষকে প্রতারিত করে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই এ প্রবাদে প্রকাশ পেয়েছে ।

যার যেমুন বুঝ
দাড়ি ফালাইয়া রাহে মুছ ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশিকে প্রাধান্য দিতে এ প্রবাদের সৃষ্টি ।

জাতে জাত মিলে
হিদলের লগে বাইগন মিলে ।
(শব্দার্থ: হিদল– শুটকি, বাইগন– বেগুন)

অথবা

জাতের ধারা বাইগনের চারা
যেইহানঅ ফালায়, হেইহানঅই জালায় ।
(শব্দার্থ: যেইহানঅ ফালায়– যেখানেই ফেলে, হেইহানঅই জালায়– সেখানেই গজায়)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: 'কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না' শীর্ষক প্রমিত প্রবাদের অর্থই যেন প্রবাদ দু'টিতে প্রকাশ পেয়েছে ।

ট্যাহায় করে কাম
চ্যাট বেডার নাম ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: 'টাকা হলে বাঘের চোখও পাওয়া যায়' এই প্রমিত প্রবাদের অর্থই এতে প্রকাশ পেয়েছে ।

ঠেকছিলাম যেইনঅ
হিকছিলাম হেইনঅ ।
(শব্দার্থ: যেইনঅ– যেখানে, হিকছিলাম– শিখেছিলাম, হেইনঅ– সেখানে)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: ঠেকায় পড়ে মানুষ অনেক কিছুই শেখে। এ ধরনের শিক্ষা জীবনে চলার পথে অনেক সময় কাজেও লাগে। এই অর্থ প্রকাশের জন্যই প্রবাদটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

নিজের বাড়ির খবর নাই
পরের ছালুনে নুন দেয়।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: অন্যের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়ে গায়ে পড়ে নাক গলালে এ প্রবাদ দ্বারা বিদ্রূপ করা হয়।

আল্লায় টানলে চুলঅ
কী অইব টাইন্যা উলঅ।
(শব্দার্থ: চুলঅ– চুলে, উলঅ– অ– কোষে)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: বিধাতা কারো ভাগ্য সুপ্রসন্ন করলে অন্য কেউ তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না– এই সরল সত্যটি আলোচ্য প্রবাদে প্রকাশিত হয়েছে।

মাছ খাইলে ইলিশ
লাং ধরলে পুলিশ।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: প্রবাদটি 'লুটি তো ভাণ্ডার, মারি তো গণ্ডার' শীর্ষক প্রমিত প্রবাদের সমার্থক।

আগের আল যেমনে যায়
পিছের আল হেমনে যায়।
(শব্দার্থ: আল– হাল, যেমনে– যেদিকে, হেমনে– সেদিকে)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: বড়দের আচরণ ছোটদের প্রভাবিত করে থাকে। তাই বড়দের স্বভাব-চরিত্র ও আচরণ সংযত এবং পরিশীলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই হিতোপদেশই আলোচ্য প্রবাদে প্রকাশিত।

পাগলারে নাও বুরা
আমি ত বাতাত্ খাড়া।
(শব্দার্থ: বুরা– ডুবিয়ে দে, বাতাত্ খাড়া– একপায়ে দাঁড়ানো)

অথবা

এমনেই নাচুন্যা বুড়ি
আরো পাইছে ঢুলের বাড়ি।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: ঝগড়াটে বা বিবাদোন্মুখ ব্যক্তিকে উস্কানি দেবার প্রবণতা রোধকল্পে এ প্রবাদের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

মাডিত্তে চাডিত্ পড়ে
জামাইয়ের আদর করে।
(শব্দার্থ: মাডিত্তে– মাটি থেকে, চাডিত্– পাটিতে)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: অতিরিক্ত আহলাদেপনা প্রকাশ পেলে প্রবাদটি বিরক্তির সুরে উচ্চারিত হতে শোনা যায়।

বাইল-বুইল দিয়া লাঙ্গে
আধা পথে নিয়া কমর ভাঙ্গে।
(শব্দার্থ: বাইল– ধোঁকা, লাঙ্গে– নাগরে, কমর– কোমর)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: মিষ্টি ব্যবহারের মাধ্যমে মোহিত করে কেউ কাউকে দুঃখ দিলে কিংবা প্রতারিত করলে এই আক্ষেপসূচক প্রবাদ ব্যবহার করা হয়।

আমি বেন্ কই কী
আমার সারিন্দায় বাজায় কী।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা : সরল কথার অর্থ সহজভাবে না বুঝলে এবং কথার মর্মার্থ না বুঝে ভিন্ন রকম কাজ করলে এ প্রবাদ দ্বারা তাচ্ছিল্য করা হয়।

বাসির চে' বাসি খায়
হাঞ্জু দেইখ্যা ঘডঘডায়।
(শব্দার্থ: বাসি– পচা, হাঞ্জু– সতেজ)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: বিত্তহীন ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে বড়লোকি আচরণ প্রকাশ পেলে এ প্রবাদের মাধ্যমে বিদ্রূপ করা হয়।

এল্হা ঘরে এল্হা গিত্তাইন খাইতে বড় সুখ
মরবার সময় ধরুইয়া নাই এইডাই বড় দুখ।
(শব্দার্থ: এল্হা– একলা, গিত্তাইন– গৃহিণী, ধরুইয়া– খাটিয়া ধরার লোক)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার সৃষ্টির কুফল সম্পর্কে এ প্রবাদে ধারণা দেয়া হয়েছে।

ছালার ধান ছালায় আঁডে
লাত্থির চুডে ছালা ফাডে।
(শব্দার্থ: ছালা– বস্তা, আঁডে– সংকুলান হয়, চুডে– চোটে, ফাডে– ফাটে)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: কোনো বিষয় নিয়ে একগুঁয়েমি করার পর অবশেষে সেই বিষয়কে মেনে নিলে এই শ্লেষাত্মক প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়।

প্রবাদেরও নানারূপ শ্রেণিবিভাজন রয়েছে। এ পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি ও বৈশিষ্ট্যনির্ভর কতিপয় প্রবাদের উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

উপদেশমূলক

হুটকির নাওঅ বিলাই চহিদার।
(শব্দার্থ: হুটকি– শুটকি, নাওঅ– নৌকায়, চহিদার– চৌকিদার)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: শুটকিবাহী নৌকায় বিড়ালকে পাহারা দেবার দায়িত্ব দিলে শুটকি অক্ষত থাকার সম্ভাবনা থাকে না। তাই ভক্ষকবেশী রক্ষককে এড়িয়ে চলার সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়ে এ প্রবাদে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

ভণিতামূলক

ভালা রান্ধি বুড়া রান্ধি হাঁইয়ে যদি খায়,
পাড়া-পড়শির কথায় আমার বাল ফালানি যায়।
(শব্দার্থ: ভালা– ভালো, রান্ধি– রাঁধি, বুড়া– মন্দ, হাঁই– স্বামী)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: নিজের কর্মকাণ্ডে আপন মানুষ তুষ্ট থাকলে অন্যের সমালোচনায় কিছুই আসে-যায় না– এই বোধসম্পন্ন কথাটিই আলোচ্য ভণিতাধর্মী প্রবাদে ফুটে উঠেছে।

হেঁয়ালিমূলক

আদরের লইল্যা, বিয়া দিয়াম বোয়াইল্যা।
(শব্দার্থ : লইল্যা– আহ্লাদি কন্যা, দিয়াম– দেবো, বোয়াইল্যা– বোয়ালিয়া নামক গ্রাম)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: আদুরে মেয়ের আহলাদেপনায় তুষ্ট হয়ে (কখনো কখনো বিরক্ত হয়ে) অভিভাবক শ্রেণির বড়রা মেয়ের প্রতি এই হেঁয়ালিধর্মী প্রবাদটি প্রয়োগ করে থাকে।

বিদ্রূপমূলক

নেড়ার বিবি খাডঅ যায়
ফির‍্যা ফির‍্যা নেড়ার ফিল্ চায়।
(শব্দার্থ : নেড়া– খড়, খাডঅ– খাটে, ফিল্– প্রতি)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: যিনি যেটুকুর যোগ্য নন, তাকে সেই যোগ্যতর আসন দেয়া হলে তিনি সেই আসনের সম্মান রক্ষা করতে জানেন না। অর্থাৎ অযোগ্যকে যোগ্য স্থানে অধিষ্ঠিত করলেও স্বভাবগত কারণে তিনি তার পূর্বতন অবস্থানে ফিরে যেতে চান। মানুষের শ্রেণি ও অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি এই প্রবাদের মাধ্যমে বিদ্রূপের চিত্রকল্পটি ফুটে উঠেছে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক

মুরগির রান, শৌলের কান, কুড়ার গলা, আঁসের তলা।
(শব্দার্থ: আঁস– হাঁস)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: এ প্রবাদে স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের জন্য পুষ্টিকর খাবারের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

শিক্ষামূলক

পরের লাইগ্যা কুয়া খুদলে হেই কুয়ায় নিজে পড়ে।
(শব্দার্থ : খুদলে– খনন করলে)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: জেনে-শুনে অন্যের ক্ষতি করলে প্রকৃতিগতভাবে নিজেকেও একদিন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়; এই অনিবার্য সত্যটি উপরের শিক্ষামূলক প্রবাদে প্রকাশিত হয়েছে।

'ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়' শীর্ষক প্রমিত প্রবাদের অর্থই এই আঞ্চলিক প্রবাদে প্রকাশিত হয়েছে।

আক্ষেপমূলক

আমিও বুইড়্যা অইছি, হাঙ্গারও চল অইছে।

(শব্দার্থ : হাঙ্গা– দ্বিতীয় বিয়ে, চল– প্রচলন)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: মানুষের মনোগত অপূর্ণতা এবং প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে বিস্তর ব্যবধানের আক্ষেপটি এ প্রবাদে পরিস্ফুটিত হয়েছে। অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনের সময় কাঙ্ক্ষিত বস্তুর দুষ্প্রাপ্যতা এবং প্রয়োজন না থাকলে তা সহজলভ্য হয়ে গেলে এ প্রবাদ দ্বারা আক্ষেপ প্রকাশ করা হয়।

নৈরাশ্যমূলক

লাঙ্গের আশায় হাঁই আরাইলাম।

(শব্দার্থ : লাঙ্গের– নাগরের, হাঁই– স্বামী, আরাইলাম– হারিয়ে ফেললাম)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: উভয়সংকটজনিত নৈরাশ্যের কষ্টবোধ এ প্রবাদে প্রকাশ পেয়েছে। কোনোকিছু পাওয়ার আশায় সহজলভ্য বিষয়ের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করার কারণে কাঙ্ক্ষিত বস্তু না পাওয়া এবং পরে সহজলভ্য বস্তুটিও হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে যে নৈরাশ্য সৃষ্টি হয় তা-ই এ প্রবাদে প্রকাশ পেয়েছে।

সামাজিক বিবরণমূলক

হুনতে আচরিত্, লইয়া যায়গা কাচারিত্।

(শব্দার্থ : আচরিত– আশ্চর্য, কাচারিত্– জমিদারের কাচারি)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: এই প্রবাদে সামন্তযুগীয় সামাজিক প্রেক্ষাপট বিধৃত হয়েছে। সে যুগে রাজা বা জমিদারের খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে সাধারণ প্রজাদেরকে পাইক-পেয়াদারা কাচারিতে ধরে নিয়ে অবর্ণনীয় নির্যাতন করত। সমসাময়িক এই সামাজিক চিত্রটি উল্লিখিত প্রবাদে ফুটে উঠেছে।

অর্থনৈতিক বিবরণমূলক

ভাত খাইতাম পাই না, ছালুন লইয়া টানাটানি।

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: আর্থিক দৈন্যগ্রস্ত মানুষের কাছে তরকারি অপেক্ষা দু'মুঠো মোটা ভাত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ভাতের সংস্থান হলে তা তরকারি ছাড়াও উদরপূর্তিতে সহায়ক হয়। অভাবগ্রস্ত মানুষের অর্থনৈতিক টানাপড়েনের বিবরণটি উপরের প্রবাদে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, অন্নের সংস্থান হলে অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবি করা অসঙ্গত নয়। ঘরে অন্ন না থাকলে সোনার থালায় ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবৃত্ত হয় না।

কৌতুকমূলক

বাঙ্গালি কুত্তার ইশ্কারি রাও।

(শব্দার্থ : ইশ্কারি– ব্যাঙ্গার্থে ইংরেজি ভাষা)

প্রায়োগিক ব্যাখ্যা: অতি সাধারণ কোনো ব্যক্তি দম্ভসূচক ফুটানি দেখালে তার উদ্দেশ্যে কৌতুকার্থে এ প্রবাদটি ব্যবহার হয়ে থাকে।

বিবিধ প্রসঙ্গের প্রবাদ: উল্লিখিত শ্রেণিবিভাগ ছাড়াও আরও কিছু প্রবাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যেগুলোকে আমরা বিবিধ প্রসঙ্গের প্রবাদ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। এ ধরনের প্রবাদে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সমকালীন বিবরণ ছাড়াও অনেক শ্লেষাত্মক বিষয় পাওয়া যায় যা বিশ্লেষণ করলে অবাক হওয়ার মতো দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান মেলে। বিবিধ প্রসঙ্গের অনেক প্রবাদের মধ্য থেকে দুটো প্রবাদ উদাহরণ হিসাবে নিচে তুলে ধরা হল:

১.
বাঙ্গালি জঞ্জালি
আরাইয়া দিশা
হিরারে কয় সিসা
বাংলাতে জন্ম
ধর্ম-কর্ম ছাইড়্যা
করে চুরির নিশা।

২.
চৈত্রে চালিতা
বৈশাখে নালিতা
জ্যৈষ্ঠে খৈ
আষাঢ়ে দৈ,
শ্রাবণে ঘোল পানতা
ভাদ্রে পিঠা
মাঘে তেল
ফাল্গুনে গুড়-আদা-বেল।

আঞ্চলিক প্রবাদে অশ্লীলতা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অশ্লীলতা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই, শেকসপিয়র অশ্লীল নয়, রামায়ণ-মহাভারত অশ্লীল নয়। ভারতচন্দ্র অশ্লীল; কেননা তা কেবল আংশিক অনাবরণ'। সারা দেশের ন্যায় কিশোরগঞ্জের অনেক আঞ্চলিক প্রবাদেও অশ্লীল শব্দের বাহুল্য রয়েছে, যা লোকসমাজে এখনো কথায় কথায় উচ্চারিত হতে শোনা যায়। অশ্লীল হলেও এ সকল প্রবাদ-প্রবচন আমাদের লোকসাহিত্যের একটি বিরাট অংশ দখল করে আছে। এ লেখকের 'লোকায়ত কিশোরগঞ্জ' বইয়ে প্রবাদ-প্রবচন পর্বে শ্লীল-অশ্লীল সকল প্রবাদ সংকলিত হয়। যে কারণে অশ্লীলতার দায়ে কিশোরগঞ্জের তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বইটিকে নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারের কাছে লিখিত প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। যদিও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সে প্রস্তাব সরকারের উচ্চ মহলে

শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি অর্থাৎ বইটিকে সরকার নিষিদ্ধ করেনি। গুরুতর অশ্লীল প্রবাদকে পরিহার করে নিচে তিনটি আঞ্চলিক শ্লোক (ধাঁধাঁ) তুলে ধরা হল। এগুলো শুনতে অশ্লীল লাগলেও অর্থ কিন্তু মোটেও অশ্লীল নয়। যেমন,

১.

ঢুকানির বালা দুঃখু পাইয়া ইস ইস করে,
ঢুইক্যা পড়লে খুশির চুডে মুহে আসি মারে।
উত্তর : মেয়েদের হাতে চুড়ি পরানো
(শব্দার্থ: বালা– সময় বা বেলা, দুঃখু– ব্যথা, চুডে– চোটে, মুহে– মুখে, আসি– হাসি)

২.

ঠেইল্যা দিলে মেইল্যা যায়
ভিত্‌রে গেলে আরাম পায়।
উত্তর– ছাতা

৩.

দুই ঠ্যাং ফাগাইয়া, মধ্যিখানে লাগাইয়া
ফড়িংয়ের রাজায় কয়, জাঁতা দিলে সিদ্ধি অয়।
উত্তর : জাঁতি বা সুপারি কাটার চরতা।

সমগ্র বাংলাদেশে স্থানীয় ভাষারীতিতে অপরিমেয় প্রবাদ-প্রবচন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কিশোরগঞ্জে প্রচলিত অনেক প্রবাদ-প্রবচন দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও একটু অন্যরকমভাবে প্রচলিত পাওয়া যায়। প্রবাদগুলোতে তাল-লয়-ছন্দ ও অন্ত্যমিলের চমৎকার প্রয়োগ আধুনিক ছন্দবিশারদদেরকেও ভাবিয়ে তোলে। ছড়ার চরিত্রবাহী কিশোরগঞ্জের হাজারো প্রবাদের মধ্য হতে প্রতীকীভাবে গুটিকয় ছন্দায়িত প্রবাদের বিশ্লেষণধর্মী এ নিবন্ধটি বাংলাদেশের লোকছড়ার গবেষণায় হয়তো কাজে লাগতেও পারে।

[লেখক: ছড়া শিল্পী, প্রাবন্ধিক]

প্র ব ন্ধ

লোকছড়া : লেখ্যছড়া

দী প ঙ্ক র চ ক্র ব র্তী

ছড়ার দুটি ধারা। লোকছড়া আর লেখ্য ছড়া। যেসব ছড়ার লেখক কে আমাদের জানা নেই অথবা লোকমুখে প্রচারিত হয়ে দীর্ঘকাল আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে তাকে বলা হয় লোকছড়া। আর পরবর্তী সময়ে সাহিত্যিকরা ওই ধারার অনুকরণে যেসব লেখা লিখেছেন তাই লেখ্যছড়া।

লোকছড়া শুরু হয়েছিল কবে থেকে সে বিষয়ে কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই। কোনো কোনো ছড়ার বিষয়বস্তু ছড়ার কালকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করলেও অধিকাংশ ছড়াই কোন সময়ের রচনা তা আমাদের জানা নেই। সংগৃহীত বহু ছড়ার বয়সকাল দুইশ; তিনশ বছর বা তার বেশিও হতে পারে বলে আমরা মনে করি।

এইসব ছড়ার রচয়িতাদের অধিকাংশ ছিলেন অক্ষরজ্ঞানহীন এবং নারী। মিলযুক্ত এইসব পদ্য রচনার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ তাঁদের সাহিত্যভাবনা ও সমাজভাবনার প্রকাশ ঘটাতেন। পৃথিবীর দেশে দেশে লেখক-সাহিত্যিকরা কবিতার ভাষাকে মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি নেবার যে চেষ্টা চিরকাল চালিয়ে গেছেন তা এইসব গ্রামীণ সাধারণ মানুষ তা সহজেই করতে পেরেছেন ছড়ার মধ্য দিয়ে।

এসব ছড়ার কোনো লিখিত রূপ ছিল না। মুখে মুখে প্রচলিত ছিল বলে সময়ের ব্যবধানে এবং স্থানিক ব্যবধানে এর শব্দ বদলে গেছে নানা ভাবে। কিন্তু তার সর্বত্রগামিতা থেমে থাকেনি। বিষয়বস্তুর প্রতি নিষ্ঠা কিংবা বিষয়বস্তুহীনতা উভয়কেই সহজভাবে ধারণ করেছে এসব লোকছড়া। শিশুর সাথে কথা বলতে গিয়ে যেসব ছড়া তৈরি হয়েছে তাতে বহু শব্দ যুক্ত

হয়েছে যা সম্পূর্ণ অর্থহীন। আবার সামাজিক কোনো ঘটনা বা সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে ছড়াটি তৈরি হয়েছে তার প্রতিটা শব্দ বা বাক্য শুধু স্পষ্ট ও পরিষ্কারই নয়, গভীর অর্থবহও বটে।

লিখিত চেহারা ছিল না লোকছড়ার। তাই ছড়া লেখা কথাটাও ছিল না। তার বদলে যে শব্দ ব্যবহার করা হত, তা হল ছড়াকাটা। মুখে মুখে ছড়া কাটতেন সাধারণ গৃহী মানুষ। বিষয়বস্তু তাঁর চারপাশ। তখনকার সমাজ এখনকার মতো জটিল হয়ে উঠেনি বলে যেসব রচনায় সারল্য স্বয়ংপ্রকাশ ছিল। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে লোকছড়া সর্বদা একমুখী ছিল কিংবা তাতে বিষয়বস্তু-বৈচিত্র্য ছিল না। কৃষি, ঘরকন্না, ধর্মীয় আচার, পরিবারের মঙ্গলকাঙ্ক্ষা, আবহাওয়া, খেলা– হেন বিষয় নেই যা নিয়ে ছড়া নির্মিত হয়নি। এসব ছড়াই মুখে মুখে ছড়িয়েছে। পরিবর্তিত হয়েছে, পরিবর্ধিত ও হয়েছে ভিন্ন কোনো হাতে।

প্রবাদ বা প্রবচনের একাংশ এসেছে খ্যাতিমান লেখকদের রচনা থেকে। বাকি অংশের নির্মাতা এসব নাম না-জানা মানুষ। ছড়া কাটার অভ্যাস থেকে হোক বা তাৎক্ষণিক কোনো উপলব্ধি থেকে হোক এসব ছোট ছোট অথবা প্রেরণাদায়ী বাক্যগুচ্ছ নির্মিত হয়েছে তাঁদের হাতে। খনার বচনে সংকলিত বচনগুলোও লোকছড়া। খনার অনুরূপ বাক্য মিলবে কৃত্তিবাস রামায়ণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা প্রাচীন বহু রচনায়, এমনকি বাংলার এসব বচন তথা লোকছড়া-অনুরূপ বাক্যবন্ধ মিলবে অসমীয়া বা ওড়িয়া ভাষায়। ফলে লোকছড়া বিস্তার ও ব্যাপকতা যে অনেক তা বুঝতে কষ্ট হয় না। খনার একটি বচন উদ্ধৃত করে মিল-অমিলটা দেখা যাক –

বাংলা:

সাত হাতে তিন বিঘতে।
কলা লাগাবে মায়ে পুতে ।।
লাগিয়ে কলা না কাট পাত।
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।।

ওড়িয়া:

সাত হাত তিন বিঘাতে।
কদলী লগাও মাতা পুত্রে ।।
তহিরু কেভে ন কাট পত্র।
নিশ্চয় মিলিব অন্ন বস্ত্র ।।

আমরা ফিরে যাব মুখে মুখে ছড়া কাটা বা ছড়ানির্মাণ প্রসঙ্গে। কোন ছন্দে নির্মিত হত এসব ছড়া, কোন নিয়ম অনুসরণ করত এর নির্মাতা সেটা বুঝে নেয়া দরকার।

স্বরবৃত্তকেই ছড়ার ছন্দ বলে মানছেন ছান্দসিকগণ। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন–

বাংলা ছন্দের তিনটি শাখা। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন করে, সেই ভাষায় বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিরূপকে স্বীকার করেনি। আর একটি সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে, এই ভাষা বাংলা হসন্ত শব্দের ধ্বনিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে। আর একটি শাখার উদগম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে। [ছন্দের প্রকৃতি]

হসন্ত ধ্বনিকে যে আপন করে নিয়েছে, অর্থাৎ স্বরবৃত্তকে রবীন্দ্রনাথ শুধু গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি, তাঁর অসংখ্য গান ও কবিতায় তাকে ব্যবহারও করেছেন। লোকছড়ার নির্মাতারাও এই ছন্দকে কাজে লাগিয়েছেন তার সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে। বস্তুত এই সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতাকে তাঁরা ব্যবহার করেছেন দ্বিধাহীনভাবে। পাশাপাশি বহু ছড়া সুর করে পড়া হত বলে লোকছড়ার চরিত্রে এই সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। এর প্রচুর নমুনা পাওয়া যাবে আমাদের প্রাচীন ছড়াগানে।

এ প্রসঙ্গে 'বাংলা ছড়ায় সমাজভাবনা' গ্রন্থে দেবাশিস বসু লিখছেন–

বঙ্গীয় সমাজ সভ্যতার ঊষালগ্নে পল্লিবাংলার নাম না জানা স্বভাবকবিরা, মা-ঠাকুমারা, গ্রাম্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যেসব ছড়াগান অক্ষর-পরিচয়হীন গ্রামবাসীদের আনন্দ দেবার জন্য, বালিকাদের ও বধূদের ব্রত পালনের জন্য মুখে মুখে রচনা করতেন, প্রধানের দৈনন্দিন জীবনচর্যার উপযোগী যেসব ছড়া বচন তৈরি করতেন; সেখান থেকেই আমাদের কাব্যসাহিত্যের প্রাচীনতম ছন্দ-ধারাটি গ্রাম্য সরল উপকথা বা প্রেমগীতিকার গণ্ডি পেরিয়ে লিখিত [বা শিষ্ট] সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধের এক জায়গার একটি উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়েছেন যাকে ছড়া বলতে মন চায় না আমাদের। রবীন্দ্রনাথ তাকে দ্বিধাহীনভাবে ছড়ার কাতারে বসিয়েছেন। উদ্ধৃতিটি দেখা যাক–

নয়নজলে ভেসে চলে, আকুল হল নন্দী–
কৈলাসেতে মিলল ঝরা হল একটি নদী।।
কেঁদো না মা, কেঁদো না মা ত্রিপুরসুন্দরী।
কাল তোমাকে নিয়ে যাব পাষাণের পুরী ।।
সন্দেশ দিয়েছিলেন মেনকারানী, দিলেন দুর্গার হাতে।
তুষ্ট হয়ে নারায়নী ক্ষান্ত পেলেন তাতে।।

উমা কন শুন বাবা, বোসো পুনর্বার ।
জলপান করিতে দিলেন নানা উপহার ।।
যত্ন করি মহেশ্বরী রানুন করিলা ।
শ্বশুর জামাই দোঁহে ভোজন করিলা ।।

[গ্রাম্যসাহিত্য : লোকসাহিত্য]

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী মন্তব্য যথেষ্ট রসঋদ্ধ । তিনি লিখেছেন– ছড়া যাহাদের জন্য রচিত তাহারা যদি আজ পর্যন্ত ইহার ছন্দোবন্ধ ও মিলের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি না করিয়া থাকে, তবে আমাদের বলিবার কোনো কথাই নাই ।

[ঐ]

****

আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছি রবীন্দ্রনাথের সমকালকে ঘিরেই বাংলা লেখ্য ছড়ার শুরু । এর আগেও লেখকরা এমন কিছু পদ্য রচনা করেছেন যাকে পরে ছড়ার কাতারে ফেলা হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালে শিশুসাহিত্য এবং ছড়া যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে তা আগে কখনো হয়নি। ১৮৫৯ থেকে ১৮৮৭ সময়কালের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন বেশ ক'জন কৃতি শিশুসাহিত্যিক । এঁদের সবাই ছড়াকার না হলেও এঁদের হাতেই পুষ্ট হয়েছে বাংলা শিশুসাহিত্য । আর এ সময় থেকেই শুরু হয়েছে লেখ্য ছড়ার জয়যাত্রা ।

এসব লেখকদের মধ্যে আছেন নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৫৯), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩), যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭), যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮২), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২) এবং সুকুমার রায় (১৮৮৭) । পরে আরো দুটি উল্লেখযোগ্য নাম পাই যাঁদের জন্ম পরবর্তী শতাব্দীর শুরুতে। এঁরা হলেন – সুনির্মল বসু (১৯০২) এবং অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪) ।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 'কাজের লোক' ছড়াটি বহুল পঠিত। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে স্মৃতিকে উসকে দেয়া যেতে পারে ।–

মৌমাছি মৌমাছি/ কোথা যাও নাচি-নাচি/ দাঁড়াও না একবার ভাই ।/ ঐ ফুল ফোটে বনে/ যাই মধু আহরণে/ দাঁড়াবার সময় তো নাই ।

অঙ্কশঙ্কা, নববর্ষ, আগমনী, সোনামণির রাগ প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য লেখা । শিশুরঞ্জন রামায়ণ (১৮৯১), ছেলেখেলা (১৮৯৮), টুকটুকে রামায়ণ (১৯১০), পুষ্পাঞ্জলি (১৯৩৪) ও ছবির ছড়া (১৯৩৬) তাঁর উল্লেখযোগ্য বই ।

রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রচুর কিশোর কবিতা লিখেছেন। লোকছড়া সংগ্রহে তাঁর উদ্যোগই ছিল সব চাইতে বাস্তবভিত্তিক। সংগৃহীত লেখা পত্রিকায় ছাপিয়ে হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন লোকছড়াকে। এ বিষয়ে গুণিজন ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং নিজে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন এ বিষয়ে। এ সময়টার তাঁর বয়স তেত্রিশ মাত্র। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে প্রচুর ছড়া লিখেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে বাংলা লেখ্য ছড়া বিষয়ে একটি পথরেখা তৈরি করে দিয়েছেন।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে 'খুকুমনির ছড়া' নামে একটি লোকছড়ার সংকলন করেন ১৮৯৯ সনে। শিশুদের মাসিক পত্রিকা 'মুকুল' এর প্রতিষ্ঠাতা। 'হাসিখুশি' প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সনে। অসম্ভব জনপ্রিয় এ বইটি এখনো সমান জনপ্রিয়। পাঠক হয়তো মনে করতে পারবেন 'অ-তে অজগর আসছে তেড়ে/ আ-তে আমটি আমি

খাব পেড়ে'-র কথা। বাংলা ছড়াকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। জনপ্রিয়ও করে তুলেছিলেন। প্রচুর লিখেছেন গদ্যে-পদ্যে। অনুবাদ করেছেন।

অসংখ্য ছড়া আছে তাঁর যা এখনো সমান জনপ্রিয়। তিনটি ছড়ার প্রথম লাইনের উল্লেখ করছি। এ রকম তিনটি ছড়া লেখা বহু লেখকের আজীবনের স্বপ্ন হতে পারে–

১. কাজের ছেলে (দাদখানি চাল, মসুরির ডাল)

২. দশটি ছেলে (হারাধনের দশটি ছেলে)

৩. মজার মুল্লুক (এক যে আছে মজার দেশ/ সব রকমে ভালো)

সুকুমার রায়ের হাতে ছড়া সত্যিকারের রূপ নিল। স্বল্পস্থায়ী জীবনে যে বিপুল কাজ তিনি করে গেছেন সে বিষয়ে পাঠক অবহিত আছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকে বাংলা ছড়া পাঠ নিয়েছে ছন্দ বৈচিত্র্যের। আর এ ভাবেই তৈরি হয়েছে লেখ্য ছড়ার বুনিয়াদ। আজকের দিনে লেখ্য ছড়া বহু গুনী মানুষের হাতের ছোঁয়ার নতুন রূপ নিয়েছে। শিশুতোষ ছড়ার জগতের পাশাপাশি বড়দের জগৎও ছড়ার বিষয়বস্তু হয়েছে। এখনো ছড়া শিশুর মন ভোলায়। তবে সমাজবাস্তবতাও এখন ছড়ার বিষয়। সমাজের অসংগতি নিয়ে কটাক্ষের ভাষাও ছড়াকারের আয়ত্তে। লেখ্য ছড়ার এই সাবালকত্ব প্রমাণ করে ছড়া নিয়ে আরো ভাবার সুযোগ আছে ছড়াকারদের।

[লেখক: ছড়াশিল্পী, সাংবাদিক]

ছড়া, ছড়াকার ও ছড়াবই

ফা রু খ সি দ্ধা র্থ

বাংলাসাহিত্যে ছড়ার অবদান বিশাল। যদিও তাত্ত্বিক দিক থেকে এর মধ্যে বিতর্ক আছে এবং কখনো কখনো তা তার্কিকও হয়ে ওঠে। কারণ অনেকেরই ধারণা– ছড়া মানেই শিশু-কিশোরদের ব্যাপার-স্যাপার... ইত্যাদি। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস সে-কথা বলে না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন লোককবি ছাড়াও আধুনিক যুগের উপেন্দ্র কিশোর রায়, সুকুমার রায় থেকে অন্নদাশংকর রায় হয়ে এযাবৎ যদি আমরা ছড়ার সময়কালকে বিচার করি, দেখব– ছড়াশিল্প সমাজ তো বটেই, কোথাও কোথাও রাজনীতিরও প্রতিনিধিত্ব করেছে; অর্থাৎ ছড়া যে শুধু শিশু-কিশোরদের জন্যে নির্ধারিত নয়– কথা এই একটাই। এক্ষেত্রে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থান, নব্বইয়ের গণআন্দোলন, এমনকি যুদ্ধাপরাধীদের উপযুক্ত বিচারের দাবিতে সৃষ্ট গণজাগরণের মধ্যে জন্ম নেওয়া কিছু ছড়াকেও আমরা আলোচনায় আনতে পারি।

তবে দুঃখের বিষয়– যুগ যুগ ধরে আমরা পুরনো ধাঁচের ছন্দের ওপর নির্ভর করেই এসব ছড়া-পদ্যের ফুল ফুটিয়ে চলেছি। কিন্তু সময় পাল্টেছে, জীবনও বদলেছে, সংস্কৃতিতেও তৈরি হয়েছে নতুন আবহ; প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে পৃথিবীর কতকিছু বদলেছে, শুধু বদলায়নি আমাদের ছড়ার আদল। ফলে আমরা পড়ে আছি শতাব্দীকাল পেছনেই। আমাদের ছড়াসাহিত্য বিশ্বের প্রধানতম সাহিত্যের সাথে অপরিচিত– এ অবস্থা চলতে পারে না। কারণ রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকুমার আমাদের পূর্বসূরি। তাঁদের ঝাপসা হয়ে যাওয়া-পথটা আমাদের নতুন আলোয় ভরিয়ে তুলতে হবে।

খুব বড় কোনো আবিষ্কার-উদ্ভাবনে এ মুহূর্তে না-ইবা গেলাম।

অন্তত আমরা যারা ছড়াপদ্য নিয়ে ভাবি, তারা প্রচলিত গৎবাঁধা ছন্দের কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে আবোল তাবোল শব্দের বাহারি ছন্দসুর মনের ভেতর থেকে সাদা পৃষ্ঠায় সাজিয়ে নিতে পারি। তারপর সেই অর্থহীন ছান্দিক সংলাপের শব্দগুলোতে অর্থপূর্ণ শব্দ বসিয়ে বসিয়ে একটা ছান্দিক ছাঁদ দাঁড় করাতে পারি।

জাপানিরা হাইকু, লিয়র মিমেরিক, ওমর খৈয়াম-হাফিজরা রুবাইয়াৎ বানিয়েছেন, আর আমরা তাঁদের ওপর সওয়ার হয়ে কেবল অনুকরণের বর্জ্য বাড়িয়ে চলেছি। এ প্রসঙ্গে

স্বনামধন্য ছড়াকার ফারুক নওয়াজের প্রস্তাব: একটু মাথা খাটালে আমরা ছয় পঙ্‌ক্তির 'ফারকিউ ভার্স' বা 'ফারকোলজি' ধরনের একটা নতুন কাঠামোও দাঁড় করাতে পারি; যেমন–

হাসমত হাসে না তো, ধলা মিয়া কালো
চেরাগাজি ঘরে তার জ্বলে না কো আলো
দুখিরাম সুখি বেশ, সুখু মিয়া দুখি
চিকন আলী মোটা
বয়সের ভারে কুঁজো নাম তার খুকি
সবই উল্টোটা।

অর্থাৎ ছয় পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট এই পদ্যে অন্ত্যমিল থাকবে প্রথম ও দ্বিতীয়তে, তৃতীয় ও পঞ্চমে আর চতুর্থ ও ষষ্ঠতে; তবে এ-দুটি হবে ছোট পঙ্‌ক্তি। যে কোনো চৌকস ছন্দকার এভাবে ভাবাবেগ ও মেধাবেগ সংযোগে নতুন নকশার ছড়া-কবিতা উদ্ভাবন করতে পারেন। সেই সাথে নিজের নামটাও জুড়ে দিয়ে সুযোগ নিতে পারেন অমরত্বের। এক্ষেত্রে নতুন ছন্দটা পরের কথা, আগে নতুন কিছু কাঠামো দাঁড় করালেও আমাদের ছড়া-কবিতা পুরনো খোলস থেকে বেরোতে পারবে এবং এভাবেই একদিন নতুন ছন্দও হেসে উঠবে।

উল্লিখিত দৈন্যতার ভেতরেও আমাদের ছড়ার ক্ষেত্রটিকে নানাভাবে আলোকিত করেছেন যেসব প্রবীণ কবি, তাঁদের মধ্যে জসীম উদদীন, মঈন উদ্দীন, সুফিয়া কামাল, বন্দে আলী মিয়া, কাজী কাদের নওয়াজ, ফররুখ আহমেদ, আহসান হাবীব, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, রোকনুজ্জামান খান, কাজী আবুল কাশেম, মনোমোহন বর্মণ, হীরন্ময়ী বর্মণ, আবদার রশীদ, সরদার জয়েনউদদীন, হোসনে আরা, ফয়েজ আহমেদ, এখলাস উদ্দিন আহমদ, সানাউল হক, নিয়ামত হোসেন, হাসান জান প্রমুখ অন্যতম।

এঁদের মধ্যে কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, কারণ তিনিই এখানকার প্রথম সিদ্ধ ছড়াকার। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি তাঁর 'সাতনরী হার' বইটির প্রকাশ তখনকার সামাজিক-রাজনীতিক তুঙ্গ অবস্থার ভেতরেও বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এই চটিবইটিতে গুটিকয়েক ছড়া ও কবিতা ছিল। ছড়াগুলোর উদ্দিষ্ট ছোটরা ছিল না এবং সেগুলোর মধ্যে ব্যঙ্গ ছিল। উল্লিখিত ঐতিহাসিক কারণেই উক্ত বইটি এবং রচয়িতা হিসেবে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর নাম স্মরণীয়।

এরপর ষাটের দশক থেকে শূন্য দশকের বেশ কয়েকজন এ-ক্ষেত্রটিকে আরো আলোকিত করেছেন এবং এখনো করছেন। তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যাক:

রফিকুল হক: বাংলাদেশে ছড়ায় নতুন মাত্রা এনেছেন। ছন্দে-কথায়-কাঠামো বৈচিত্রেও তাঁর ছড়াগুলো অন্যদের চেয়ে আলাদা। ফলে তাঁকে সহজেই চেনা যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছড়াবই 'পানতা ভাতে ঘি'।

সুকুমার বড়ুয়া: ষাটের দশকের শ্রেষ্ঠ ছড়াকার; সুকুমার রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই– 'পাগলা ঘোড়া', 'ভিজে বিড়াল', 'চিচিং ফাঁক', 'ছড়াসমগ্র', 'ঠিক আছে ঠিক আছে' ইত্যাদি।

মাহমুদ উল্লাহ: ষাটের দশকের নতুন ভাবনার ছড়াকার। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই 'ছানাবড়া', 'তোলপাড়'।

আবু সালেহ: আমাদের সমকালীন ছড়াকে নবজন্ম দিয়েছেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি ছড়ার ফুলকি ছড়িয়ে সাহিত্যে তাঁর পদযাত্রা। তাঁর 'পল্টনের ছড়া', 'চিরকালের খোকা' আমাদের ভেতর স্বপ্ন-সাহসের স্পন্দন সৃষ্টি করে।

আখতার হুসেন: ষাটের দশকের ছড়ার দুর্দান্ত তীরন্দাজ। সমাজমনস্ক এই ছড়াকার স্যাটায়ারধর্মী ছড়াতেও ব্যতিক্রমী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই– 'হৈহৈ রৈরৈ', 'প্রজাপতি ও প্রজাপতি'।

শাহাবুদ্দীন নাগরী: সত্তুর দশকের ভাবনা-বৈচিত্র্যের সফল ছড়াকার। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই– 'নীল পাহাড়ের ছড়া', 'নকশিকাটা ছড়া' ইত্যাদি।

ফারুক নওয়াজ: স্বনামধন্য ছড়াকার। সত্তুর দশকে কবিতার হাত ধরে তাঁর সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ। 'আগুনের বৃষ্টি' তাঁর প্রথম কাব্য; প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। তারপর কবিতার পাশাপাশি ছড়াসহ বিচিত্র বিষয় নিয়ে নিরন্তর লিখে চলেছেন; নতুন নতুন ছড়া লিখে সমৃদ্ধ করছেন আমাদের ছড়াসাহিত্যকে এবং স্বাক্ষর রাখছেন তাঁর নিজস্ব কারিশমার। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছড়াবই 'মা সত্য পৃথিবী সত্য'...

খালেক বিন জয়েনউদ্দীন: সত্তুর দশকের শুরু থেকে লিখছেন। তিনি আমাদের চিরকালের লোকছড়ার আলোটাকে ধারণ করে বাংলার আবহমান ছন্দভাবনা লালন করে চলেছেন। তাঁর 'ধানসুপারি পানসুপরি' 'আতাগাছে তোতাপাখি' সেই ভাবনারই বিচ্ছুরণ।

লুৎফর রহমান রিটন: চটুল বিষয়ে পাঠক নাচানো ছড়ার সফল রূপকার। রাজনীতিক ও সামাজিক ছড়াও প্রচুর লিখেছেন। তাঁর 'উপস্থিত সুধিবৃন্দ' একটি উল্লেখযোগ্য সমকালীন ভাবনার ফসল। জনপ্রিয় ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটনের যাবতীয় ছড়ার একক সংকলন 'ছড়াসমস্ত' ইতোমধ্যেই পাঠকের হাতে পৌঁছে গেছে।

ফারুক হাসান: সত্তুর দশকের শেষার্ধের এক ছন্দকিশোর কবি। তাঁর 'লুটোপুটি' 'উড়োচিঠি' ইত্যাদি বইয়ে অসাধারণ কিছু ছড়া রয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্যে এবং ছন্দদ্যোতনায় সেগুলো ছোট-বড় সবার কাছেই সমান আনন্দের দোলা দুলিয়ে যায়। 'শতরকমের ছড়া' তাঁর বিচিত্র ছড়ার একক ছড়াসংকলন।

আহসান মালেক: সুজন বড়ুয়া ও ফারুক হোসেনদের প্রায় সমসাময়িক এই ছড়াকারের ছড়া-কবিতায় তাঁর বোধটা স্পষ্ট। ছন্দ বোঝেন, কথাকে খেলাতে পারেন, স্বপ্নও ছড়াতে পারেন। তাঁর 'জগাখিচুড়ি' পড়লেই এই পরিচয়টা ধরা পড়ে।

দেওয়ান বিন রশিদ: সত্তুর দশকের শুরুতে আসা চিরায়ত লোকজ ভাবনার ছড়াকার। 'ইস্টিশানে বিষ্টি' ও 'শাপলা পাতা শীতলপাটি' তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি ছড়াবই।

মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন: সত্তুর দশকের বিশিষ্ট ছড়াকার। লিখেছেন কম তবে মানে উৎকৃষ্ট। 'জিকুর বেলুন' তাঁর উল্লেখযোগ্য ছড়াবই।

এনায়েত হোসেন: সত্তুর দশকের এক তেজি ছড়াকারের নাম। ছড়ার মাধ্যমেই তিনি সমাজ ও রাজনীতির নানা অসংগতি ও শোষণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন। প্রচলিত ছড়ায়-ছন্দে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অজস্র ফুলকি ফুটিয়েছেন এই ছড়াকার। খরস্রোতা পদ্মার ভাঙনের সাথে তাঁর সংগ্রাম করে টিকে-থাকা হয়তো তাঁকে এমন একটা চারিত্র্য দান করেছে। তাই একটি মফস্বল শহরে দারিদ্র্যের সাথে বাস করেও তিনি উজ্জ্বল আলোকের বাইরে এক জোনাকি আলো হয়ে জ্বলছেন। তাঁর প্রথম ছড়াবই 'চোখের জলে আগুন জ্বলে' তাঁর একটি নারীবাদী ছড়াসংকলন। সম্প্রতি ফরিদপুর প্রেসক্লাবে তাঁর 'ছড়াসমগ্র'র মোড়ক উন্মোচিত হয়েছে।

রহীম শাহ: সত্তুর দশকের শেষার্ধের ছড়াকার। রাজপথের ছড়া দিয়ে হাতেখড়ি। তারপর একে-একে লিখেছেন অনেক ছড়া। 'সবার আগে কুসুমবাগে' ও 'পাখির ছড়া পাখির পড়া' তাঁর দুটো উল্লেখযোগ্য ছড়াবই।

আলম তালুকদার: সত্তুর দশকের শেষ পর্বের ছড়াকার। সহজ-সাবলীলভাবে লিখতে দক্ষ এই ছড়াকারের উল্লেখযোগ্য বই– 'ছড়ায় ছড়ায় আলোর নাচন'।

মাহবুবুল হাসান: সত্তুর দশকের বিশিষ্ট ছড়াকার। তাঁর ছড়ায় শিশু-কিশোর-ভাবনার স্বপ্নময় প্রকাশ যেমন লক্ষণীয়, তেমনি সমাজমনস্ক ছড়াতেই সাবলীল। 'ইঁদুরের পাল্লায় হুলো বেড়াল', 'কুটুমপাখির ছড়া' তাঁর উল্লেখযোগ্য বই।

আসলাম সানী: আশির দশকের মারকুটে রাজনীতিক ছড়াকার। তিনি একজন স্বভাব ছড়াকারও। অসংখ্য লিখেছেন। সংখ্যাধিক্যের কারণে এই নাগরিক কবির মূল্যায়ন করা জরুরি। সভামঞ্চের সফল ছন্দবাজ আসলাম সানীর বইয়ের সংখ্যাও অনেক। যে কোনো বই থেকেই পাঠক আনন্দ পেতে পারেন।

আমীরুল ইসলাম: আশির দশকের উজ্জ্বল ছড়াকার। শতাধিক বইয়ের রচয়িতা। প্রথম ছড়ার 'বই 'খামখেয়ালী'। 'হাজার ছড়া' তাঁর একক ছড়াসংকলন।

জসীম মেহবুব: আশির দশকের শুরুতে এসেই ছড়াই একটি নিজস্ব ভাষা ও ভাবনা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। 'সোনার বরণ পক্ষি' 'কান্নাহাসির পান্নাহীরে' তাঁর পদ্যছড়ার উল্লেখযোগ্য বই।

মাহবুবুল আলম কবীর: বিচিত্র বিষয়ে ছড়া লেখেন। কোন বিষয় বা প্রসঙ্গ কোন ছন্দে গাঁথতে হবে সেটি তাঁর আয়ত্তে। আশির দশকের এই ছড়াকারের উল্লেখযোগ্য ছড়াবই– 'ধানাই পানাই'।

মিজানুর রহমান শামীম: আশির দশকের ছন্দকবি। তাঁর ছড়া-কবিতার ভাবনা-বৈচিত্র্য ও ছন্দশৈলী তাঁর একান্ত নিজস্ব। 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' তাঁর একটি মানসম্পন্ন ছড়াপদ্যের বই।

আনজীর লিটন, রোমেন রায়হান ও ওবায়দুল গনি চন্দন: এই তিন ছড়াকারকে একসাথে নব্বই দশকের ত্রিরত্ন বলা যায়। এর মধ্যে আনজীর ও চন্দন ছড়ায় যতটা প্রযুক্তিনির্ভর ততটা আবেগ ও চিরায়ত বোধে উদাসীন। এদিক দিয়ে রোমেন বিষয়-ভাবনা বোধে ব্যতিক্রম। আনজীর লিটনের 'খাড়া দুটো শিং', 'বিড়ালটা সিমকার্ড খেয়ে ফেলেছে'; ওবায়দুল গনি চন্দনের 'চন্দনের ছন্দ নে' এবং রোমেন রায়হানের 'আয়রে খোকা ঘরে আয়' উল্লেখযোগ্য ছড়াবই।

আহমেদ সাব্বির: সুদূর মফস্বল থেকে নিয়মিত লেখা পাঠিয়ে রাজধানীর পত্রপত্রিকায় তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন। তাঁর প্রথম ছড়াবই 'বিষ্টিভেজা মিষ্টি সকাল'-এ যে ভাবনা, ছন্দবৈচিত্র্য ও বিষয়ে নতুনত্ব তা প্রশংসার দবি রাখে।

উপরোক্তদের বাইরেও এই সময়ে আরো কিছু ছড়াকার আছেন পত্রপত্রিকাসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় যাঁদের সরব উপস্থিতি বলে দেয় তাঁরা নিজেদের সময়কে গৌরবদীপ্ত সম্মানে পৌঁছে দিতে প্রয়াসী, যেমন– জগলুল হায়দার, রমজান মাহমুদ, নাসের মাহমুদ, ফয়েজ রেজা প্রমুখ।

পরিশেষে এমন ক'জনকে স্মরণ করতে হয় 'সময়' যাঁদেরকে দিয়ে একদা লিখিয়ে নিয়েছে প্রচুর ছড়া (এঁদের মধ্যে কারো কারো প্রতিভা পরবর্তী সময়ে অন্য মাধ্যমেও বিকশিত হয়েছে); যেমন– কাইয়ুম চৌধুরী (তাই তাই তাই), অকালপ্রয়াত হাসান জান (নরম গরম), মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান (মিছিলের মুখ), আবু হাসান শাহরিয়ার, তারেক মাসুদ, পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অকালপ্রয়াত বাপী শাহরিয়ার প্রমুখ।

বাংলা ছড়াসাহিত্যে এঁদের সবার অবদান স্মরণযোগ্য।

[লেখক: কবি, ছড়াশিল্পী।]

বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

সু জ ন ব ড়ু য়া

'বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বিষয়টি গঠিত হয়েছে প্রধানত তিনটি বহুমুখী অনুষঙ্গের সমন্বয়ে। অনুষঙ্গ তিনটি হলো 'বাংলাদেশ', 'ছড়াসাহিত্য' ও 'মুক্তিযুদ্ধ'। এ তিনটি অনুষঙ্গেরই রয়েছে সুবিশাল প্রেক্ষাপট। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এগুলোর বিশালত্ব উপস্থাপনের সুযোগ নেই বললেই চলে। তবু আলোচনার সূত্র হিসেবে এ অনুষঙ্গগুলোকে সামনে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে আমাদের।

আমরা জানি, বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যের ঐতিহ্য সুপ্রাচীনকালের। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় মাত্র ৪৮ বছর আগে, ১৯৭১ সালে রক্তঝরা অশ্রুমাখা নয় মাসের সশস্ত্র এক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, যাকে আমরা বলি মুক্তিযুদ্ধ। এর পেছনেও রয়েছে সুদীর্ঘ আন্দোলন, বিক্ষোভ, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের গৌরবময় ইতিহাস, স্বপ্নভঙ্গের বেদনার্ত স্মৃতি। বাংলাদেশ হলো রাজনৈতিক পালাবদলের অসহায় ও অনিবার্য এক পরিণতি। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র ভাগের সময় বাংলাদেশ নামের ভূখ-টি একটি প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রে। নামকরণ হয় পূর্ব পাকিস্তান। তারও আগে ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর ভূখ-টি ছিল ইংরেজদের শাসনাধীন পাক-ভারত উপমহাদেশের অংশ।

যা হোক, স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধ তা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এই অঞ্চলের গণ-মানুষের দীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের চূড়ান্ত বহির্প্রকাশ ছিল মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের সূচনা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ হলেও এর পটভূমি কিন্তু তৈরি হয়েছিল অনেক আগে। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জন্ম ১৯৭১ সালে নয়, তারও বেশ আগে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এর সূত্রপাত এবং ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঘটে তার উচ্চকিত প্রকাশ। এরপর ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের ১১-দফাভিত্তিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সে চেতনা সঞ্চারিত হয়

ব্যাপক জনমানসে। ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ সে চেতনা বাস্তবায়নের একটি অমিত সম্ভাবনাময় ভিত্তিভূমি রচনা করে, নবগঠিত বাংলাদেশের সংবিধানের মূল স্তম্ভগুলোতে যার উজ্জ্বল প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। সংবিধানের বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ইত্যাদি মূলস্তম্ভ অসাম্প্রদায়িক উদার মক্ত চেতনার দ্বার উন্মোচিত করে। এ চেতনার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে আমাদের শিল্প-সাহিত্যচর্চায়। ছড়াসাহিত্যও এর প্রভাব বহির্ভূত নয়।

প্রাচীনকালে ছড়া 'লেখা' হত না, মুখে মুখে 'কাটা' হতো। আর সেই ছড়া মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত জন থেকে জনতায়, যুগ থেকে যুগে। লোকসাহিত্য হিসাবে সংগৃহীত হতে হতে অনেক পরে গড়ে ওঠে এর লৈখিক ঐতিহ্য । বাংলায় এ ক্ষেত্রে প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ যোগীন্দ্রনাথ সরকার। বাংলার লোকছড়াগুলো সংগ্রহ করে 'খুকুমণির ছড়া' শিরোনামে প্রকাশ করেন তিনি। আজ থেকে ১২০ বছর আগে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩০৬ বঙ্গাব্দ) সেই খুকুমণির ছড়া সংগ্রহের ভূমিকা লিখতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রথম 'ছড়াসাহিত্য' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন।

দেশ ও সমাজের আলোড়িত ঘটনাবলি নিয়ে প্রাচীনকালে অনেক ছড়া রচিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কালজয়ী ছড়াও আছে। যেমন ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলীবর্দীর শাসনামলে বর্গী হাঙ্গামাকে কেন্দ্র করে রচিত ছড়া:

'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে ?
ধান ফুরাল পান ফুরাল
খাজনা উপায় কী !
আর ক'টা দিন সবুর করো
রসুন বুনেছি।'

এই ছড়ার প্রেক্ষাপট ব্যাপক ও গভীর, বড়োদের ভাবনা ও গবেষণার বিষয়। কিন্তু প্রকাশভঙ্গির সারল্য ও ধ্বনিমাধুর্যে এটি হয়ে উঠেছে শিশুদের পরম উপভোগের বস্তু।

যুগের অগ্রতির সঙ্গে সঙ্গে ছড়া রচনার উদ্দেশ্য, বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক-কলেবর বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ছড়াও এখন নিয়মিত চর্চার বিষয়। শিশুতোষ ছড়ার মেজাজ নিয়ে শতাব্দী কাল আগে যে ছড়ার যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা এখন ক্ষতবিক্ষত জীবন ও সমাজের নানা সমস্যা ও অসঙ্গতিকে প্রকাশ করতে সক্ষম। ছড়া এখন শাণিত ছুরির মতো দ্যুতিময়। একটি মর্যাদাবান সাহিত্য-মাধ্যম হিসেবে ছড়া এখন সর্বজনস্বীকৃত।

আগেই বলেছি, সেই ব্রিটিশ-ভারতের আমলে বাংলাদেশ নামের এই ভূখ- যখন পূর্ববঙ্গ নামে পরিচিত ছিল, তখনও এ অঞ্চলে ছড়াচর্চা হতো। নানা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক রদবদলের মধ্যেও এ অঞ্চলে ছড়াচর্চা কখনো থেমে থাকেনি। বরং রদবদলের প্রভাবে ছড়াচর্চা নিয়েছে নতুন নতুন বাঁক, ঘটেছে পালাবদল, বিকাশ ও রূপান্তর। বাংলাদেশের বর্তমান ছড়াসাহিত্য সেই ধারানুক্রমেরই প্রসারণ।

ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় যে নানামুখী জাগরণ ঘটতে শুরু করে তার আঁচ লাগে এসব লেখকের সাহিত্য-ভাবনায়। দেশের অনিবার্য রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আমাদের শিশুসাহিত্যকেও প্রভাবিত করতে থাকে। বিশেষ করে ছড়াসাহিত্যে এর প্রভাব পড়ে সরাসরি। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের প্রভাবে আমাদের ছড়ায় ধ্বনিত হতে থাকে সমাজমনস্ক সুর।

দুই.

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর স্বাধীন বাংলাদেশে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, প্রকাশনা সবক্ষেত্রে আবেগ উৎসারিত হয় উচ্ছ্বসিত ফোয়ারার মতো। কবি-সাহিত্যিকরা লিখতে থাকেন নতুন স্বপ্ন-আবেগ, অঙ্গীকার ও প্রত্যয় নিয়ে। লিখতে থাকেন রক্ত ও অশ্রু ভেজা হৃদয়-নিংড়ানো অনুভূতিঘন পংক্তিমালা। সবার কাছে যেন মুক্তিযুদ্ধ হয়ে ওঠে আত্মপরিচয়ের অভিযান, পথ চলার প্রেরণা, সঞ্জীবনী অনির্বান শিখা। শিশুসাহিত্যেও এর ছোঁয়া লাগে। শিশুসাহিত্যের বিষয়-অনুষঙ্গের সঙ্গে শাখা-প্রশাখারও ঘটে বিপুল বিস্তার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কোনো না কোনোভাবে আন্দোলিত হননি এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখি করেননি বাংলাদেশে এমন লেখক দু'একজনও আছেন কিনা আমার সন্দেহ। প্রধান গৌণ সব লেখকই মোটামুটি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন, তার মধ্যে ইতিবাচক লেখাই বেশি। সুতরাং স্বাধীনতা পরবর্তী মোটামুটি আটচল্লিশ বছরে ছড়া-কবিতা চর্চায় রত ছিলেন বা আছেন এমন সকলের অবদানের কথা এ প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। সকল লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সময় ও পরিসর স্বল্পতার কারণে আমি কেবল আলোচনা ও উদ্ধৃতির সূত্রে প্রয়োজনীয় কয়েকজন লেখকের নামোল্লেখ করব। আলোচনায় নামগুলো বয়ক্রমানুসারে বিন্যাস করতে না পারার জন্য আগেভাগেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালির চিন্তা-জগতে বৈষম্যহীন শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক চেতনার যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাদেশের লেখকদের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ও দেশপ্রেমমূলক ছড়া-কবিতা সে জাগরণেরই সারাৎসার। লেখকরা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিচ্ছেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অচিন্তনীয় বীরত্ব আছে, আকাশ ছোঁয়া বিজয় আছে, আর সবচেয়ে বেশি আছে স্বজন হারানোর বুকভাঙা বেদনা। ঘাম, রক্ত, অশ্রুমাখা ধূসর-করুণ সেইসব দিনরাত্রি। স্বাধীনতার পর এসবই হয়ে ওঠে আমাদের লেখকদের সৃষ্টির অনন্ত উৎস।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বহুল চর্চিত মাধ্যম ছড়া। ছড়ার আদলে এক সময় প্রচুর ছোটদের কবিতা রচিত হতো, যা এখন নামে বিশেষভাবে কিশোরকবিতা পরিচিত। গঠনকর্মের সূক্ষ্ম বিচারে ছড়া ও এই শ্রেণির কবিতা যদিও আলাদা মাধ্যম তবু সংক্ষিপ্ত পরিসরের কারণে ছড়া-কবিতার আলোচনায় আমরা বিভাজন রেখা টানব না। আমরা মুক্তিযুদ্ধের ছড়া-কবিতার আলোচনা করব একই সঙ্গে, একই অধ্যায়ের আওতায়।

আমাদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী ছড়া-কবিতার প্রবহমান যে ধারা তার সূচনাপর্ব মূলত ভাষা আন্দোলন। পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ সে ধারাকে আরো জোরদার করে। সেইসঙ্গে ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকা-ের মতো নৃসংশতম বেদনার্ত ঘটনাও এ ধারাকে দিয়েছে বিস্তৃতি। কেননা এ হত্যাকা-ের প্রতিবাদে জনমনে আরেক সংগ্রামের সূচনা ঘটে, যাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনারই পুনর্জাগরণ বলা যায়। আসলে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এ তিনটি বিষয় যে এক সূত্রে গাঁথা এ ঐতিহাসিক সত্য এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হননি বাংলাদেশের কবি-ছড়াকাররা। সে কারণে বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছড়া রচনায়ও যুগের পর যুগ অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে আসে বঙ্গবন্ধু। এই সৃষ্টিধারাও নিশ্চয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে উৎসারিত। ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ব্যাপ্তি কিন্তু যুদ্ধকালীন নয় মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহও এর আওতাভুক্ত।

বাংলাদেশের ছড়ায় বাঙালির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ যেমন আবেগময় ভাষায় চিত্রিত হয়েছে, তেমনি পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিচ্যুতিসহ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অসম্মান ও অমর্যাদাকর হতাশার দিকও উঠে এসেছে উজ্জ্বলভাবে। এর মধ্য দিয়ে কিশোরমনস্ক পাঠকদের মনে যেমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সঞ্চারের পথ সুগম হয়, তেমনি পরিণত ব্যক্তিমানসের গবেষণায় মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ উদ্বোধন ও উদঘাটনে নতুন নতুন চিন্তা-সূত্রের দ্বার উন্মোচিত হয়। ইতিহাসকে ধারণ করে ছড়া যে কালজয়ী হয় এবং চিরায়ত রূপ লাভ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছড়াগুলো তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ পর্যায়ে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছড়াগুলোর উপর নির্ভর করে যে কোনো অনুসসন্ধিৎসু গবেষক বাংলাদেশের নির্ভুল রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হবেন। ছড়াসাহিত্যের দীর্ঘ পরিক্রমায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী যেসব অনুষঙ্গ সাধারণভাবে মূর্ত হতে দেখা যায় সেগুলো হলো:

(ক) শোষণ-বঞ্চণার চিত্র ও জীবন-পণ সংগ্রামের প্রত্যয়
(খ) স্বাধীনতার জন্য জনমানুষের অপ্রতিরোধ্য একাত্মতা
(গ) পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর এ দেশীয় দোসরদের ভূমিকার নিন্দা
(ঘ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে দিন বদলের ডাক
(ঙ) যুদ্ধকালীন সময়ের জীবনচিত্র

(চ) স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রকৃতি ও নিসর্গ প্রীতি
(ছ) স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিতর্পণ
তবে বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিশ্লেষণে কেবল উপরের এই সাতটি অনুষঙ্গই চূড়ান্ত বিবেচনা নয়। দেশপ্রেমমূলক যে কোনো ছন্দোবদ্ধ রচনায় ভিন্ন মাত্রার ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যও পরিস্ফুটিত হয়ে থাকতে পারে, যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকেই সৃষ্টি।

তিন.

বাংলাদেশের ছড়ার গণমুখী যে ধারা আধুনিককালে তার প্রথম প্রেরণা ছড়াগুরু অন্নদাশঙ্কর রায়। লোকছড়ার ঐতিহ্যের সঙ্গে সমকালীন জীবনপ্রবাহের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন আধুনিক ছড়ার অবয়ব। নিজের ছড়াচর্চা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, '...মডেল হিসাবে আমি নিয়েছিলুম ছেলে ভোলানো ছড়া, আগডুম বাগডুমইত্যাদি। যার বয়স হাজার বছরেরও বেশী। একদিকে জনসাধারণ, অন্যদিকে নিরবধি কাল, দুই মালিক আমাকে কান ধরে উঠবস করিয়েছে। ...ছড়া লেখার উপকরণ আসে সমসাময়িক ঘটনা বা পরিস্থিতি থেকে।' এভাবেই বাংলা সনাতন ছড়ায় অন্নদাশঙ্কর রায় যুক্ত করেন একটি নতুন মাত্রা, আধুনিক বক্তব্য। এ ধারায় ভারত বিভাগের বেদনাকে ধারণ করে লেখা তাঁর চিরনতুন উদাহরণ–

'তেলের শিশি ভঙলো বলে
খুকুর 'পরে রাগ করো,
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো,
তার বেলা?'
(অন্নদাশঙ্কর রায়)

খ্যাতিমান ছড়া-গবেষক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ এ ছড়া সম্পর্কে বলেছেন, 'এ ছড়া প্রকাশ্যেই ভারত বিভাগের বিরোধিতা করে রচিত, কিন্তু শিল্পগুণে স্থায়ী সম্পদ। সুতরাং অন্নদাশংকরের পর ছড়া আর শিশু কিশোরদের থাকে না, তা হয় বড়দেরও।'

গণমুখী ছড়ার এ ধারা এ বাংলার লেখকদেরও আকৃষ্ট করে প্রবলভাবে। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রত্যেক জাতীয় আন্দোলন-সংগ্রামে এ ভূ-খ-ের কবি-ছড়াকারেরা ছড়াকে গ্রহণ করেছেন মত প্রকাশের বাহন হিসেবে। ১৯৬৬-এর স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ছড়াকাররা ছিলেন রীতিমতো কলম সৈনিক। এ সময়ের একটি ছড়া এরকম–

'তা ধিন্ ধিন্ না,না তিন তিন না
হাসির দিন না
বাঁশির দিন না
না ঢাক না ঢোল

না খোল বীণ না ।
তেরে কেটে ধিন্
তেরে কেটে ধিন্
খালি পেটে দিন
ভারি সঙ্গিন ।
তাক ধিনা ধিন্
নাক্‌তি নাতিন
বিশটা বছর
দেশটা স্বাধীন
হায়রে কপাল
আসলো যা দিন!
তেরে কেটে ধিন্
তেরে কেটে ধিন্
আর কত হীন
কেঁদে কেটে দিন?'
(রফিকুল হক / ১৯৬৭)

ছড়ার শিরোনাম '১৯৬৭'। তখন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিশ বছর। বিশ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের নিরন্তর নির্যাতিত জনসাধারণের দৈন্যদশা ও শ্বাসরুদ্ধকর রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি এ ছড়ার বিষয়বস্তু। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর ১৯৬৬ সালে ৬ দফা উত্থাপিত হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় অনাচার, বৈষম্যমূলক আচরণ, শোষণ নিপীড়নের শিল্পিত উপস্থাপন এ ছড়া। ছড়ার বৈশিষ্ট্য শতভাগ অক্ষুণ্ন রেখে ছড়াকার রফিকুল হকের বক্তব্য প্রকাশের দক্ষতা এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ সময়ের আরেকটি ছড়া–

'ঢোল নাকাড়া বাজা
ঢোল নাকাড়া বাজা
দস্যুরা সব নিচ্ছে লুটে
জলদি দেগে সাজা
ঢোল নাকাড়া বাজা!
ঢোল নাকাড়া বাজা
দস্যু মেরে ছিনিয়ে নে তোর
পাবার আছে যা-যা,
ঢোল নাকাড়া বাজা !'
(ঢোল নাকাড়া বাজা / আখতার হুসেন)

সেই সময়ের আরেকটি জনপ্রিয় ছড়া–

চিমসে পেটে হাত বোলাও
ভাত না পেলে খাও পোলাও
তাও না পেলে বাতাস খেয়ে
আচ্ছা করে পেট ফোলাও ।
[আখতার হুসেন]

অথবা–

'পোটলা রাজার বন্দুক আছে
বন্দুকে তার গুলি আছে
কেমন গুলি? কেমন গুলি?
দেয় উড়িয়ে মাথার খুলি ।'
(মাহমুদউল্লাহ)

এ সময় ছড়াকার মোহাম্মদ মোস্তফা লেখেন–

কোন দেশে এক রাজার দেশে এলাম
হাটে ঘাটে মাঠে কেবল সেলাম
পাহাড়-প্রমাণ অনেক সেলাম পেলাম ।
কোন দেশে এক রাজার দেশে এলাম
প্রজারা সব চেঁচায় : গেলাম, গেলাম!
ভাবেন রাজা দিচ্ছে বুঝি সেলাম ।
কোন দেশে এক রাজার দেশে এলাম
না খেয়ে সব প্রজারা কয় : খেলাম
সেই না সোনার দেশকে হাজার সেলাম!
[রাজার দেশে / মোহাম্মদ মোস্তফা]

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার ও শোষণ-শাসনের অমানবিক চিত্র ধারণ করে আছে অসামান্য এ ছড়াটি । এ ছড়াগুলো সে সময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো পালন করেছে বৈপ্লবিক ভূমিকা । ছড়ার এই ইতিবাচক ভূমিকা ক্রমশ যেন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে । অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাকে রূপক অর্থে ধারণ করেছে ছড়া । যেমন ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের শাসন ক্ষমতা অবসানের ঘটনাটি ছড়াকারের কলমে বিধৃত হয়েছে এভাবে :

'মোদের ছিল বিড়াল মিনি
সবাই তাকে চেন
বলল আমি বাঘের মাসি
বাঘ হব না কেন?

সত্যি সেদিন বাঘ হয়ে সে
বসল মোদের সনে!
আমরা তাকে ভয় পেয়ে যে
তাড়িয়ে দিলাম বনে।'
[রিমঝিম: ফয়েজ আহমদ]

এ সময় রাজনৈতিক চেতনায় যারা ছড়াকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন হলেন– ফয়েজ আহমদ, আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, এখলাসউদ্দিন আহমদ, সুকুমার
বড়ুয়া, রফিকুল হক, মোহাম্মদ মোস্তফা, আখতার হুসেন, মাহমুদউল্লাহ, আবু সালেহ, প্রণব চৌধুরী প্রমুখ। আল মাহমুদের এ সময়ের লেখা ছড়া–

'ট্রাক ! ট্রাক ! ট্রাক !
শুয়োরমুখো ট্রাক আসবে
দুয়োর বেঁধে রাখ।
কেন বাঁধবো দোর জানালা
তুলবো কেন খিল?
আসাদ গেছে মিছিল নিয়ে
ফিরবে সে মিছিল।
ট্রাক ! ট্রাক ! ট্রাক !
ট্রাকের মুখে আগুন দিতে
মতিয়ুরকে ডাক।
কোথায় পাবো মতিয়ুরকে
ঘুমিয়ে আছে সে !
তোরাই তবে সোনামানিক
আগুন জ্বেলে দে।'
(ঊনসত্তরের ছড়া-১ / আল মাহমুদ))

তাঁর আরেকটি ছড়া–

'কারফিউ রে কারফিউ,
আগল খোলে কে?
সোনার বরণ ছেলেরা দেখ্
নিশান তুলেছে।'...
(ঊনসত্তরের ছড়া-২ / আল মাহমুদ)

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে প্রচলিত একটি ছড়া, যা পরবর্তকালে সরদার জয়েনউদ্‌দীন কর্তৃক সংগৃহীত হয়।

ইলিশ মাছের তিরিশ কাঁটা
বোয়াল মাছের দাঁড়ি,
টিক্কা খান ভিক্ষা করে
শেখ মুজিবের বাড়ি।
(সরদার জয়েনউদ্‌দীন)

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্লোগান আকারে প্রচুর ছড়ার প্রচলন ঘটে। যেমন–

তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা যমুনা।
অথব–
বীল বাঙালি অস্ত্র ধর
বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
অথবা–
তুমি কে আমি কে
বাঙালি বাঙালি

এ সময়ের আরেকটি ছড়া–

ছড়া ছড়া ছড়া
লিখছি যখন পায়ের তলায়
অযুত নিযুত মড়া।
ছড়া ছড়া ছড়া
রক্ত দিয়ে ছিঁড়তে হচ্ছে
জিন্নার গাঁটছড়া।
(একাত্তরের ছড়া / আসাদ চৌধুরী)

অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের সময় এ ধরনের সার্থক ছড়া বেশি রচিত হয়নি। তবে স্বাধীনতার পর ছড়ার এই ধারাটি আরো বর্ণিল রূপ লাভ করে নতুন প্রজন্মের ছড়াকারদের হাতে। স্বাধীনতার পর শহিদদের আত্মত্যাগ আর স্বজন হারানোর বেদনাকে উপজীব্য করে লেখা হয়েছে প্রচুর ছড়া। যেমন–

‘একটি ছেলে ছোট্ট ছেলে
মনে অনেক কথা
একাত্তরে যুদ্ধে গেল
আনতে স্বাধীনতা।
বীরের মতো লড়াই করে
জীবন দিল নভেম্বরে।
কেউ বুঝিনি সেই সে ছেলের

মনের আকুলতা
একাত্তরে জীবন দিল
আনতে স্বাধীনতা ।'
(একটি ছেলে / আমীরুল ইসলাম)

আবেগের প্রাবল্যে এ সময়ের ছড়ায় কবিতার উপাদানের প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে । পরবর্তী সময়ে এ শ্রেণির লেখাগুলো ছোটোদের কবিতা বা কিশোরকবিতা হিসেবে মর্যাদা পেতে শুরু করে ।

'কেমন করে ভুলি ওদের
কেমন করে ভুলি
তোমার আমার জন্য যারা
বুক পেতে খায় গুলি ।
দুধের বাটি ছুঁড়ে ফেলে
বিষ খেতে যায় সোনার ছেলে
ঘরের সোহাগ ভুলে বনের
বিপদ নিল তুলি ।
বন্দী মায়ের কষ্ট দেখে
দেশকে ভালোবেসে
অনলগিরির জ্বালামুখে
ঝাঁপ দিয়েছে হেসে ।
তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে
মুক্তি যারা আনলো বয়ে
টকটকে লাল রক্তে যারা
রাঙায় পথের ধূলি
কেমন কের ভুলি ওদের
কেমন করে ভুলি ।'
(শহীদ স্মৃতি / সুকুমার বড়ুয়া)

কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ পেতে না পেতে বাঙালি জাতির জীবনে নেমে আসে এক চরম বিপর্যয় । স্বাধীনতা বিরোধীচক্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে নৃশংসভাবে । স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের কবি-ছড়াকারদের মর্মমূল নাড়িয়ে দেওয়া সবচেয়ে বড়ো ঘটনা বঙ্গবন্ধুর এই হত্যাকা- । এর তিন বছর পর ১৯৭৮ সালে সম্পূর্ণ প্রতিকূল ও অবরুদ্ধ রাজনৈতিক পরিবেশে দেশের শোক-বিহ্বল দ্রোহী কয়েকজন ছড়াকার মিলে প্রকাশ করেন একটি ছড়া সঙ্কলন, যার নাম 'এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়' । মানবপ্রেমী ৩০ জন কবি-ছড়াকার এ সঙ্কলনে উচ্চারণ করেন হৃদয় বিদীর্ণ করা গভীর

আবেগঘন পংক্তিমালা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায় থেকে লুৎফর রহমান রিটন পর্যন্ত ।

এ পর্যায়ে আমরা একটু সচেতন হলে দেখব, বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা পরবর্তী ছড়াচর্চায় উপস্থাপনাগত ও ভাষাগত একটি পার্থক্য গড়ে উঠেছে । ষাটের দশকে বক্তব্যপ্রধান রাজনৈতিক ছড়ার ক্ষেত্রে শাসক আর শোষিত এই দুটি শ্রেণি বোঝাতে ছড়ালেখকরা বারংবার রাজা ও প্রজা শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন । সত্তরের শুরুতেও এই ধারা অনেকটা অক্ষুণ্ন ছিল । কিন্তু সত্তরের শেষে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় স্বাধীনতা বিরোধীচক্রের উত্থান ঘটে তখন থেকে রাজা-প্রজা রূপক শব্দের পরিবর্তে সরাসরি শাসক বা শোষকের নাম ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দেয় । এতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছড়ার শিল্পমান প্রশ্নবিদ্ধ হলেও জনপ্রিয়তা লাভ করে ব্যাপকভাবে ।

কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক–

‘গোলাম আযম নাম কুখ্যাত খুনী সে
এখনও বহাল আছে এরকম গুণী সে!
নাগরিকত্ব নেই আমাদের দেশেতে
কেউ ছুঁতে পারে নাক তবু তার কেশেতে
জোর করে এই দেশে সে যে বাস করছে
জামাতের হাতে আজো কত লোক মরছে!
এই লোক জামাতের চিহ্নিত রাজাকার
তার সাজা হয়নিকো, বল হবে সাজা কার?’
(ঘাতক গোলাম আযম / লুৎফর রহমান রিটন)

অথবা ১৯৮৯ সালে স্বাধীনতা বিরোধীচক্রের উত্থানকে কেন্দ্র করে লেখা এই ছড়াটি–

আমরা আবার
গজাইছি
ধর্ম কইরা
মজাইছি
বুদ্ধুপানা লোকগুলারে
ডলার দিয়া ভজাইছি ।
[আবার / রফিকুন নবী]

রফিকুন নবী মূলত একজন চিত্রশিল্পী, বিভিন্ন ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত । ছড়াসাহিত্যেও তিনি তাঁর সেই কার্টুনধর্মিতার বিস্তার ঘটিয়েছেন । ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর নানা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ধর্মতন্ত্র ও ধান্ধাবাজ ধর্মজীবীদের উত্থান ও কালো টাকার দৌরাত্মের নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর এ ছড়ায় ।

'৭৫-এর অনাকাঙ্ক্ষিত পট পরিবর্তনের ফলে ছড়ায় রাজনৈতিক হতাশার সঙ্গে নানা সামাজিক অসঙ্গতিও উঠে আসতে থাকে। বিশেষ করে যুদ্ধাপরাধী রাজাকার-আলবদরদের প্রতি ছড়ায় ধ্বনিত হয় চরম ধিক্কার ও ঘৃণা। এমন একটি জনপ্রিয় ছড়া–

'কন তো দেখি আজকে দেশে
সবচে' শরীর তাজা কার?
–যেই শালারা রাজাকার।'...
(লুৎফর রহমান রিটন)

আরো একটি ছড়া–

'আজকে আমি বলবো শুধু
যুদ্ধ জয়ের কথা,
যার সুবাদে পেয়ে গেছি
সাধের স্বাধীনতা।
জাদুবলে নয়কো মোটে
নয়কো সহজ পথে
স্বাধীনতা এল জানি
রক্তমাখা রথে।
স্বাধীনতার শত্রু যারা
তাদের পায়া ভারী
এসো সবাই মিলে ওদের
তাড়াই তাড়াতাড়ি।
নইলে বাগান উজাড় হবে
ফুটবে নাতো ফুল,
এক নিমিষে বিরান হবে
ক্ষীর নদীর কূল।'
[যুদ্ধজয়ের কথা : শামসুর রাহমান]

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের বিশেষ শিষ দিনকে কেন্দ্র করে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিবেদন করে লেখা বিপুল পরিমাণ ছড়া সৃষ্টির পেছনেও নিশ্চয় সক্রিয় প্রেরণা মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তর চেতনা। এখন সেরকম দুটি ছড়া পাঠ করা যাক।

'ইতিহাসের এই দিনটায়
তুলেছিলেন ঝড়
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ নেতা
শাবাশ মুজিবর।
এই দিনটা সাতই মার্চ

একাত্তরের সাল
স্মৃতির ক্যালেন্ডারে লেখা
দীপ্ত ও উত্তাল ।
এই দিনটা স্বাধীনতার
ঘোষণারই দিন
মুক্তিযুদ্ধে ত্যাগে জয়ে
চির অমলিন ।'
[৭ই মার্চ ১৯৭১ / আসলাম সানী]

আরেকটি ছড়া–

'একটি ছড়া লিখেছিলাম
বঙ্গবন্ধুর নামে
সেই ছড়াটা হচ্ছে বিকি
অনেক চড়া দামে ।
ছড়ার একটা লাইন হঠাৎ
আকাশ থেকে নামে
নামতে নামতে বুঝতে পারি
আমার বুকে থামে ।
থামার পরে কী যে হলো
দারুণ অনুভবে
আশে-পাশের সবাই মুখর
'বঙ্গবন্ধু' রবে ।
বঙ্গবন্ধু নামটি এখন
সব শিশুদের মনে,
বড় হবার স্বপ্ন তাদের
দেখায় প্রতিক্ষণে ।'
[বঙ্গবন্ধুর নামে : আলম তালুকদার]

স্বাধীন দেশের মুক্ত পরিবেশে বুক ফুলিয়ে চলার আনন্দ নিয়েও প্রচুর ছড়া লেখা হয়েছে। যেমন–

'আমি স্বাধীনতার কাব্য লিখি
স্বাধীনতার নামতা শিখি
যুদ্ধ জয়ের কথা বলি
বিজয় নিশান উড়িয়ে চলি ।...'
(স্বাধীনতা / আনজীর লিটন)

পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার স্বপ্নগাথা যাদের ছড়া-চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– খালেক বিন জয়েনউদদীন, সিরাজুল ফরিদ, লুৎফর রহমান রিটন, আমীরুল ইসলাম, ফারুক নওয়াজ, আসলাম সানী, নাসের মাহমুদ, আহসান মালেক, আলম তালুকদার, আনজীর লিটন, রোমেন রায়হান, জসীম মেহবুব, রমজান মাহমুদ। তবে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ও স্বাধীনতার চেতনাদীপ্ত ছড়া-কবিতা জীবনে দু'একটি লেখেননি বাংলাদেশে এমন মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন কবি-ছড়াকার খুঁজে পাওয়া কঠিন। সঙ্গত কারণে তাদের নাম অনুল্লিখিত রেখেই তাদের শিল্পমণ্ডিত রচনা নিচয়ের আবেদন আমাদের এই প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম।

ছড়া হলো প্রত্যক্ষ সাহিত্য-মাধ্যম। সাহিত্য-মাধ্যমগুলোর মধ্যে মানুষকে তাৎক্ষণিক সম্মোহন-জাদুতে চমৎকৃত করার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র ছড়া। ছড়াই পারে উপস্থিত পাঠক-শ্রোতার অন্তর্দেশে সবচেয়ে স্বল্পতম সময়ে নগদ আনন্দ পৌঁছে দিতে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ছড়ার জুড়ি নেই। চিরায়ত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশের ছড়া যেমন স্বাধীনতার জন্য মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অত্যাচারী শোষকের প্রতি রাগ রোষ ক্ষোভ দ্রোহ ঘৃণা এবং অমিত বিক্রমকে উচ্চ কণ্ঠে ধারণ করেছে, তেমনি এর পাশাপাশি ছোটোদের কবিতা বা কিশোর কবিতা প্রকাশ করেছে স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের মানুষের প্রগাঢ় আবেগ, গভীরতম ভালোবাসা, অপরিসীম আত্মত্যাগের বেদনাময় অনুভূতি। কিশোর কবিতা অঙ্গনের শতকরা প্রায় পঁচাত্তর ভাগ অংশ জুড়ে আছে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা। এই ধারার নিষ্ঠাবান অগ্রবর্তী লেখকরা হলেন– আহসান হাবীব, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, মহাদেব সাহা, আখতার হুসেন, মাহমুদউল্লাহ, রোকেয়া খাতুন রুরী, সুজন বড়ুয়া, তুষার কর, রাশেদ রউফ, অরুণ শীল, মুস্তাফা মাসুদ, সিকদার নাজমুল হক। আমাদের নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে এই সব কবিদের রচনা পাঠের বিকল্প নেই। কিশোর কবিতার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

'একদিন শোনো, এই দেশটাতে
দানবেরা দেয় হানা,
পুড়ে ছারখার মাঠের শস্য
মানুষের আস্তানা।
বয় নিরবধি
রক্তের নদী,
শকুনেরা মেলে ডানা,
এই দেশটাতে একদিন শোনো,
দানবেরা দেয় হানা।
শোনো একদিন এই দেশটাতে
মুক্তিযুদ্ধ হয়–
আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির

ঘোচাতে দুঃখ-ভয়;
এই দুটি হাত
স্বাধীন-অবাধ,
হয়ে ওঠে দুর্জয়–
হে কিশোর, শোনো,
আমরা সেদিন যুদ্ধ করেছি জয় ।'
[হে কিশোর, শোনো: মহাদেব সাহা]

এটি শুধু কবিতা নয়, ছন্দোবদ্ধ পঙক্তিমালা নয়, আগামী দিনের শিশু-কিশোরদের কাছে এটি দেশকে ভালোবাসার বার্তা । এভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এরকম অসংখ্য কিশোর কবিতা আমাদের শিশুসাহিত্যের ভা-ারে ইতোমধ্যে জমা হয়েছে, যেগুলোর শব্দে, ছন্দে, ছত্রে ছত্রে অনুরণিত হয়েছে স্বাধীনতার শহিদদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা এবং এ দেশের রূপময় প্রকৃতির প্রতি গভীর মমতা ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার এখন আটচল্লিশ বছর অতিক্রান্ত । এখনো দেশের দুর্যোগ-দুঃসময়ে সংগ্রামী জনতার ক্ষোভ প্রকাশের প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে ছড়া । ছড়া ধারণ করে প্রতিবাদের ভাষা । ২০০১ সালের নির্বাচনের পর রাষ্ট্র ক্ষমতায় চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের অধিষ্ঠান ঘটলে এবং মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী মহলের উপর জামাত-শিবির চক্র কাপুরুষোচিত হামলা শুরু করলে ছড়াকারের কলম হয়ে ওঠে যেন খাপ খোলা তলোয়ার । ঘৃণা ধিক্কারে প্রতিবাদে ছড়া হয়ে পড়ে একেবারে নিরাভরণ, ঝাঁজালো বক্তব্য প্রধান । এ সময়ের একটি ছড়া–

...'পাক সেনাদের জারজ ওরা
খান সাহেবের পুত,
তাইতো আজো খায় চেটে সব
পাকিস্তানের মুত ।
রুখতে ওদের ঝেড়ে ফেলো
সকল ভয় ও লাজ
এসো সবাই ধারণ করি
মুক্তিযোদ্ধার সাজ ।'
(সুব্রত চৌধুরী)

অথবা আরেকটি ছড়া এরকম–

'স্বাধীনতা পতাকায় স্বাধীনতা রক্তে
কারা আনে স্বাধীনতা কারা থাকে তক্তে?
যারা ছিল সহচর হানাদার সৈন্যের
তারা আজ দেশপ্রেমী দোষ ধরে অন্যের ।
ইতিহাস জানা আছে যায় না যে ভোলা তাই

মক্তির পথ আছে চিরদিন খোলা তাই ।
মক্তির পথ জানা, পথ নয় রুদ্ধ
স্বাধীনতা হীনতায় প্রয়োজনে যুদ্ধ ।'
(অজয় দাশগুপ্ত)

বাংলাদেশের ছড়া এবং গণমুখী চেতনা যেন একে অপরের পরিপূরক। ১৯৯০ সালের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে যেমন তেমনি ২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতেও ছড়া পালন করে বৈপ্লবিক ভূমিকা। ছড়া তখন কেবল লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, হয়ে ওঠে জনমানসের ভাবের বাহন। শিল্পের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায় স্লোগানের আঙ্গিকে। তাইতো ছড়ার ছন্দোবদ্ধ ধ্বনিতেই সৃষ্টি হয় গণজাগরণ। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুদ্ধাপরাধীদের

বিচারের দাবিতে ছাত্র-জনতা একত্রিত হয়ে ছড়ার ধ্বনিতেই প্রকম্পিত করে তোলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহবাগ এলাকা। জয় বাংলা ধ্বনিতে ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠে শোনা যায় –

একাত্তরের হাতিয়ার
গর্জে উঠুক আরেক বার ।
এবং
তুমি কে আমি কে
বাঙালি বাঙালি

এভাবেই সেদিন ছড়ার চিরন্তন শক্তি উজ্জীবিত করে বিপ্লবী জনতাকে। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে একবিন্দুতে এসে মেলে ছড়ার ছন্দ। জনতার দাবির মুখে সরকার যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর করতে বাধ্য হয়। তারপর একে একে যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি কার্যকর হতে থাকে। এটি যেমন একদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিজয়, তেমনি ছড়ারও বিজয়। বাংলাদেশের ছড়ার সফল অভিযাত্রা এখানেই।

মুক্তিযুদ্ধ একটি বাতিঘর। সব জাতির জীবনে এমন আলোকবর্তিকা অর্জনের সৌভাগ্য হয় না। সে ক্ষেত্রে বাঙালি সৌভাগ্যবান জাতি। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে বিশ্বে এমন দেশই-বা কয়টি আছে? ভারতীয় উপমহাদেশে তো একটিও নেই। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার। মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য আমাদের গর্ব, আমাদের পরিচয়। মুক্তিযুদ্ধ

বাঙালি জাতিসত্তাকে উজ্জীবিত করেছে নতুনভাবে। শিল্প-সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মতো ছড়াসাহিত্যেও ঘটেছে এর উজ্জ্বল প্রতিফলন। বিশেষত স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র সাহিত্য-মাধ্যম হিসেবে ছড়াসাহিত্য পেয়েছে পূর্ণ মর্যাদা। মুক্তিযুদ্ধই বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যের প্রাণের অনুষঙ্গ। মুক্তিযুদ্ধই পশ্চিমবঙ্গের ছড়াসাহিত্য থেকে বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যকে দিয়েছে স্বতন্ত্র মহিমা। মুক্তিযুদ্ধই বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যকে দিয়েছে মৌলিক ভিত্তি। আবার বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যও মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করেছে একেবারে পরিপূর্ণভাবে। মুক্তিযুদ্ধই বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যের উজ্জ্বল ফলকলিপি।

[লেখক: ছড়াশিল্পী, শিশু-কিশোর সাহিত্যিক। কর্মকর্তা, শিশু একাডেমী।]